

COL-H04778-13-P29593

শারদীয় ১৩৮৩

(13)

জয়ন্তী

প্রতিষ্ঠাত্রী-সম্পাদিকা : লীলা রায়

জয়ন্তী প্রকাশনের পরবর্তী গ্রন্থ

হেগেলীয় দর্শন

অনিল রায়

এ দেশে যখন মার্কসবাদ প্রথম আমদানী হয় এবং যখন নবীন মনে একটি নতুন মত
স্বভাবতই মোহজাগতে সুরু করে সেই সময় দ্রুত ও ভারতীয় সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্যে
জ্ঞানতাপস অনিল রায় একটি পূর্ণ জীবন দর্শন গড়ে তোলেন। সমাজতন্ত্রীর দৃষ্টিতে
হেগেলীয় দর্শন, বিবাহ ও পরিবারের ক্রমবিকাশ (মার্কস মর্গান থিওরীর সমালোচনা)—এই
মার্কসবাদের মৌলিক সমালোচনা এবং 'নেতাজীর জীবনবাদ' গ্রন্থে একটি বিকল্প চিন্তাধারার প্

অবিলম্বে প্রাক্ প্রকাশন মূল্য দশ টাকা দিয়ে গ্রাহক হোন

(সাধারণ মূল্য আনুমানিক ১২'৫০)

বৃক্ষরোপণ উৎসব

ও

৬১টি বৃক্ষের পরিচয়

লক্ষ্মীশ্বর সিংহ

প্রায় অর্ধশতাব্দী ধাবৎ নিরলস ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের পটভূমিকায় পুঁথিপড়া
দৈনন্দিন জীবনের নানাবিধ প্রয়োজনের ব্যবহারিক শিক্ষার সংমিশ্রণে 'মানুষের সুস্থ সুন্দর
সাধনায় লিপ্ত যে জ্ঞানতাপস—তিনি লক্ষ্মীশ্বর সিংহ।

কবিগুরু প্রবর্তিত 'বৃক্ষরোপণ উৎসব' ও তার সার্থকতা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নানাবিধ বৃক্ষের
প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষায় ৬১ টি অমূল্য বৃক্ষের পরিচয় দিয়ে রচিত সদা প্রকাশিত এই বই।

প্রকৃতি পিপাসু পড়ুয়াদের বইটি ভাল লাগবে। ৬১টি বৃক্ষের চিত্র সহ
বাধাই ও ছাপা,

দাম দশটাকা।

জয়ন্তী প্রকাশন। ২০-এ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড, কলিকাতা-২৬

জার খ্রীষ্টোন্দের কলকাতা ॥ সম্পাদকীয়	২৪৫	ডায়েরী থেকে ॥ গল্প ॥ প্রলয় সেন	৩৩৭
কণ্ঠ হতে গান কে নিল ॥ চারণিক	২৫৩	কবিতা	
।			
। : সন্তর দশক ॥ কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত	২৫৫	সেই সাধ থেকে গেল মনে ॥ সুজিতকুমার	
গতা ॥ রুম্মধব	২৫৬	মুখোপাধ্যায়	৩৫৫
ন কলকাতা ॥ অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত	২৫৭	সচেতন শিল্পের তাগিদে ॥ গোপাল ভৌমিক	৩৫৫
শ শতাব্দীর প্রজাপতি ॥ সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত	২৫৭	প্রতীক্ষার বসে থাকি ॥ শান্তশীল দাশ	৩৫৫
তা ২০০০ খ্রীষ্টাব্দে ॥ সেমিনার ॥	২৫৯	এই সব ছোট ছোট দৃশ্য ॥ নিচিকেতা ভরস্বাজ	৩৫৬
এখান থেকে কোথায় যাবো ? ॥ অশোক মিত্র,		মেঘভাঙা ॥ মানস রায়চৌধুরী	৩৫৭
এ. এস (অবসরপ্রাপ্ত), অধ্যাপক জহরলাল		কলকাতা : ১৯৭৬ ॥ শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়	৩৫৯
বিশ্ববিদ্যালয়, দিল্লী ॥	২৬০	টিউলিপ ॥ দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৬০
দী শেষে কলকাতা ॥ ভোলানাথ সেন,		কলকাতা কখনো তুমি কল্লোলিনী হবে ? ॥	
এন, সি. এম. ডি. এ, পূর্তমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গ		সৌমিত্রশঙ্কর দাশগুপ্ত	৩৬৩
	২৭০	তাকে শব্দে দৃষ্টি রেখো ॥ বাসুদেব দেব	৩৬৩
হুতা তথা রোপ্যমুদ্রানি ॥ শিবপ্রসাদ সমাদ্দার		কলকাতা ২০০০ খ্রীষ্টাব্দে : সেমিনার	
নিষ্টেউর, কলিকাতা পুরসভা	২৭৮	একবিংশ শতাব্দীর কলকাতা কেমন হবে ? ॥	
এয়ন পরিকল্পনার কয়েকটি ভাবনার বিষয় ॥		ডঃ সুধেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ॥ আরবান সোসিওলজিস্ট,	
ঘোষ ও পীড়াকান্তি সোম, স্থপতি, ঘোষ		সি. এম. ডি. এ	৩৬৪-১
এসোসিয়েটস্	২৮৬	কলকাতার পশ্চাদভূমি : সুন্দরবন	
ন ॥ বিজ্ঞানধর্মী গল্প ॥ শচীন্দ্রনাথ বসু	৩০১	সভ্যতার স্বপ্ন ॥ পবিত্রকুমার ঘোষ, জনসংযোগ	
আয়না ॥ অন্নদামোহন বাগচী	৩১৭	অফিসার, সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ	৩৬৪-৮
ন ॥ বিজনকুমার ঘোষ	৩২০	আগামী শতকের কলকাতার রূপরেখা ॥ মণিদীপ	
আলোকে		মুখোপাধ্যায় ডেপুটি ডিরেক্টর প্ল্যানিং,	
তনার প্রসারে ভারতসভা ॥		সি. এম. ডি. এ.	৩৬৪-১০
চক্রবর্তী	৩২৯	বিদ্যুতের যোগান ও পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য	
		বিদ্যুৎ পর্ষদ	৩৬৪-১৫

সম্পাদক : সুদীপ দাস

“গৃহিণী গৃহমুচ্যতে” আপনার গৃহের স্বাস্থ্য
রক্ষার জন্য LEUKORA অপরিহার্য

ADCCO LTD.

P.O. Adconagar
Dt. Hooghly



একটি শিশুর সোনার থালা
দুটি হলেও আদর।
অধিক মানে অবহেলা
কেবলই চড়াপড়।

আগে সঞ্চয় পরে সন্তান



ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া
(ভারত সরকারের একটি সংস্থা)

UBI PUB 5768

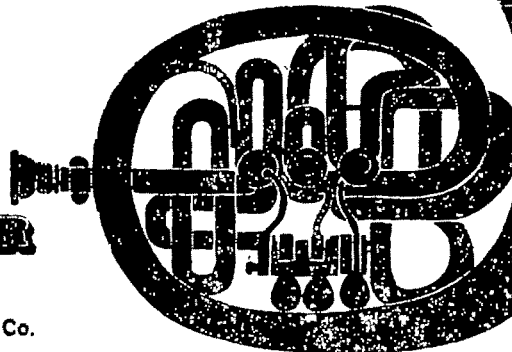
SUPERLAC TWINS

THE BEST QUALITY
SUPERLAC ACRYLIC
PLASTIC EMULSION AND
SYNTHETIC ENAMEL



**SHALIMAR
PAINTS**

A Member of The International Paint Co.
of Courtaulds Group—U.K.



With **BEST** COMPLIMENTS from

p29593

Hindustan Copper Limited

(A Government of India Enterprise)

H. O. : Industry House, 10, Camac Street,
Calcutta—700017

Telephones : 44-6662/3, 44-1993, 44-7317
Telex : 021-3291 Telegram : HINDCOPPER

With the best Compliments of :

NESTLE'S PRODUCTS (INDIA) LTD.

With best Compliments from

Balubhai Pharmaceuticals

16, Pollock Street

Calcutta-700001

Pharmaceutical Distributors

for

1. The A C C I Ltd., (I C I Products)
2. Indian Schering Ltd.,
3. Nicholas of India Ltd.,
4. Wockhardt (P) Ltd.,

Telegram : 'Twinkle'

Faridabad

Telephone : 81-2231

East India Cotton Manufacturing Co Ltd

New Industrial Township

Faridabad (Haryana)

Manufacturers of high quality printed sarees, printed dressmaterials and high quality dyed Cambrics and Poplins.

Selling Agents and Authorised Dealers all over India. For details, please write to us at Faridabad.

Regd. Office :

38, Netaji Subhas Road

Calcutta-1.

Grams : 'Cotfib' Calcutta

Phone : 22-0737/8

ক থেকে আই-ড্রপ—

লক্ষ গৃহস্থের আমরা পারিবারিক বন্ধু



ইস্ট ইন্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যালস্—লক্ষ লক্ষ
দেশবাসীকে যুগিয়ে চলেছে উৎকৃষ্ট ওষুধ

‘পড়লে ঠেকায় আসল বন্ধু চেনা যায়’—যে কেউ প্রবাদ
অনুযায়ী আমাদের যাচাই করে নিতে পারেন। ওষু জনকয়েক
ভাগ্যবানদের কাছে নয়, এদেশের লক্ষ লক্ষ গৃহস্থের কাছে
ছোটবড় সকলেরই আমরা পারিবারিক বন্ধু। বুড়ো তাঁকুরদার জন্যে
যেমন আই-ড্রপ, তেমনি বাড়ন্ত শিশুর জন্যে টনিক—আমরা
যুগিয়ে থাকি। তাছাড়াও আমরা তৈরি করি বিস্তর ধরনের আধুনিক
ওষুধপত্র—সকলের সাধে কলোয় এমন দামে।

এ কাজে আমরা হাত দিই সেই ১৯৩৬ সালে।
আদর্শবান কয়েকজন বিজ্ঞানী, রসায়নবিদ আর ভেষজতত্ত্ব দেশের
সাধারণ মানুষকে ওষুধ যোগাবেন বলে গড়ে তুলেছিলেন
ইস্ট ইন্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্ লিমিটেড।
ওষুধের পবেষণা, উদ্ভাবন আর বিলিয্যবস্থায় নিজেদের
পায়ে দাঁড়ানো—এই ছিল তাঁদের ব্রত।

ইস্ট ইন্ডিয়া
ফার্মাসিউটিক্যাল
ওয়ার্কস্ লিমিটেড,
কলকাতা ১৬

ইস্ট ইন্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্ লিমিটেড আপনাদের সেবায়



খসি.প্র ১৩ বেন

with **BEST** COMPLIMENTS from

Sree Saraswati Press Ltd.

Calcutta—700009

With the best compliments of

**M/s South Press And
Industries**

36/1A, Garcha Road,

Calcutta-19

Phone : 47-7432

দেশের কল্যাণে

পরিবার কল্যাণ পরিকল্পনা

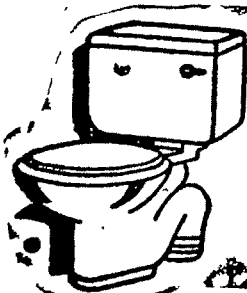
আজই যে কোন পরিবার কল্যাণ
কেন্দ্রে গিয়ে ছোট পরিবার
সম্পর্কে খবর নিন।

পশ্চিমবঙ্গ পরিবার কল্যাণ পরিকল্পনা
সংস্থা হইতে প্রচারিত।

বিজ্ঞাপন সংখ্যা—৩০৫/৭৬-৭৮

GRAM : ALLSANIT

Phone



১৪৪ ব্লক, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৬

Sree Gopal Brush Works.

APPROVED CONTRACTORS OF DGS & D AND RAILWAYS

Manufacturers of :—

All Sorts of Paint, Lettering, Platform, Scrabbing, Rubber Squeeze and
Other Foundry, Carriage Washing Banister, Brushes
&

General Order Suppliers

3/1D, Subal Chandra Lane, Calcutta-9.

With the best compliments of

M/s. Nireka Engineering & Co. (P) Ltd.,

Factory & Regd. Office :—

29, The Mall, Calcutta-28
Telephone No. 57-2389 & 57-5026

City Office :—

1 British India Street., Calcutta-1
Telephone—23-1037.

শারদীয়ার অভিনন্দন গ্রহণ করুন :—

এস. এন. গাল এণ্ড ব্রাদার্স

১৮-৬, ওল্ড চীনাবাজার স্ট্রীট

কলিকাতা-৭০০০০১

ফোন : ২২-৩৫৪১, ২২-৭৪৪৬

নিত্যপ্রয়োজনীয় গার্হস্থ সামগ্রী ও পশুপক্ষী পালনের যাবতীয় সরঞ্জাম, ঔষধ ও খাদ্যের

প্রস্তুতকারক ও পরিবেশক—

গৃহস্থালী বিভাগ

প্রেসার কুকার

ডিনার সেট, টি সেট, কাটলারী সেট

ক্লাস ওয়ার

থার্মোফ্লাস্ক

পেট্রোমাক্স ল্যাম্প, স্টোভ ও হিঠিং

হাসপাতাল ও গৃহের এনামেল বাসনাদি

পাপোস, ম্যাটিং ব্লাস ও

পোল্ট্রী ও পশুপালন বিভাগ

পালকোভেট, ব্র্যান্ড ইনস্ট্রুমেন্ট

ডিম ফোটানোর যন্ত্র

ব্রুডার, ডিস্কার ও ফিডার

পশুপক্ষী চিকিৎসার যন্ত্রাদি

পশুপক্ষী চিকিৎসার সর্বপ্রকার

ঔষধ ও পুস্তক।

সাধনা বিউটি ক্রিম



তাঁর মনোহারিনী
মৌন্দর্য!

প্রতিদিনের রূপচর্চায়
সাধনা বিউটি ক্রিম তাঁকে
এনে দিয়েছে
যৌবনমূলভ কমণীয়তা
আর অপরূপ লাবণ্য

একটি অতি আধুনিক
অন্য অঙ্গরাগ
প্রতিদিনের রূপ-সাধনায়
অপরিহার্য

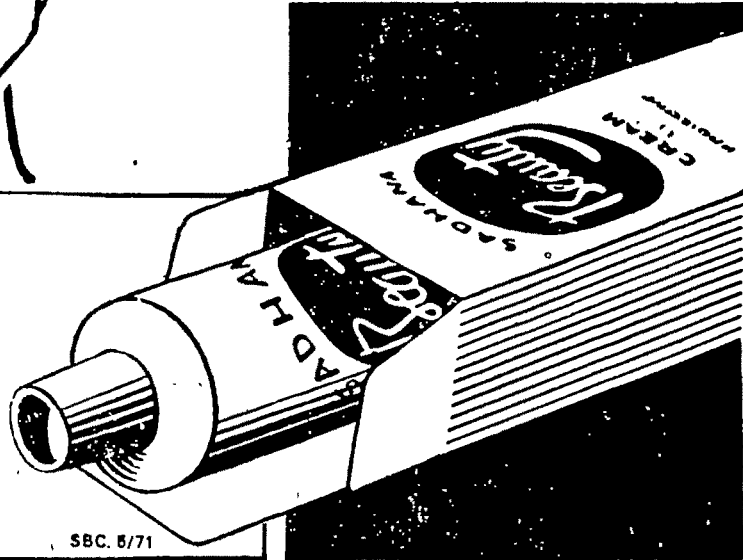
সাধনা
ঔষধালয়
ঢাকা

কলিকাতা-৪৮

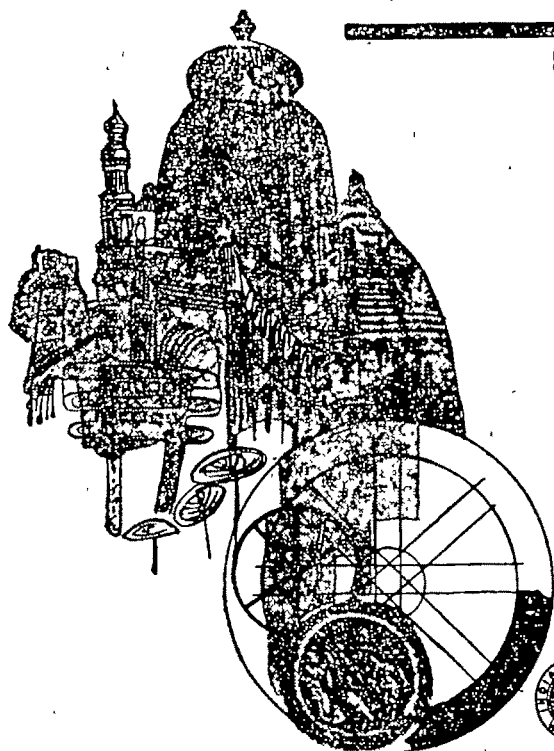


Dr. Ghose

শাখা ভারতের সর্বত্র



SBC. 5/71



ঐক্যের চক্র

আমাদের পূর্বসূরীদের বহুমুখী প্রতিভার অবদান
ভারতের সুসংহত সংস্কৃতি। আপাতঃ দৃষ্টিতে
আকর্ষিত পার্বত্য শাকল্যে এই সংস্কৃতির মাধ্যমে
অন্তর্নিহিত রয়েছে ভাবগত ঐক্য যা সমগ্র
দেশবাসীকে এক ও অবিচ্ছেদ্য করে রেখেছে। আ
এই সাংস্কৃতিক সংহতিতে ভারতীয় রেলওয়ের
অবদান অপরিসীম ও অমূল্য। দেশের এক প্রান্ত
থেকে অপর প্রান্ত—হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী—
ভারত মাতার বাণী ব'য়ে চলেছে রেলওয়ে চক্র।



দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে

With the best compliments of

Arora & Sons

Pharmaceutical Distributors

MB ● ACCI ● BAYER ● BDH ● E. MERCK ●
EVANS ● ROUSSEL

Established Over 3 Decades

44, Ezra Street, Calcutta.

ENJOY YOUR

*Sightseeing And Package Tours
New Deluxe Buses & Cars*

DELHI, AGRA, JAIPUR, SIMLA,
KULU MANALI, HARDWAR,
MUSSOORIE, DEHRADUN
NAINITAL, KEDARNATH,
BADRINATH SRINAGAR,
KHAJURAHO RAJASTHAN,
ETC.

Ridss Travels (P) Ltd.

**3/91 Bhagat Singh Lane,
Gole Market, New Delhi-110001**
Phones 46726, 45274, 44627

*With Best
Compliments Of*

BO PRINT

**99/54, Mahatma Gandhi Road
Calcutta-700041**
Phone 45-0691

Ganesh Chandra Panda

**8, K. M. Naskar Road
Calcutta-700040**

For

Expanding Files, Followup files, Spring
Files, Diary, Calender, Table Blotter, Pen
Stand, Paper Box, D. B. Writing Pad. &
All Kinds of Card-Board Boxes.

W. B. T. D. C. Welcomes You For A Delightful Treat.

There is a lot to see in West Bengal. Historical places in Murshidabad, Pandua and Vishnupur, hill resorts like Darjeeling, Tiger Hill, Kalimpong and Ku beach resorts like Digha and Bakkhali, Tagore's Santiniketan and the Ruhr of Durgapur.

Comfortable Tourist Lodges everywhere. Fully furnished with attached toilet.

Central Reservations :

**West Bengal Tourism Development
Corporation Ltd.**

3/2, Benoy-Badal-Dinesh Bagh (East), Calcutta—700001

Phone : 23-2997

or

The Managers of the Tourist Lodges

*With Best
Compliments Of*

M/s. B. S. Engineering Enterprise.

Manufacturer of quality Rubber products.

17/10E, Mall Road, Calcutta-28.

Phone No. 57-5206.

ভোবেচিত্তে একসঙ্গে কাজ করার এই তো সঠিক সময়

কলকাতা শহরে ও চাই বিশদক্ষা কাজের প্রস্তুতি

- কলকাতা শহর সমস্ত দেশের অংশবিশেষ—এর উন্নতির অর্থ-দেশের অগ্রগতি।
লক্ষ্য রাখুন রাস্তায় কলের মুখ যেন বন্ধ থাকে—কারণ জলের অপচয় পাপ।
কাজ করে যেতে হবে নিরবচ্ছিন্নভাবে—এর ফলশ্রুতি আগামী দিনের কলকাতা।
তাড়াতাড়ি টিকা ও প্রতিষেধ গ্রহণ—মহামারী রুখতে পারে।
শহরবাসীদের আরো সুবিধা দান—কলকাতার পুরসভার লক্ষ্য।
হতশ্রী মহানগরের শ্রী ফিরিয়ে আনে—লিখনমুক্ত পরিষ্কার প্রাচীরগাত্র।
রেবারে যি নয়—সমন্বয় সাধন করে কর্মযজ্ঞে যোগদিন।
ওরা যারা খাচ্ছে ভেজাল দেয়—তাদের শাস্তি বিধান করতে সহায়তা করুন।
চালাকির দ্বারা নয়—একমাত্র গঠনমূলক সমালোচনাই পুরসভাকে সঠিক পথে নিয়ে যাবে।
ইতস্ততঃ ময়লা ফেলবেন না—সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৩টের মধ্যে।
বিহ্যত জনগণের জ্ঞান—বাতিস্তম্ভ থেকে তা চুরি করা জনগণের সম্পত্তি আত্মসাতের সামিল।
শহরের উত্তান ও বৃক্ষরাজি অবহেলার নয়—এরাই শহরের শ্বাসযন্ত্র।
দণ্ডনীয় অপরাধ—লোকচলাচলের জ্ঞান তৈরী ফুটপাথ জবরদখল করা।
ফারাক রেখে বাড়ী করুন—গৃহনির্মাণের নতুন নিয়মাবলী মেনে চলুন।
কাজ করার জ্ঞান পুরসভাকে শক্তি যোগান—আপনাদের পুরস্কার নিয়মিত দিন।
জৈদধরে কাটা ফল খাওয়া বন্ধ—রোগ এড়াতে পারবেন।
রক্তবাহী শিরা উপশিরা মত এই শহরের রাস্তাগুলি—এদের রক্ষণাবেক্ষণ অবশ্যপ্রয়োজনীয়।
প্রাস্রাংগার ও থুথু ফেলার জায়গায় পরিণত করবেন না এই শহরকে।
স্তপাকার জঞ্জাল, ধুলোময়লায় এই শহরের বাতাস আর গঙ্গার ঐতিহ্যকে কলুষিত করবেন না।
তিলশিক্ষায় গড়ে ওঠে জাতীয় সংহতি—পুরসভার অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় ২৬১টি,
ক্রেস ১টি, নৈশ বিদ্যালয় ৯টি।

কলকাতার জীবনে কলকাতা পুরসভা

জন্মসংযোগ বিভাগ কর্তৃক প্রচারিত

জয় শ্রী

শারদীয়া জংখা

৪১ বর্ষ । পঞ্চম সংখ্যা । ভাদ্র ১৩৮৩

সম্পাদকীয়

দুই হাজার খ্রীষ্টাব্দের কলকাতা

এক ইংরেজ ঐতিহাসিক যেন বলেছিলেন, ইংরেজরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দখলদার হয়ে বলেছিলো ‘কতকটা অগ্রমনস্কভাবেই’—‘in a fit of absentmindedness’। কলকাতা সহরের উদ্ভব এবং পরিধির ক্রমবিস্তার সম্পর্কেও জব চার্ণক এবং তার উত্তর-সূরীরা যদি ঐ একই ধরনের কৈফিয়ৎ দিতেন, সেটা বোমানান হ’তো না। ইতিহাসের অমোঘ আবেত ব্রিটিশ সাম্রাজ্য অস্তিত্বিত হয়েছে। কিন্তু এই শতাব্দী মোড় নিয়ে নূতন শতাব্দীর অভ্যুদয়ের সময় প্রায় ৫৫০ বর্গ মাইল বিস্তৃত, জনসংখ্যায় মাত্রাতিরিক্তভাবে ক্ষীণ, বৃহত্তর কলকাতার কী হবে? এই প্রশ্ন কিছুদিন যাবৎই রাষ্ট্রনায়ক, সমাজতাত্ত্বিক, অর্থবিজ্ঞানী, শহর পরিকল্পক, স্থপতি ও অগ্ন্যাহদের প্রবলভাবে আলোড়িত করছে। ১৯৪১-সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত কলকাতা যে দ্রুত ধ্বংসের গহবরের দিকে এগিয়ে গেছে, এ-বিষয়ে আজ সকলেই একমত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মিত্রশক্তির অগ্র-গামী ঘাটিক্রমে কলকাতার ওপর আর্থিক ও সামাজিক সাধ্যাতীত চাপ, তারপর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিপর্যয়কর ধাক্কা, দেশ-বিভাগের পর উদ্বাস্তুস্রোতের লাভা প্রবাহ, পূর্বভারতের পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলি থেকে রোজগারের

প্রত্যাশায় প্রায় ষোল লক্ষ মানুষের ভিড়, পশ্চিম বাংলার গ্রামের হতসর্বস্ব মানুষদের বাঁচবার তুরন্ত তাগিদে ভিড়,—কলকাতা সহরকে বস্তিসহর, ফুটপাথের সহর, বুভুক্ষু মানুষের মিছিলের সহর করে তুলেছিল। এক সময় জর্জ ওরওয়েল (Orwell) “ধ্বংসের ভবিষ্যদ্বক্তারূপে”—‘Prophet of Doom’—১৯৮৪ সালের মধ্যে পৃথিবী-ধ্বংসের অনিবার্যতা সম্পর্কে সুনিশ্চিত ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তেমনি কলকাতার অনিবার্য ধ্বংস সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বক্তার অভাব ছিলো না।

কলকাতার বাঙালী-মানসের চিরায়ত সঙ্ঘার প্রদীপ্ত শিখা অন্তঃসলিলা ফলগুধারার মতো বয়ে চলেছে বিগত শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে; অর্থাৎ ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে যেদিন ভারত পথিক রামমোহন রায় কলকাতায় মানিকতলায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে লাগলেন, সে-শিখা বাঙালী মনীষার শতাব্দীব্যাপী সর্বাঙ্গীণ সাধনায় আরও উজ্জ্বল হয়ে সারা ভারতবর্ষকে আলোকিত করে তার দীপ্তি বিংশশতাব্দীর বাংলাদেশের দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর দশকগুলিকে উদ্ভাসিত করেছে। গত কয়েক দশকে সে-দীপ্তি ম্লান হয়ে গেছে নিঃসন্দেহে, কিন্তু তার অফুরাণ প্রাণসদ্বা নিয়ে, আজও বিক্ষিপ্ত

বিচ্ছিন্ন বাঙালী মানুষ, খুঁকতে খুঁকতে বয়ে চলেছে ভবিষ্যতে অতীত গৌরবে প্রত্যাবর্তনের প্রত্যাশায়।

ক'লকাতার আসল-সত্ত্বার এই তুলনামূলক ঐশ্বর্য যেমন গোটা ভারতবর্ষকে পথ দেখিয়েছে, যেমনি ক'লকাতা ভারতবর্ষের বৈষয়িক উন্নতির সিংহদ্বারের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ভূমিকায় ইতিহাসে চিহ্নিত হয়ে আছে। ক'লকাতা সম্পর্কে কোনো প্রাদেশিক উন্নাসিকতার ফলশ্রুতি নয় বাঙালী-মানসের স্মৃতিভার ভারতীয়ত্ববোধ থেকেই ইতিহাসে এই প্রত্যয়গুলি আপন আপন স্থান করে নিয়েছে। বাঙালী-মানসের ফলস্বরূপ যেমন কালের ব্যবধানে নানা ছুর্যোগে শ্লথগতি হয়ে গেছে, তেমনি বৈষয়িক উন্নতির ক্ষেত্রেও আজ ক'লকাতার স্থান অনেক পেছনের সারিতে নিষ্ক্ষিপ্ত হয়েছে।

১৯৫১ সাল থেকেই পশ্চিম বঙ্গের সহরে জনসংখ্যার হার সারা ভারতবর্ষের তুলনায় বাড়তে থাক। যার ফলে ১৯৭১ সালে পশ্চিম বঙ্গের জনসংখ্যার শতকরা হার যেখানে ২৪.৬ সেখানে গোটা ভারতবর্ষের সহরে (urbap) জনসংখ্যার হার দাঁড়ায় শতকরা ১৯.৯ ভাগ। তার মধ্যে আবার পশ্চিমবঙ্গের সহরে (urban) জনসংখ্যার শতকরা ৬৭ ভাগ বৃহত্তর কলকাতায় ঠাঁই নিয়েছে। তাই ক'লকাতা সমেত বৃহত্তর ক'লকাতার আরও ৩৪টি মিউনিসিপ্যালিটিতে সকল প্রকার 'সিভিক সার্ভিসেস'র আয়োজন বহু পূর্বেই ধ্বংসে তালগোল পাকিয়ে গেছে। তারই মধ্যে ক'লকাতা সহরে জনসংখ্যার স্বীতি এই দীর্ঘ বছর ধরে নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্যের, পরিশ্রুত জলসরবরাহ বৃদ্ধির, ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালীর বিস্তৃতির, জল-নিকাশের উন্নততর ব্যবস্থার, পরিবহণ ব্যবস্থা উন্নয়নের, যান-বাহনের দ্রুতগামিতার জন্য নূতন প্রশস্ত দীর্ঘ, 'এক্সপ্রেস ওয়ে' (Express way) তৈরীর, বস্তি-উন্নয়নের কিম্বা বস্তিবাসীদের জন্য

উন্নত বাসস্থানের, পথচারীদের জন্য ফুটপাথগুলির অবরোধ মুক্তির এবং ফুটপাথবাসীদের জন্য বিকল্প বাসস্থানের ও উপার্জনের, জঞ্জাল-সাফাই-এর, শিশুদের শিক্ষাব্যবস্থার দ্রুত প্রসারের, তরুণদের খেলাধুলার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থাপনার মধ্যে দিয়ে ধ্বংসোন্মুখ ক'লকাতার পুনরুজ্জীবনের স্বীকৃতির আশু এবং অব্যবহিত প্রতিভূরূপে ক'লকাতা মেট্রোপলিটন ডেভলপমেন্ট অথরিটি ১৯৭১ সালে হাতে-কলমে কাজ আরম্ভ করে ১৯৭৬-এর ৩১শে মার্চ পর্যন্ত ১৯২ কোটি টাকা একাজে ব্যয় করেছে, (রাজ্যসভায় রাষ্ট্রমন্ত্রী ভগৎ, ২৫শে আগস্ট, ১৯৭৬)। এ ছাড়া বিশ্বব্যাঙ্ক ১৯৭৭ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত সি, এম, ডি, এ-কে মেয়াদী ঋণ দিয়েছেন ২০ কোটি টাকার। আগামী বছর মার্চ মাসে চারবছরের মধ্যে সমাপ্তির সত্বে বিশেষ বিশেষ কর্মসূচী রূপায়ণের জন্য বিশ্বব্যাঙ্কের আরও ৯০ কোটি টাকা ঋণের সিদ্ধান্ত প্রায় পাকা হয়ে গেছে। আর ক'লকাতার পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য ৬০ কোটি টাকার পৃথক একটা পরিকল্পনা সি, এম, ডি, এ বিশ্বব্যাঙ্কের কাছে দাখিল করতে মনস্থ করেছেন, নতুন পরিকল্পনার (১৯৬৯-৭৪) সি, এম, ডি এর জন্য বিভিন্ন খাতে ১২২.৩৮ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল এবং পঞ্চম পরিকল্পনায় এই বরাদ্দের পরিমাণ ৩৫০ কোটি টাকা। এই দুইটি পরিকল্পনায় যে বরাদ্দ অর্থ সর্বাংশেই, বলতে গেলে, বৃহত্তর, ক'লকাতার কেন্দ্রমণি, ক'লকাতা শহরের ('Core of the Metropolis') জন্য ব্যয়িত হয়েছে কিম্বা হবে। ক'লকাতা শহরের উন্নতির জন্য ক্যালকাটা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট ১৯১১ সাল থেকে রয়েছে।

সি, আই, টি কলকাতার উন্নতির জন্য বেশীদূর অগ্রসর হতে পারে নাই, অর্থভাবে। তাছাড়া বস্তি

উচ্ছেদ করে সি, আইটি বড় বড় রাস্তা তৈরী করেছে অথবা সেই উন্নতির জমি চড়াদরে কলকাতার নূতন বিস্তারনের কাছে বিক্রি করে দরিদ্রদের সহরের সেই সব অঞ্চল থেকে বিতাড়িত করেছে। হয় তারা নূতন বস্তিতে ঘর-বাড়ী বেঁধেছে, না হয় ফুটপাথের আশ্রয় নিয়েছে, গ্রামের দিকে যাবার জন্য তাদের সামনে কোনো উদ্দীপক পরিকল্পনা ছিলো না, বরং গ্রাম থেকেই দরিদ্ররা ক্রমাগত কলকাতায় এসে ভিড় জমিয়েছে। কলকাতার এক তৃতীয়াংশ লোক বস্তিবাসী এবং বর্তমানে কলকাতার আয়তনের শতকরা ১৩.৫ ভাগ-জুড়ে বস্তু ছড়িয়ে আছে। সি, আই, টি উচ্চ মধ্যবিত্ত-দের জন্য কিছু জমির ব্যবস্থা করেছে আর করেছে নাগরিক জীবনের সর্বজনীন সুবিধার জন্য কিছু সুযোগ সৃষ্টি, প্রয়োজনের তুলনায় যা নিতাস্তই অকিঞ্চিৎকর। এ-ছাড়া কলকাতার সার্বিক উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য ক্যালকাটা মেট্রোপলিটান প্ল্যানিং অরগানাইজেশন জন্ম নেয় ১৯৬২তে যতদূর মনেপড়ে ফোর্ড ফাউন্ডেশন-এর একটি সমীক্ষার পর। আর সি. এম. ডি. এ-র আবির্ভাব ১৯৭১ সালে, দ্রুত ধ্বংসের হাত থেকে কলকাতাকে রক্ষা করে বৃহত্তর কলকাতার জন্য নানা নাগরিক নূনতম সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য। কিন্তু একটা নৈতিক গোল বেধেছে, সি আই টির বস্তু উচ্ছেদের (slum clearance) সঙ্গে সি, এম, ডি, এ-র বস্তু উন্নয়নের (slum improvement) পরিকল্পনার সঙ্গে প্রচ্ছন্ন বিরোধে সি, এম, ডি, এ-র বস্তু উন্নয়ন কলকাতার কেন্দ্রীয় এলাকার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্যই শুধু নয়, এই উন্নয়ন ব্যবস্থাকে অন্ততঃ দশবছর 'রক্ষা' (conserve) করতে হবে। সি, আই, টি, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ—ভূপেন বসু এভেনিউ এলাকার বহুবস্তু উচ্ছেদ করে এই দুইটি দীর্ঘরাজপথ

তৈরী করার সময় সহরের কেন্দ্র থেকে দরিদ্রদের উচ্ছেদ করে দিয়েছে। সহর পরিকল্পনার নৈতিকতার মানদণ্ডে দরিদ্রের সহরের কেন্দ্রে বসবাসের কী কোনই অধিকার নেই? পরে অবশিষ্ট বস্তু উচ্ছেদ করে কম ভাড়া বস্তিবাসীদের বসবাসের জন্য সেই জমির উপর সি, আই, টি বহুতল বাড়ী তৈরী করেছেন। তার সংখ্যা যেমন কম, তাতে কী দরিদ্র বস্তিবাসীরা সত্যিই মাথা গোঁজার ঠাই পেয়েছেন? এই দুইটি প্রশ্ন সহরের ইট কাঠ লোহার তৈরী বড়ো বড়ো বাড়ীর গায়ে প্রতিধ্বনিত হলেও কোনো জবাব নেই। অপরপক্ষে, সি, এম, ডি, এ-ই কী সামগ্রিক নগর-পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে 'দশ-বছর'-এর পরও উন্নত বস্তুগুলিকে 'রক্ষা' করতে পারবেন? না, তাদেরও অন্তিম পরিণতি উচ্ছেদে? কে জবাব দেবে? গ্রাম থেকে এতো দরিদ্র মানুষ কলকাতা সহরে জড়ো হয়েছে যে, তার ফলে গ্রামীণ জীবনের নীচের দিকের শতকরা ৪০ ভাগ মানুষের তুলনায় সহরে জীবনের নীচের দিকের শতকরা ৫০ ভাগ দারিদ্র্যের নিম্নসীমার নীচে বাস করে। ১৯৭১ এর জনসংখ্যা নির্ধারণের সময় দেখা গেছে, সে-সময় ভারতবাসীর মাথা পিছু গড়বার্ষিক আয় ৩৪০ টাকা মাত্র এবং জনসংখ্যার একটা বড়ো অংশ শতকরা এই গড় আয়ের অধিক পরিমাণও উপায় করতে পারতেনা। আর সহরের জনসংখ্যার মাসিক শতকরা ৫১.৩৪ ভাগের আয় ৫ জন পরিবার পিছু (১৯৬৪-৬৫-র তথ্যানুযায়ী) মাসে মাত্র ৩০ টাকা।

এই পরিপ্রেক্ষিতে দুই হাজার খ্রীষ্টাব্দের শেষে ভারতের, পশ্চিম বঙ্গের এবং বৃহত্তর কলকাতার জন সংখ্যা কত হবে? সারাভারতের জনসংখ্যা ৯৫ কোটি থেকে ১০০ কোটি হতে পারে, পশ্চিম বঙ্গে ১৯৭১-এর ৪ কোটি ৪৪ লক্ষ, ৮.৫ (সাড়ে আট) কোটিতে

পৌছাতে পারে সহরে জনসংখ্যা রাজ্যের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৪০ থেকে ৫০ ভাগে নেমে আসতে পারে। কিন্তু কলকাতার সহরে জনসংখ্যা রাজ্যের সহরে জনসংখ্যার শতকরা ৬৭ ভাগ থেকে শতকরা ৩০ থেকে ২৫ ভাগে নামিয়ে আনতে হবে। কারণ সহরে জনসংখ্যা শতকরা ২৫ ভাগে নেমে এলেও কলকাতা মেট্রোপলিটন জেলার (বৃহত্তর কলকাতার জনসংখ্যা ১ কোটি ২০ লক্ষে দাঁড়াতে পারে। ভারত সরকারের নতুন জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ নীতিতে বর্তমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বছরে শতকরা ২.৬ ভাগের অর্ধেক ১৯৮৪ সালের মধ্যে বছরে শতকরা ১.৩৭ ভাগে কমিয়ে আনতে চাইছেন।

এই জনসংখ্যাকে ঠাই দেবার জন্য কলকাতার সীমান্ত-সংলগ্ন একাধিক এলাকায় সি. এম. ডি. এ উপনগরী তৈরী করবেন। কিছু কিছু উপনগরী শিল্প-ভিত্তিক হবে, যেমন চর্মশিল্পের চারপাশে উপনগরী। কিছু কিছু উপনগরীতে সরকারী দপ্তর স্থানান্তরিত হয়ে কলকাতার ভিড় কমাতে সাহায্য করবে—এই উপনগরীগুলিতে এবং সহরে অবশিষ্ট যারা থাকবেন তারাও যেমন হাফ ছেড়ে বাঁচবেন, স্থানান্তরিত দপ্তরের কর্মচারীরা কর্মক্ষেত্রের নিকটবর্তী এলাকায় বাসস্থানের সুযোগ পেয়ে স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রায় ফিরে আসতে পারবেন। এই উপনগরীগুলিতে উচ্চবিস্ত, মধ্যবিস্ত, নিম্নবিস্ত, দরিদ্র সকলেরই মিলেমিশে থাকবার এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে বলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আশ্বাস দিয়েছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর লণ্ডন সহরের ধ্বংসস্তূপের উপর নতুন সহর স্থষ্টির ভারপ্রাপ্ত বারলো (Burlow) কমিটির সুপারিশেও নীতিগতভাবে প্রাধান্য পেয়েছিলো সহরের সীমান্ত-সংলগ্ন এলাকার বাইরে নতুন বসতির ব্যবস্থাপনা করে লণ্ডনের ওপর জনসংখ্যার চাপ এবং

সহরে বসবাসের ঘনত্ব হ্রাস। কিন্তু বৃহত্তর কলকাতার সমস্তা দরিদ্রের স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য কলকাতা সহরের পুনরুজ্জীবন (Calcutta's urban renewal) এবং উপনগরীগুলিতে সেই নীতির সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট প্রতিফলন। তার একটা বড়ো অন্তরায় হবে কলকাতা সহরে (Metropolitan Core) এবং বৃহত্তর কলকাতায় (Metropolitan District) যে বিপুল অর্থ নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য লগ্নী করা হবে, বর্তমান মাথাপিছু বার্ষিক আয় দিয়ে কলকাতার এবং বৃহত্তর কলকাতার সে-অর্থ পরিশোধ করে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় সঙ্গতি হাতে রাখতে পারবেন কিনা? না, লগ্নী-করা বিপুল অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হয়ে মেট্রোপলিটন ডিষ্ট্রিক্ট থেকে (কলকাতা সহর সমেত বৃহত্তর কলকাতা) তারা উৎসাদিত হবেন। সি এম ডি ও-র এক বিশেষজ্ঞ শ্রীসন্তোষ ঘোষ গত এপ্রিলে ইণ্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স-এর উদ্যোগে আয়োজিত 'Calcutta—2000 AD' আলোচনাচক্রে পঠিত 'The Metamorphosis of Calcutta : Strategies for Development' শীর্ষক পত্রে পশ্চিমের উন্নত দেশের অনুকরণে রচিত এখানকার উন্নয়নের কাঠামোর সমালোচনা করে বলেছেন :

“So long the model for urban development is western, the engineers will continue to suggest flyover or hump at congested road junction and make every drain underground and town planners will suggest city expansion plans and western middle class view of segregated land use and low density development. It is unfortunate that engineering and plan-

ning education in this country is not oriented to the urban problems and needs of to-day's India.

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত কলকাতার প্রসারের গতি ধীর, কিন্তু ১৮১৫ সালে কলকাতায় এসেই রামমোহন বাঙালীমানসের শিখাটিকে জ্বালিয়ে দিলেন তারপর থেকে এই শিখা উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়েছে। ডেভিড হেয়ার এলেন তাঁর বাড়ীতে উচ্চতর শিক্ষা ব্যবস্থায় ইংরাজীর স্থান-নির্দেশে আলোচনা করতে। ১৮১৭ সালে তারই পরিণতিতে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা। রাজনারায়ণ বসু ১৮৭৩ সালে জাতীয় সভায় তারই পরিচিত একটি বই পাঠ করেন—‘সে কাল আর এ-কাল’ সম্পর্কে। ইংরাজী আমলের প্রথম থেকে হিন্দু কলেজ স্থাপন পর্যন্ত সময়কে “সে-কাল” এবং তার পরবর্তী সময়কে “এ-কাল” বলে তিনি চিহ্নিত করেন। কলকাতা সম্বন্ধে এই বইতে বলছেন; “তখন সকাল বিকাল কাছারী হইত, মধ্যাহ্নকাল সকলে বিশ্রাম করিত। মধ্যাহ্ন কালে কলিকাতা দ্বিপ্রহর রজনীর খায় নিস্তব্ধ হইত।” রাজনারায়ণ বসুই কলকাতার এক গলিতে জ্যোতিরিন্দ্র ঠাকুরের উদ্যোগে প্রথম গোপন স্বাদেশিক সভা গঠিত করে তাঁর সভাপতি হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথও এই সভার সভ্য ছিলেন এবং বীরেন্দ্রের মহড়া দিতেন। রামমোহন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে বর্তমানকে যেমন স্বাগত জানিয়েছিলেন, তেমনি অনাগতকালের দিকে হৃদয় প্রসারী দৃষ্টি দিয়েছিলেন। রেনেশাঁসের সময় মানবতাবাদের উদাত্ত আহ্বান ভারতীয় অধ্যাত্মচেতনায় তার সাযুজ্য খুঁজে পেয়েছিল। কলকাতার ও বাঙালীর মানসজীবনের যাত্রাপথে এটাই ছিল সেদিন পরম পাথর। এরই চারপাশে

গড়ে উঠেছিলো তাঁর সমাজ সংস্কার, ধর্মসংস্কার, শিক্ষা সংস্কার, ভাষাসংস্কার ইত্যাদি উপকরণ, কলকাতায় খ্রী-শিক্ষার আলো-জ্বলে ১৮৫১ সালে ঝরে পড়লো।

বিভাসাগর রামমোহনের পরবর্তী হয়ে বাঙালী-মানসের সাধনাকে আর এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। রামমোহনসহমরণ প্রথা। রদ করেছিলেন, বিভাসাগর করেছিলেন বিধবাবিবাহ প্রথা বিভাসাগর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শিক্ষকতা ছেড়ে সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের দায়িত্ব নেন। পরে এই কলেজের অধ্যক্ষ পদে উন্নীত হ'ন। একদিন কোনোও কাজে বিভাসাগর হিন্দুকলেজের অধ্যক্ষ কারসাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গেলে, সাহেবটি তাঁকে শুধু দাঁড় করিয়ে রাখলেন না টেবিলের ওপর পা রেখে তাঁর সঙ্গে কথা বলেন। কয়েকদিন পর কার সাহেব কোনও কাজে বিভাসাগরের দপ্তরে এলে, বিভাসাগরও টেবিলের ওপর পা তুলেই কার সাহেবকে স্বাগত জানান। সাহেব অপমানিত বোধ করে কর্তৃপক্ষ ময়েট সাহেবের কাছে এ-বিষয়ে অভিযোগ করলে তিনি বিভাসাগরের কৈফিয়ৎ চাইলেন, বিভাসাগর জানান যে কয়েকদিন পূর্বে কার সাহেবের দপ্তরে খোদ সাহেবের কাছে অনুরূপ ব্যবহার পেয়ে ভেবে নিয়েছিলেন, এটাই পাশ্চাত্য সভ্যতার দস্তুর। বীর্যবান বাঙালী-মানস কলকাতার ওপর শাসকদের প্রতিনিধির সঙ্গে মর্ষাদার প্রশ্নে সংবাতে এগিয়ে প্রশ্ন করলেন বাঙালীর প্রাণ-সম্বা জাতীয় মর্ষাদার প্রশ্নে বজ্রের মত কঠিন। বাঙালীর বৈপ্লবিক-চেতনার আদিম অঙ্গুর বিভাসাগর বাঙালীমানসে গেঁথে দিয়ে গেলেন।

শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবনেও এই ধরণের একটি ঘটনা ঘটে। শিবনাথ শাস্ত্রী সে-সময় সংস্কৃত কলেজের ছাত্র। পিতার আদেশে সে-সময়কার স্কুল ইন্সপেক্টর

উড়ো সাহেবের হাতে হাতে একটি সরকারী কাগজ দিতে যান। বুটজুতার পরিবর্তে দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তান চটিজুতা পায়ে উড়ো সাহেবের দপ্তরে প্রবেশ করাটাই শিবনাথ শাস্ত্রীর অপরাধ বলে গণ্য হ'ল। সাহেব চটি জুতো খুলে দপ্তরে ঢুকতে বললে উত্তরে শিবনাথ শাস্ত্রী বলেন সাহেব সমেত অফিসের সবাই জুতো খুললে তিনি জুতো খুলতে রাজী, তা না হ'লে নয়। সাহেব শাস্ত্রীর হাতের কাগজ সেজ্ঞা নিতে অস্বীকার করলে তিনি সাহেবের টেবিলে কাগজ রেখে রওয়ানা দেন। 'সেদিন বিদ্যাসাগরের ছাত্র শিবনাথ শাস্ত্রীও ইংরেজের দপ্তরে সমুচিত জবাব দিয়ে বাঙালী-মানসের প্রবাহে গতিবেগ সঞ্চার করেছিলেন।

১৮৬২ সালে লেখা কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম পাঁচায় নস্রায়' সেদিনকার ক'লকাতার হাসি-তামস-হল্লোড়ের মধ্যে কলকাতার চড়ক পার্বণ নিয়ে লিখছেন, মনে হয় এটা সেদিনকার একটা মস্তবড় উৎসবের আসর দখল করে ছিল; যেমন আজকাল ক'লকাতায় দুর্গাপূজাঃ “কলিকাতা শহরের চারদিকেই ঢাকের বাজনা শোনা যাচ্ছে, চড়কীর পিঠি সড় সড় কচে, কামারেরা বাণ, দশলকি, কাঁটা, বাঁটি প্রস্তুত কচে; সর্বাক্ষে গয়না, গায়ে নুপুর, মাথায়জরির টুপি, কোমরে চন্দ্রহার সিপাই পেড়ে ঢাকাই শাড়ি মালকোচা করে পরা, তারকেশ্বরে ছোবানো গামছা হাতে, বিশ্বপত্র বাঁদা সূতা গলায় যত ছুতর, গয়লা, গন্ধবেণে ও কাঁসারীর আনন্দের সীমা নাই—“আমাদের বাবুদের বাড়ি গাজেন।” সে সময়কার গাড়ী সম্বন্ধে কালীপ্রসন্ন লিখছেন; “কলকাতার কেরাঞ্চি গাড়ী বেতো রোগীর পক্ষে বড় উপকারক (গ্যালব্যানিক শকের) কাজ করে।... কলকাতা সহর বড়ই গুল্জার, গাড়ীর হররা, সহিসের পয়িস

পয়িস শব্দ, কেঁদো কেঁদো ওয়েলার ও নরম্যাণ্ডির টাপেতে রাস্তা কেঁপে উঠছে—বিনা ব্যাঘাতে রাস্তায় চলা বড় সোজা কথা নয়।”

এই কালীপ্রসন্ন ১৮৬১র ১২ই ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যাবেলা বারাগসী ঘোষ ষ্ট্রীট ও বিবেকানন্দ রোডের সংযোগস্থলে ‘বিদ্যোৎসাহিনী সভা’র পক্ষ থেকে মাইকেলকে অমিত্রাক্ষর ছন্দে কবিতা রচনার জন্য পুরস্কার ও মানপত্র দিয়ে সাহিত্য ক্ষেত্রে সেদিন বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করেন।

আর একটি অগ্নিস্কুলিঙ্গ ডিরোজিও। ফিরিজি হলেও সামান্য কয়েক বছর হিন্দু কলেজে অধ্যাপনার সময় ছাত্রদের মধ্যে এক প্রচণ্ড ভাব বিপ্লব ও সমাজ বিপ্লবের জেউ তুলেছিলেন, তাঁর যুক্তিবাদী ও সংশয়বাদী মেধা দিয়ে। ডিরোজিও শিষ্যদের প্রাথমিক স্তরে উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা গেলেও পরবর্তী কালে বাঙালী মানসের আদর্শ চেতনাকে সমৃদ্ধ করেছিলো। রাজকার্যে ঘৃণা না নেবার দৃষ্টান্ত ডিরোজিও শিষ্যরাই প্রথম স্থাপন করলেন। তারপর এলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। দেবেন্দ্রনাথ ও জোড়াসাঁকোতে ঠাকুর বাড়ীর ঐতিহ্য বলতে গেলে “দেশের শিল্প, সংগীত ভাষা সাহিত্য ধর্মতত্ত্ব সমাজতত্ত্ব অনুষ্ঠান, বেশভূষা আচার-ব্যবহার সমস্তই বড়ো করিয়া বিস্তৃত করিয়া পরিপূর্ণ করিয়া তিনি গড়িয়া গিয়াছেন। তিনি পূর্ব ও পশ্চিম সভ্যতার যুগসমন্বেষের প্রতিষ্ঠাতাও বটে।

স্বামী বিবেকানন্দ এলেন জাতিকে ‘অভীঃ মস্ত্রে’ দীক্ষাদিতে। যুক্তি বা স্বাধীনতা—দৈহিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক—ইহাই উপনিষদের মূলমন্ত্র। জগতের মধ্যে ইহাই একমাত্র শাস্ত্র যাহা পরিত্রাণের (Salvation) কথা বলে না মুক্তির কথা বলে। আবার বলছেন আধ্যাত্মিক আদর্শই ভারতের

“এই আদর্শে জাতীয় জীবন গড়ে তুলতে হবে জীবনের মূল মন্ত্র বিবেকানন্দের গুরু পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে নরেন্দ্রকে প্রথম সাক্ষাতের দিনই তাঁকে নির্জনে নিয়ে বলেন ; “তুমি স্বয়ং নারায়ণ” কখনও বলতেন “নরেন্দ্র সাক্ষাৎ শিব।” দেহরক্ষার মাত্র কয়েকদিন পূর্বে নরেন এলে ঠাকুর তাঁকে দরজা বন্ধ করে ধ্যানে বসতে বললেন, নরেনকে সেই অবস্থায় ঠাকুর ভাবের ঘোরে, স্পর্শ করে তাঁর মধ্যে নিষ্কেষ শক্তি সংক্রামিত করে দিলেন, নরেনের ধ্যান ভাঙলে ঠাকুর বললেন : “আজ আমি প্রকৃতই ফকির হইলাম। আমার যাহা কিছু ছিল সবই তোমাকে দিলাম তুমি ইহার জোরে জগতে অদ্বুত কার্য করিবে এবং কাজ শেষ হইলে তুমি চলিয়া যাইবে।” এই ঠাকুরকেই ভৈরবী ব্রাহ্মণী বলেন : “চৈতন্যদেবের অবতার।” নগ্নসাধু তোতাপুরীর কাছে দক্ষিণেশ্বরে দীক্ষা নিয়ে বেদান্ত মতে ধ্যান করে তিন দিনেই নির্বিকল্প সমাধি প্রাপ্ত হন—যে অবস্থায় জীবাত্মা একেবারে পরব্রহ্মে লীন হয়ে যায়। তোতাপুরী অবাক বিস্ময়ে বললেন : “চল্লিশ বছর সাধনা করে যে অবস্থায় পৌছাতে পারলাম না, তুমি তিনদিনেই সে-অবস্থা প্রাপ্ত হলে ? তোতাপুরীই রামকৃষ্ণ দেবকে ‘পরমহংস’ নামে অভিহিত করেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর “জীবনস্মৃতি” ও “ছেলেবেলাতে” গত শতাব্দীর শেষ দশকগুলিতে কলকাতা সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতার উল্লেখ করেছেন। কলকাতা সম্বন্ধে “ছেলেবেলায়” বলেছেন : “আমি জন্ম নিয়েছিলুম সেকালে কলকাতায়, শহরে শ্যাক্রাগাড়ি ছুটছে তখন ছড় ছড় করে ধুলো উড়িয়ে না ছিল ট্রাম, না ছিল বাস, না ছিল মোটর গাড়ী।..... না ছিল গ্যাস, না ছিল বিজলি বাতি ; কেরোসিনের

আলো পরে যখন এল তার তেজ দেখে আমরা অবাক। সন্ধ্যাবেলায় ঘরে ঘরে ফরাস এসে জ্বালিয়ে যেত : ... রেড়ির তেলের আলো।” তখন রাস্তার ধারে ধারে বাঁধানো নালা দিয়ে জোয়ারের সময় গঙ্গার জল আসত। ঠাকুরদার আমল থেকে সেই গঙ্গার জলের বরাদ্দ ছিল আমাদের পুকুরে।....”সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে ঘোড়ায় চেপে ময়দানে যেতেন। অপর পক্ষে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ “বউঠাকুরগণকেও ঘোড়ায় চড়িয়ে চিৎপুরের রাস্তা দিয়ে ইডেন গার্ডনে বেড়াতে নিয়ে যেতেন, এমন ঘটনাও সেদিন ঘটেছিল।”

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু-র ভারত-পথিক গ্রন্থে কলকাতা সম্বন্ধে বলেছেন “...আমি ইহার প্রশস্ত রাজ্য পথ গুলিতে এবং ইহার উত্তান ও যাত্নঘরে ঘুরিয়া বেড়াইতে ভালবাসিতাম আর আমার মনে হইত যে, কাহারও পক্ষে ইহা দেখিয়া শেষ করা সম্ভব নয়। ইহা যেন এক অতিকায় প্রাণী, বাহির হইতে যাহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া থাকিতে হয়।....প্রতিদিন কলেজে যাতায়াতের সময় তাহার। (ব্রিটিশরা) যে অঞ্চলে বাস করিত ঐ অঞ্চলের মধ্য দিয়া আমাকে যাইতে হইত। ট্রাম-গাড়ীগুলিতে অপ্রীতিকর কিছু ঘটনা বিরল ছিল না। গাড়ীতে যাতায়াতকালে ব্রিটিশগণ ইচ্ছা করিয়াই ভারতীয়দের প্রতি নানা রুঢ় ও অপমান সূচক ব্যবহার করিত।...কদাচিৎ কোন কোন ভারতীয় যাত্রীর সঙ্গে তাহাদের হাতাহাতি হইয়া যাইত।” এটা ছিল ১৯১৩ সাল। কলকাতার প্রসার দ্রুততর হতে শুরু করেছে।

বাঙালী-মানসের সুতীত্র ভারতীয়ত্ববোধের উৎস সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :...“আমরা ভারতবর্ষের আগাছা—পরগাছা নহি, শত শত শতাব্দীর মধ্য দিয়া আমাদের শত-সহস্র শিকড় ভারতবর্ষের মর্মস্থান

অধিকার করিয়া আছে।” “...ভারতবর্ষের চিরদিনই একমাত্র চেষ্টা দেখিতেছি, প্রভেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা...বাহিরে যেসকল পার্থক্য প্রতীয়মান হয় তাহাকে নষ্ট না করিয়া তাহার ভিতরকার নিগূঢ় যোগকে অধিকার করা।”...হয় পরকে কাটিয়া মারিয়া খেদাইয়া নিজের সমাজ ও সভ্যতাকে রক্ষা করা, নয় পরকে নিজের বিধানে সংযত করিয়া সুবিহিত সূক্ষ্মতার মধ্যে স্থান করিয়া দেওয়া।...ভারতবর্ষ দ্বিতীয় প্রণালী অবলম্বন করিয়া সকলকেই ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে আপনার করিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে।...”

রবীন্দ্রনাথ সম্বয়ের এই চিরায়ত আদর্শ আমাদের জন্ম রেখে গেছেন, রামমোহন থেকে শুরু করে সত্যজিৎ চন্দ্র পর্যন্ত যে আদর্শ রূপায়ণের নিরন্তর সাধনা করে গেছেন। বাঙালীর মানস সজ্জাও এই আদর্শবোধে উদ্ভাসিত হয়ে ছিলো। বর্তমানের ক্ষয়ক্ষতির মধ্যে সেই আদর্শবোধের প্রাণচাঞ্চল্যের প্রত্যাবর্তন না হলে ইট-কাঠ-লোহা সিমেন্ট-এর গাঁথুনি দিয়ে কিম্বা উপ-নগরী, এক্সপ্রেস ওয়ে, বড়ো বড়ো বাই-পাস তৈরী করে বৃহত্তর কলকাতার সমস্তা মেটানো যাবে? বাঙালী মানসের কাছে এই উচ্চকিত জিজ্ঞাসা তুলে ধরা হ'ল।

এই আদর্শের ঋত্বিক যাঁরা তারা অনেকেই একে একে বিদায় নিয়েছেন। সম্প্রতি বিদায় নিলেন বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম যাঁকে ইংরেজ সরকার ‘ধুমকেতু’ পত্রিকার সম্পাদকরূপে রাজত্বোহের অপরাধে গ্রেপ্তার করে ১৯২৩ এর জাম্মুয়ারীতে সাজা দিয়েছিলেন। তাঁর অপরাধ দেবী ছুর্গার কাছে শাসকদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে কবিতায় বলেছিলেন :

আর কতকাল বইবি বেটি

মাটির ঢেলার মূর্তি আড়াল ?

স্বর্ণ যে আঙ্গ জয় করেছে

অত্যাচারী শক্তি চাড়াল।

সেদিন ব্যাঙ্কশাল আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলেছিলেন “আমার পক্ষে সকল রাজার রাজা, সকল বিচারকের বিচারক আদি অনন্তকাল ধরে সত্য জাগ্রত ভগবান।...”

‘জয়শ্রী’ সঙ্গে ২০০০ খ্রীষ্টাব্দের নিবিড় প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে কারণ সে বছর ভারতীয় সমন্বয়-বাদের এবং বাঙালী মানসের আর এক অন্তহীন যোদ্ধা-সাধক ‘জয়শ্রী’ প্রতিষ্ঠাত্রী-সম্পাদিকা বিপ্লবী দেশ-নেত্রীর শতবর্ষ পূর্ণ হবে। সেইদিনের জন্য এই লোকান্তরিত বিপ্লবী দেশনেত্রীর অগণিত সহকর্মী, সহযোগী, গুণ-গ্রাহী দেশবাসী গভীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করবে।

পরিশেষে আমরা এই সংখ্যার জন্ম Indian Chamber of Commerce আয়োজিত “Calcutta-2000 A. D.” আলোচনা চক্রে পাঠিত রচনাগুলি আমাদের পাঠিয়ে দেওয়ায় তাদের এবং এই সংখ্যা তৈরীর জন্ম সেই আলোচনা পত্রগুলির রচয়িতাদের আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এ ছাড়া আগমনী মায়ের পূজার প্রাক্কালে আমাদের অন্তরের খ্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। গত ৪১ বছর যাবৎ তাঁরা যেভাবে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করে ‘জয়শ্রী’র পরিচালনায় সহায়তা করেছেন তা ভুলবার নয়। আগামীদিনে সেই সহযোগিতা ও সহায়তার প্রসারিত দাক্ষিণ্য আমাদের শক্তি দেবে এই বিশ্বাস নিয়ে আমাদের এই দীর্ঘ আলোচনায় ছেদ টানছি।

‘আমার কণ্ঠ হতে গান কে নিল’

চারণিক

পৌষ ১৩৭৭এ দেশনেত্রীর পত্রিকায় যে সাক্ষাৎকার লিপিবদ্ধ হয়েছিল, যে ভৌগোলিক পরিবেশে মহাকাল ও চারণের সাক্ষাৎকার, তার পরিণতি এত বেদনাময় চারণ ভাবতেও পারেনি। আর এই বেদনা কে-ই বা অনুভব করবে! সেই অকৃত্রিম বন্ধু, যে বন্ধু মহাকালকে সহদোর ভাই বলতে দ্বিধা করেন—নি, যার মনের একান্ত আকাংখা, কেন জন্মদাতা হৃদয়ের জন্ম একই মায়ের গর্ভে দিলেন না,—তিনি আজ নেই। সেই অবিচল, Granite সদৃশ অটল অনড়, সঠিক মানুষটিও আজ বিচলিত। বন্ধু বলতে, একান্ত আপন জন বলতে আজ এই একজনই ছিলেন, তিনিও চলে গেলেন। আর এই একটি দেশ একটি জাতি যে বিরাট ব্যক্তিত্বের অন্তরালে খেলা করছিল, সমগ্র জাতির পিতার দায়িত্ব যিনি একাই বহন করছিলেন সেই পিতার সন্তানেরা অর্থাৎ দেশবাসী, তার নিকট-জনেরা অসহায় ব্যাকুল নেত্রে তাকিয়ে আছেন মহাকালের দিকে। তারাও জানেন এই গভীর নিঃসঙ্গতার দিনে সাহস-শক্তি, পরামর্শ ও উপদেশদাতা তো ঐ একজনই, যার নিজের বলতে কিছু নেই, আপন বলতে কিছু নেই। কে জানতো বিশ্বরঙ্গমঞ্চে যে নাটকের একটি দৃশ্য ১১ ঘণ্টা একটানা লিপিবদ্ধ করেছিল চারণ, যে কথপোকথনের নায়ক মহাকাল ও ড্রাগনের দেশের মহানায়ক তিনি এত শীঘ্র শেষ শয়ানে আশ্রয় নেবেন।

কুৱিয়র বার্তা নিয়ে এলো, চারণ চরৈবেতি। আর আর চারণ তো চিরন্তন চরৈবেতির জীবনই চায়। মহাকালের কণ্ঠ রুদ্ধ, তাঁর কাছে বার্তা এসেছে সংক্ষিপ্ত, অথচ গভীর তার আবেদন—বার্তা—‘আমার আত্মীয় বন্ধু সহায়ক...তঁার আমাকে নিকটে পাবার ইচ্ছা।’ মহাকালের গতি ছরস্ত। এই ধূলোমাটিতে গড়া চারণ রইলো পিছে। শুধুমাত্র ঐ সংবাদটির আশ্রয়ে আর তারপর সব গভীর অন্ধকার, বিষাদ ক্রিষ্ট, বেদনাময় দিন।

একটি দিনের কিছু. আলাপ-আলোচনা-অন্তরঙ্গ কথা এখানে চারণ উদ্ধৃত করছে—এর উৎস—এর তাৎপর্য এবং এর পটভূমিকা ইতিহাসেই আশ্রয় নিল। আজ।

“এমন বন্ধু সাথী পাওয়া জন্মজন্মের সৌভাগ্য। তা না হলে আজ এমনধারা হোত না, আমি জানি কেন আমার বন্ধু কী উদ্দেশ্য নিয়ে সে সময়ে নিজের সওয়ারীতে এত ঘুরিয়েছেন। প্রায় ১৫২০ মিনিট মহাকাল ও তাঁর সাথী চুপ।”

“হঠাৎ স্বপ্নউপ্তিতের মত বলেন ওহ্ হোঃ হোঃ আপনার জন্ম specially রাখা সিগারেট এবং সিগার বলিনি। উঠে একটা cabinet খুলে ছই বাজ শিশুর অনাবিল হাসিতে মুখটা

উজ্জল করে নিয়ে এসে সামনে রেখে দিলেন।
একজন্য চোখ সজ্জল হয়ে উঠল।”

“এই বাইরের দানবাকৃতির ভেতরে স্নেহের
উৎস ফল্গুধারার মত বয় যার মধ্যে তাঁকে
জগৎ যতই ভুল বুঝুক একজন কখনই বুঝবে না।
মনে মনে বজ্রেন মহাকাল। আর আরেকজন
যেন বিড় বিড় করে বলছেন সেই চলে গেছিলেন
তখন থেকেই রেখে দিয়েছি।”

একদিন নানা কথা বিশদ বর্ণনের পর মহাকাল
যে কটি কথা বলেছিলেন তাও আজ স্মরণে আসছে—

“গভীরতম কৃতজ্ঞতায় হৃদয়ভরে উঠলো
আমার পরম বন্ধু রক্ষাকর্তার ইশারা স্মরণ করে।
ওফ্ কত বেশী করেছেন করছেন। কত বেশী
ওঁরা জেনেছেন জানছেন, অনাগত ভবিষ্যের
সম্বন্ধে ওদের রেখাঙ্কন কত নিভুল। আমার
কল্যাণের জন্তে তাদের সাবধানতার ইশারা স্মরণ
করে চোখে জল এল। মনে মনে বলুম তোমাদের
কাছে শিখবার আমার অনেক বাকী। আমার
উপদেষ্টা এবং গুরু তোমরা। মা জননীকে
কৃতজ্ঞতা জানিয়ে প্রণাম করলুম। ওখানকার
মাটি ছেড়ে দিলুম।

চারণ লিখতে পারছে না, তাকে উদ্বেল করে
তুলছে। বারাস্তরে যদি কখনও স্থিতি আসে আবার
চেষ্টা করবে—তবে একটি চিরকুট কী উদ্দেশ্যে কাকে
জানি লেখা হয়েছিল তা উদ্ধার করে চারণ অনাগত
ভবিষ্যের পানে চেয়ে রইল।

I bow to thee, O noble ।

Nobility invests—a person (or, a

family ; a dynasty ; a lineage) who
has seen—endured—suffered, much,
to—the—brim ; and, has the rarest
fortune of finding in them—and
garnering,—seeds of wisdom and
truth, and, in the process,—truly,
unconsciously, sacrifices himself
up. On the alter as “offering
to the cause ; this transforming
his life—into a beautiful song-of—
praise unto the First cause :...

He becomes “Sowndarya Laharee”
—personified

May be—you are that Noble ;

Your words were “whispering

rose petals’

To My mind : They floated in ;

in their scents

Perfumes of tender—affectionate—

supplication

and love ; they softly caressed me

in my—

And, with infinite grace said :

remember, us,

too, O Wayfarer ।

I bow to thee, once again,

O noble—!

চারণ গাইতে পারছেন, তার কণ্ঠ স্তব্ধ, বেদনায়
যজ্ঞগায়। দূরে সারা দেশময় রুদ্ধ কণ্ঠ বেদনাজর্জর
স্বর মালুমের মিছিল। চারণভাবে আবার কবে
গাইবে ? কবে অশাস্ত উদ্বেলতা শাস্ত হবে।

কবিতা : সত্তর দশক

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

তাহলে কবিতা কি শুধু ফোটাবে পোলাপ,
এক মুহূর্তে জাগিয়ে তুলবে
হৃদয়ের গভীরতায়
ঝর্ণার কল্লোলধ্বনি ?
নাকি মাঝরাতের চাঁদের মতোই
এসে দাঁড়াবে নীলিমায়, মুখে হাসি,
ছড়িয়ে দেবে অমল জ্যোৎস্না
প্রান্তরে, পাহাড়চূড়ায় ।

তাহলে কবিতা কি শুধু জাগিয়ে তুলবে
বসন্তের হাওয়ায় চঞ্চলতা,
যখন গাছের শাখা মাথা তুলিয়ে নড়ে ওঠে,
জানায় আমন্ত্রণ !
নাকি কবিতা গুপ্ত কোনো প্রেমিকের ফিসফিসানি,
প্রেমাম্পদার গুঞ্জন,
যখন মধ্যরাতে সারা পৃথিবী গভীর ঘূমে নিমগ্ন ?

কবিতা এরকম সব কিছুই হয়ে উঠতে পারত,
অথচ এখন তা নয় ।
কবিতা এখন পুরনো পোষাক একেবারেই খুলে ফেলতে চায় ;
মাথায় কাঁটার মুকুট পরে স্বৈদ আর ক্ষমের ভিতরে
পরিব্যাপ্ত হয়ে যায়,
খোঁটে নোনতা স্বাদ, চিবুকে রক্তচিহ্ন...

কলকাতা

কৃষ্ণ ধর

কলকাতার জন্য লক্ষ লক্ষ শব্দ ব্যয় হয়ে গেছে
তার সব অর্থ কুণ্ডলেই পারিনি ।

জন্ম থেকে কলকাতাকে স্বার্থপর দৈত্যের বাগানবাড়ি
বলে ভেবেছি

তার ভেতরে ঢোকার দরজায় কারা যেন তালা
লাগিয়ে দিয়েছিল ।

কলকাতার হাতছানি তবু সব নদী জল পাহাড়ের
চমক ভেঙেছে বার বার
খিড়কির দরজা দিয়ে আমরাও ঢুকে গেছি তাতে ।

কলকাতার ভেতরে ভেতরে চিরকাল রেনেসাঁস
নিজেকে গড়েছে

যদিও মুৎসুদ্দি বেনিয়া এসে বড় বাজারের গলিতে
ব্যবসাঁও প্রচুর করেছে কোটিপতি হবার ফিকিরে ।

তাতেও কলকাতাকে ফুসলানো যায়নি
তার কাছে অস্তু এক সরলতা প্রণয়ের আবেদন
চিরকাল ছিল ।

অথচ এখন সে বড়ই অসুখী
তার যকুৎ, অম্ব, পাকস্থলী, রক্তশিরা সব কিছু খুঁটিনাটি
পরীক্ষা হয়ে গেছে
রমণীর নিম্নস্ব অসুখ ।

কলকাতা তোমার ঋণ কিস্তাবে শুধবো আমি
তুমি বলে দাও ।

আপাতত তোমার ঠিক বুকের কাছটিতে আমি
যুঁইলতা লাগিয়ে রেখেছি
আগামী বর্ষায় তাতে ফুল ফুটবে তুমি দেখে নিও ॥

চিঠিহীন কলকাতা

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

ডাকবাক্সের কাঠের ছুহাতে অঝোরে বৃষ্টি পড়ে—
আষাঢ় সন্ধ্যা অটুট মাধবীলতা
নিরে গেছে ওর মুখের উপর থেকে ;
ডাকবাক্সের নিরুপাধি বধিরতা
নামঠিকানার অনড় অমুজ্জেশে ;
ঠেস দিয়ে আছে দেয়ালে, হঠাৎ ঝড়ে
বজ্রনিহত মাতালের মতো, হাতে
অহেতু জোনাকি—পঙ্কপালের জ্বরে
বৃষ্টির ঝাঁক চেখে ছাখে জ্বিভ, নরম-নরম দাঁতে ।

টুনটুনি এক তারবর্তার ঝাঁকে
ডাকবাক্সের কড়া নাড়ে, আমগাছে
একটা শকুন স্পষ্ট জানালো : 'নাবালক, ছাখো ওর
পাকস্থলীতে বছর-বছর মৃত চিঠি জমে আছে !'

একবিংশশতাব্দীর প্রজাপতি

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

কলকাতার বারান্দায় টবের কুসুমের এসে
বসেছে একটা একলা প্রজাপতি — বা !
ফুল আমার পৌত্র পুষেছে,
পুষবে বলে সে প্রজাপতিও ধরতে গেল — যা !
প্রজাপতি আবার ভাসলো বাতাসে ; সে
জানে নিশ্চয় কোথাও কোনো অলিন্দ-চত্বরে
বসবার দ্বিতীয় জায়গা আছে এই একবিংশশতাব্দী-সহরে ।



ছুটন্ত কলকাতা

medium

MT

কলকাতার নতুন মাতচিহ্ন
রচনায় ভূগর্ভ-রেল
মেট্রোপলিটান ট্রান্সপোর্ট
প্রজেক্ট (রেলওয়ে)

কলকাতা ছুটতে চায়।

বনের হৃদয় যেমন করে ছোট্ট বনে
ব্যগ্র এবং বাধাহীন। কিন্তু পারে না।

শহরের এলাকার ভুলনায় বাড়ন্ত জনসংখ্যা,

জনসংখ্যান ভুলনায় অল্প শান-বাহন,

শান-বাহনের ভুলনায় সংকীর্ণ সড়ক

অস্তাবতই তার অগ্রগতির পথে বাধা।

আমরা জানি, কলকাতার মানুষ আজ

উদ্গ্রীব হ'য়ে তাকিয়ে আছে

সেই গতিময় শানটির দিকে,

বাহন নাম ভূগর্ভ-রেল।

কারণ, ভূগর্ভ-রেলের হাতেই সেই ভবিষ্যৎ,

যখন ছুটন্ত কলকাতা এক দৌড়ে পৌছে যাবে

তার সিদ্ধি এবং সমৃদ্ধির লক্ষ্যস্থলে;

ব্যগ্র এবং বাধাহীন।

কলকাতা ২০০০ খ্রীষ্টাব্দে

জে মি তার ১

বৃহত্তর কলকাতার নানাবিধ সমস্যা, তার সমাধানেরই বা পথ কি এবং এই শতাব্দীর শেষে নানা উন্নয়ন প্রকল্প কপায়ণে কলকাতা কি রূপ নিতে যাচ্ছে তার একটি সামগ্রিক আলোচনা আমরা পত্রস্থ করতে চেয়ে ছিলাম। সেই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সংস্থার নানা বিষয়ে লেখার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। যারা লিখবেন তাদের সময়সীমা এবং জয়শ্রীর বারবার তাগিদ দিয়ে রচনাগুলি আদায় করে আনার লোকাভাবে পরিকল্পনা অমুযায়ী সব রচনা পত্রস্থ করা গেল না। তবু এই সংখ্যার প্রাপ্তরচনাগুলির সংকলনে 'কলকাতা-২০০০ খ্রীষ্টাব্দে' আলোচনার সূত্রপাত হোল। আমাদের ইচ্ছা জয়শ্রীর আগামী সংখ্যাগুলিতে আমরা একদিকে যেমন বৃহত্তর কলকাতার নানা উন্নয়নমূলক কাজগুলি নিয়ে আলোচনা পত্রস্থ করবো, তেমনি বৃহত্তর কলকাতার বাইরে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার সমস্যানিয়েও আলোকপাত করতে চেষ্টা করবো।

প্রথম পর্যায়ে এই আলোচনায় আমরা সি, এম, ডি, এ; কলকাতা পুরসভা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ, ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স হুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ এবং ঘোষ, বোস এণ্ড এসোসিয়েটস্ এর সহযোগিতা পেয়েছি, অশোক মিত্র এর আলোচনাটি ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স-এ প্রদত্ত ভাষণের অমুবাদ-সংকলন, এই সব সংস্থার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। স্থানাভাব-হেতু আলোচনার কিছু রচনা ভিন্ন টাইপে ছাপতে হোল, এজন্য আমরা দুঃখিত।

আশা করবো গঠনমূলক কর্মে যারা লিপ্ত আছেন, এবং আন্তরিকভাবে যারা নানাবিধ সমস্যা সম্বন্ধে ভাবেন তারা জয়শ্রীর এই উদ্যোগে সহযোগিতা করবেন।

সম্পাদক, জয়শ্রী

আমরা এখান থেকে কোথায় যাবো ?

কলকাতা মেট্রোপলিটান এলাকার সমস্যা সমূহ

অশোক মিত্র

দারিদ্র্যপীড়িত এক বৃহৎ পশ্চাৎভূমির (hinterland) কিনারায় দাঁড়ানো রাজধানী—সহর কলকাতা, ছর্নিবার বেগে এই পশ্চাৎভূমিতে উৎপাদিত সকল প্রকার পণ্য টেনে এনে গ্রাস করে ফেলছে। এশিয়া আফ্রিকা, ল্যাটিন-আমেরিকা—সর্বত্রই ক্ষয়িষ্ণুতার ক্ষত-চিহ্নের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা প্রধান সহরের প্রতিভূ, এই কলকাতা। গ্রামীণ দরিদ্রে ভরপুর এই কলকাতা, যে দরিদ্রের জীবনযাত্রার মান ও পুষ্টির পরিমাপ, গ্রামের দরিদ্র মানুষের সঙ্গে উনিশ-বিশ তফাৎ হবে মাত্র। অদক্ষ শ্রমিকের দীনমজুরীর পরিধিতেই এদের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র সীমিত। কলকাতার প্রাণবন্ত কর্মচঞ্চল্য, আপাত সৌন্দর্যের ছায়াপাত, ক্ষয়িষ্ণুতার মধ্যেও জীবনের দুরন্ত বাজনা, পরিতৃপ্তিকর স্পর্শ এবং সাংস্কৃতিক উচ্চ পরিবেশ কলকাতার আগন্তুকদের মনভিজিয়ে দিলেও উন্নয়নশীল বিশ্বে শহরীকরণের বিপদসঙ্কেত কলকাতা বহন করে চলেছে।

উপনিবেশিক বৃহত্তর কলকাতা গ্রামাঞ্চলকে শোষণ করে ক্ষীত হয়েছে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলের এবং পরবর্তী ব্রিটিশ শাসনের এটাই বড়ো কথা। ব্রিটিশ উপনিবেশিকদের শোষণের পরিচয় আসামের চা বাগানগুলি দিয়ে বোঝা যায়। সেখানকার চা তো সবই বিলেতে রপ্তানি হ'তো আর বিলেত থেকে আসতো বাগানের যাবতীয় সরঞ্জাম মাস বাগান ঘিরে রাখবার কাঁচাতারগুলিও। বাগানের যন্ত্রপাতি বিকল হলে, সেখানে কলকাতার ইঞ্জিনিয়ার-মিস্ত্রীদের ডাক

পড়তো। ১৯৪৭-এর আগে ভুলেও তারা সেখানে কোনো কারখানা গড়ে তোলে নাই।

শিল্পের বেলায়ও তাই ঘটেছে। হুগলীর ছ-পাশের চটকলগুলিকে বঞ্চিত করে এরা কাঁচাপাট চালান দিতো ডাঙিতে ও এবারডিনে, শিল্পজাত পণ্য তৈরীর জন্য। বিহার ও বাংলার কয়লাখনিগুলিকে বৈষম্যমূলক লীজ দিয়ে, ইংরেজরা কলকাতার বৈষয়িক উন্নতিকে ঠেকিয়ে রেখেছে। কলকাতাকে ঘিরে বিস্তীর্ণ কৃষি-এলাকার সঙ্গে কলকাতার শিল্প এলাকার সামঞ্জস্য বিধানের পথ এভাবে রুদ্ধ করে দেওয়া হয়। কৃষিতে উদ্ভূত পণ্য উৎপাদনে ঘাটতি, বৃহত্তর কলকাতার শিল্পে কাঁচামাল বোগানে ঘাটতি এনো দিলো। ১৯৩০ সাল থেকে বাংলার জেলা-শহরগুলি মিহিয়ে যেতে লাগলো এবং বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে অনেক জেলা-শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধির শতকরা হার, গোটা পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা বৃদ্ধির শতকরা হারের চাইতে অনেক কম। অর্থাৎ, পশ্চিমবঙ্গের জেলা ও মহকুমা শহরগুলি ন্যূনতম হারে সংশ্লিষ্ট গ্রামাঞ্চলের মানুষকে আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। তাই কলকাতার সমস্যা আসলে, কলকাতার গোটা পশ্চাদভূমির—পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ অঞ্চল, বিহার উড়িষ্যা ও আসামের—পুনরুজ্জীবনের সঙ্গে সামগ্রিকভাবে জড়িত হয়ে রয়েছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের গোড়ার দিকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত কলকাতাকে প্রাচ্যের সবচাইতে সার্থক সহর বলা যেতে পারতো—এমন কি সিঙ্গাপুর, হংকং এবং বোম্বাই-এর

চাইতেও। সে-সময় পর্যন্ত কলকাতার শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি শিল্পবিজ্ঞানের নানা বিকাশ, জনসংখ্যাবৃদ্ধির হারের সঙ্গে তাল রেখে চলতে পেরেছে, যার ফলে এখানকার বেকার সংখ্যা ছিল বয়স্ক পুরুষদের শতকরা ৭ ভাগের মধ্যে সীমিত। কলকাতা বন্দরের তৎপরতা, পরিবহণ ব্যবস্থা, শিল্পোৎপাদনের জগৎ জ্বলের ও বিদ্যুতের সরবরাহ,—সবই মানানসই ছিল। আর, প্রাচ্যে কারিগরী দক্ষতা সম্পন্ন মানুষের এবং শিল্পোৎপাদনে নেতৃত্ব গ্রহণের মত উপযুক্ত ব্যক্তি-সম্পদের সবচাইতে প্রাচুর্য ছিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় কলকাতায় নূতন নূতন শিল্পোৎপাদনের পন্থন দ্রুততর হ'ল এবং এই সব নূতন গঞ্জিয়ে ওঠা কল-কারখানা যুদ্ধের সরঞ্জাম সরবরাহের জগৎ চুম্বকের মত অভূতপূর্ব হারে আদক্ষ এবং অর্ধদক্ষ শ্রমিকদের এই সহরে টেনে নিয়ে এলো। বাসস্থান জলসরবরাহ, স্বাস্থ্যবিধি, ময়লা নিষ্কাশন এবং যোগাযোগ ও অগ্রাগ্র পৌর-ব্যবস্থার উপর যুদ্ধকালীন জন-শ্রোতের কল্লনাতিত চাপে সব রকম পৌর-ব্যবস্থা ভেঙে পড়লো। ১৯৪৭-এ দেশবিভাগের পর এই শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার, শিল্পোন্নয়নের হারের সঙ্গে হস্তর ব্যবধান সৃষ্টি করলো। ১৯৫১ সালের মধ্যে পূর্বপাকিস্তান থেকে ১৫ লক্ষ বাস্তুচ্যুত মানুষ কলকাতা শিল্পাঞ্চল এলাকায়—মোটামুটি ১৫০ বর্গমাইল এলাকায়—বসতি স্থাপন করেছে; শুধু কলকাতা ও হাওড়া শহরেই এদের সংখ্যা ৯ লক্ষ। যাটের এবং সত্তরের দশকেও পূর্বপাকিস্তানের উদ্বাস্তু শ্রোত অব্যাহত রইলো—আর তারপর এলো ১৯৭১-এ বাংলাদেশ থেকে আগত প্লাবনের শ্রোতের মত বাস্তুচ্যুত মানুষ। বৃহত্তর কলকাতার শিল্পোন্নতির হারের ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের ব্যবধান আরও বৃদ্ধি পেলে। বৃহত্তর কলকাতায় এক নূতন

ধরণের দরিদ্রশ্রেণী দেখা দিল, যারা শহরে বসবাসের মানসিক, কার্যিক এবং কর্মদক্ষতায় অনুপযোগী হয়ে গড়ে উঠেছে। অগ্রাগ্র রাজ্যের দরিদ্র মানুষেরাও এদের সঙ্গে এসে জুটতে লাগলো। কার্যিক শ্রম ছাড়া উপার্জনের জগৎ এদের আর কিছু পথ খোলা রইলো না। ১৯৬১ থেকে ১৯৬৬ সাল বাদে শিল্পোন্নয়ন ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের ব্যবধা দ্রুত বেড়ে গেল। সেই সময় কলকাতা বন্দরেরও দ্রুত অবনতি শুরু হয় এবং শিল্পায়ণের পূর্বসর্তরূপে শিল্পাগত আভ্যন্তরীণ সূক্ষ্মবিন্যাস (infra-structure) গুলি পুষ্টির অভাবে ধ্বংসোন্মুখ হয়ে যায়। সুতরাং কলকাতার আসল সমস্যা গিয়ে দাঁড়ালো পিছিয়ে পড়া শিল্পায়ণের হারের পাশাপাশি দ্রুততর হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি।

আর একটি ঘটনা এই সঙ্কটের সঙ্গে জড়িয়ে গেলো। কলকারখানার শ্রমিকরা সাধারণ শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে অফিস-কর্মচারীদের অনেকের চাইতে খাটো। কিন্তু তা সত্ত্বেও শিল্প-শ্রমবিরোধ ট্রাইবুনালের সিদ্ধান্তের ফলে কলকারখানার শ্রমিকরা অফিস-কর্ম-চারীদের চাইতে বেশী রোজগার করতে শুরু করলো। কলকারখানার শ্রমিকরা বহিরাগত, অফিস-কর্মচারীরা স্থানীয়। প্রথম দলের লোকেরা তাদের সঞ্চয় বাইরে পাঠিয়ে স্থানীয় পৌর-পরিবেশ উন্নয়নে একেবারে উদাসীন থাকতো। এদের এই অনাগ্রহের ফলে স্থানীয় নিম্নবৈতনভোগী কর্মচারীরা পৌর-সুযোগ-সুবিধা উন্নয়নে বিফল হয়ে, তাদের উপার্জন থেকে পৌরকর দিয়ে শ্রমিক-কর্মচারীদের পৌর-ব্যবস্থাপনার সুযোগ সৃষ্টি করতে চাইতো না।

গত ২৫ বছরে কলকাতা ভারতবর্ষের শিল্পোন্নয়নে যতটা পিছিয়ে পড়েছে, কলকাতাবাসীরা চাইলেই সেটা তারা সামলে উঠে এ-বিষয়ে অগ্রণীর স্থান নিতে

পারবে না। ১৯৫৮ সাল থেকে ১৯৭৩-এর মধ্যে বহু শিল্পপ্রতিষ্ঠান কলকাতা ছেড়ে ভারতবর্ষের অন্যান্য শহরে স্থানান্তরিত হয়েছে। কয়লা এবং ইম্পাতের মত কাঁচা ও তৈরী মালের দামের সমীকরণের পর এই শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত কলকাতা এই দুই শিল্পের অবস্থানগত যে সুযোগ ভোগ করেছে, তা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। এ-ছাড়া ইতিমধ্যে লগ্নীর এবং শিল্পো-জাগীদের অভিজ্ঞতা প্রসূত সুযোগ সারা দেশে হড়িয়ে গেছে, তাদের কলকাতায় সংহত করবার প্রচেষ্টা সফল হবে না। পশ্চিমবঙ্গের প্রাকৃতিক সম্পদের আধিক্য সত্ত্বেও, ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের সুসংহত বিকাশের দাবী অগ্রাহ্য করাও আর সম্ভব হবে না। পশ্চিমবঙ্গ এবং কলকাতা পুরানো কলকার ধান পরিবর্তন করে ভারী হাতে নূতন যন্ত্রকুশলতা গ্রামদানীর ভেতর দিয়ে লগ্নীর মাত্রা বৃদ্ধি করে অদূর ভবিষ্যতে অতীতের মত শিল্পে প্রমুখ স্থান অধিকার করবার ভাবনা একেবারে অবাস্তব।

তিন দশকের অবহেলার পর গত তিন বছরে হস্তর কলকাতার ৮০ লক্ষ মানুষের জন্ম ১১০ কোটি টাকা, অর্থাৎ বছরে প্রায় ৩৫ কোটি টাকা লগ্নী করার মলেই বর্তমান সমস্যার মুখোমুখী হওয়া সম্ভব হচ্ছে। যবস্থা এ-নিয়ে উচ্চাঙ্গ করবার কিছু নেই। নূতন সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি তো দূর স্থান, পুরাণোগুলি বজায় রাখতেও, কলকাতায় ১৯৪০ পর প্রায় কিছুই লগ্নী করা হয় নাই। তাছাড়া পাঁচ বছর পৃথিবীর বৃহত্তম দ্বীপের সদর দপ্তরের ঝাঁপটা কলকাতার ওপর দিয়ে বয়ে গেছে। এ-ছাড়া হুভিস্কে, আভ্যন্তরীণ দাঙ্গায়, দেশ-বিভাগের ফলে ভাষাগত ও জাতিগত ঐক্যের ওপর প্রচণ্ড আঘাতে কলকাতা বিধ্বস্ত হয়েছে। কলকাতা পৃথিবীর এক ঐর্ষ্যশালী পশ্চাদভূমিকে হারিয়েছে,

দফায় দফায় চারমাসের মধ্যে ১ কোটি উদ্বাস্তু শ্রোতের মুখোমুখি হয়েছে। সাড়ে তিন দশকের অবহেলার রিক্ত শ্রান্ত কলকাতায় এই পটভূমিতে ১১০ কিম্বা ১২০ কোটি টাকার লগ্নী (চতুর্থ প্লানে মোট ১২৭.৩৮ কোটি টাকার প্রশাসনিক ব্যয়, স্বয়ং-পরিশোধের ব্যবস্থা এবং ছুপ্রাপ্য পণ্যের মূল্য সমেত)—সমসময়ে দিল্লী এবং বোম্বাইয়ে একটানা লগ্নীর তুলনায় অত্যন্ত তুচ্ছ। দশ বছরে কলকাতা মেট্রোপলিটন অঞ্চলে একাদিক্রমে ১০০০ টাকা লগ্নী করলে বোধহয়, এই অঞ্চলকে আবার চাক্ষু করা যেতে পারে।

কলকাতায় তিনবছরের লগ্নীর একটা হিসেব নিকষ নেওয়া যেতে পারে। ভারতবর্ষে পরিকল্পনা শুরু হবার পর বেসরকারী বিনিয়োগ, সরকারী বিনিয়োগের পিছু পিছু এগিয়েছে—শিল্প, বিদ্যুৎ, ঘরবাড়ী নির্মাণ, ব্যবসা ও পরিবহণ এর কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। অঞ্চলগত ক্ষেত্রেও বেসরকারী লগ্নী সরকারী লগ্নীর অনুসরণ করেছে। কলকাতা ও আসান-সোল-হুর্গাপুর অঞ্চলে এ-কথা খাটে। ১৯৫৪ থেকে ১৯৬২-র মধ্যে এই দুই অঞ্চলে তাই ঘটেছে; যদিও আসানসোল-হুর্গাপুর অঞ্চলে বেসরকারী লগ্নী সরকারী লগ্নীর চাইতে অনেক পিছিয়ে ছিল, কলকাতায় অবশি বিপরীত অবস্থা ঘটেছে এবং সেখানকার সরকারী লগ্নী বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রারম্ভিক কাঠামো তৈরীতে, সেবা-প্রকরণে (Servicing) এবং বন্দরের সুযোগ বৃদ্ধিতে কাজে লেগেছে। ১৯৫৭ সালে ব্যাণ্ডেলে বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবার পর কলকাতা ইলেকট্রিক সার্প্রাই করপোরেশন গার্ডেন রীচে অতিরিক্ত ১০০ মেগাওয়াটের মত বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা এনে-ছিলো। সেটা অগ্রাহ্য করা হয়, তবে সেটা গ্রহণ করলে একটা কাজের কাজ হ'তো। অবশি বজবজ

২৬০ আমরা এখন থেকে কোথায় যাবো

তারাতলা এলাকায়, ত্রিবেণী ও হাওড়ায় বেসরকারী নূতন শিল্পের পত্তন, সরকারী লগ্নীর পরিপূরক হ'ল।

কলকাতার বাড়ী ও গৃহনির্মাণে টাকা লগ্নীর নূতন ক্ষেত্র পাওয়া গেলো। ১৯৫৪-৫৬ সালে প্রথম এর লক্ষণ দেখা গিয়েছিলো; ১৯৬৭ সালে তা তারও স্পষ্টতর হ'লো উচ্চআয়সম্পন্নদের জন্ত বহুতল ও ঘন-সন্নিবিষ্ট কোঠা তৈরীর ভেতর দিয়ে। ১৯৫২-৫৪ সালে রাজ্য সরকার ক'লকাতার উচ্চতম বাড়ী, নিউ সেক্রেটারিয়েট, নির্মাণ করে এই পথ দেখানো। তার-পরই বেঙ্গল চেশ্বার আলিপুর্বে এবং কেন্দ্রীয় সরকার ও এয়ার ইন্ডিয়া ১৯৬৭তে নূতন ক'রে এদিকে পথ দেখালো; আর ১৯৭১-৭২ সালে সি, এম, ডি, এ'র তহবিলে টাকা টেলে কেন্দ্রীয় সরকার বড়ো হাতে এগিয়ে এলো। ফলে ১৯৬৭-৬৯ সালে এদিকে সরকারী-উদ্যোগের গোড়াপত্তন করা হয়েছিলো, সি, এম, ডি এর বাড়ী তৈরীর পরিকল্পনা বেসরকারী স্তরে নূতনভাবে তাতে উৎসাহ যোগালো। ফলে ১৯৬২-৬৩তে শিল্পে বিনিয়োগেও জোয়ার এনে দিল।

এ-ধরনের আরও অনেক বাড়ী উঠছে। খুব কম করে হিসাব করলেও এই নির্মাণ-পর্বের জন্য ইতিমধ্যে প্রায় ৭৫ কেটি টাকা ব্যয় হয়ে থাকবে। অবশ্য এই বাড়ীগুলির ভেতরকার অঙ্গসজ্জার জন্ত কালোটাকার হিসাব এর মধ্যে ধরা হয় নাই।

এই বাড়ীগুলির বাসিন্দারা সহরের পেশায় শিল্পোদ্যোগে, ব্যবস্থাপনায়। বিজ্ঞানে, প্রযুক্তিবিদ্যায় লোক-সম্পদ জুটিয়েছে। সহরের অধিকাংশ লোকের চাইতে উন্নত জীবনমানের মানুষ এরা, তাই এদের চাহিদা পূরণে শিল্প, পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায় এবং নানা ধরনের দক্ষ ও অদক্ষ কাজের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এই বাড়ীগুলির অধিকাংশ বাসিন্দা-

রাই ক'লকাতায় বহিরাগতরূপে সহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধি করে পৌর-সুযোগসুবিধাগুলির ওপর চাপ সৃষ্টি করছে।

দ্রুততর হারে বাড়ীঘর তৈরীর কলে সংশ্লিষ্ট শিল্প-বানিজ্যেও বিশেষভাবে মারারী এবং ক্ষুদ্র শিল্পে—তৎপরতা বেড়ে স্থানীয় ও বহিরাগতদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করে। বহু অদক্ষ, অথচ ভারী কায়িক-শ্রমের উপযোগী রাজমিস্ত্রীরা এবং সেই সঙ্গে সড়ক পরিবহনের, জাহাজের এবং মাল ওঠানো, নামানোর জন্য বহু শ্রমিক বাইরে থেকে এসে এই সহরে জায়গা করে নিলো। এদের দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটাবার জন্য বহু খাবার ও অন্যান্য দোকান এবং অন্যান্য কায়িক-শ্রমের বিনিময়ে উপার্জনের পথ খুলে গেলো; তবে এই সব দোকান-পাট বেশীর ভাগই ফুটপাতে গজিয়ে ওঠে, কারণ গৃহনির্মাণের জন্য বহিরা-গতরা ফুটপাতের বাসিন্দা হয়ে সেখানেই তাদের নিত্যকৃত্য সম্পন্ন করতে লাগলো। কানপুর, দিল্লী, বোম্বাইতেও তাই ঘটে।

বিস্তবানদের জন্ত উচ্চতল বিশিষ্ট গৃহনির্মাণের গতি-বেগ বৃদ্ধি পেলেও, ক'লকাতার চলাচল ও যানবাহন ব্যবস্থা সহজতর হ'লে, নিম্নমধ্যবিত্ত ও নিম্নবিস্তরা সহর ছাড়তে বাধ্য হবে, এবং ফলে এই শহরে এক-দিকে বিস্তবান ও ধনীরা এবং অপরদিকে বস্তীতে নিম্ন-তম আয়ের কায়িক উপার্জকরা এবং কারখানার শ্রমিকরা বসবাস করবে। ক'লকাতার নানা স্থায়ী এবং সাময়িক কাজের তদারকি ও পুরানো কাজের নবীকরণের জন্ত করের বোকা, সহরের ট্যাক্স ও বাড়ীর ওপর ধার্য করা করের হারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে মোট করের বোকা বৃদ্ধি করলে সহরের স্থায়ী বাসিন্দাদের সংখ্যা হ্রাস পাবেই।

১৯৫১-৬১র দশকে আর একটি ঘটনা ঘটে যা বোধহয় আজও অব্যাহত আছে। ১৯৪৭-৫২-এর মধ্যে বাংলাদেশ থেকে আগত বাস্তুচ্যুতের দল কলকাতা ও হাওড়া সহরে প্রথমটায় জড়ো হলেও, তাদের অধিকাংশই সহরের প্রান্তে এবং মিউনিসিপ্যালিটি বহির্ভূত এলাকায় সরে গিয়ে জ্বরদখল জমিতে অথবা তাদের কেনা ছোট ছোট জমিতে টালির কিস্বা টিনের ছোট ছোট বাড়ী তৈরী করে আশ্রয় নেয়। হুগলী, নদীয়াতেও তাই হয়েছে। এরা প্রচুর সবজী ও মাছ উৎপাদন করে কলকাতার বাজারে কিস্বা ফুটপাতের দোকানে তাদের এই সব পণ্য বিক্রয় করে। এরা দরিদ্র হ'লেও এদের জীবন যাপনের পদ্ধতি,—যারা কলকাতায় স্বচ্ছল বাড়ী-ঘরে বাস করবার জ্ঞান এদের জায়গা-জমি দখল করেছে,—তাদের অর্থহীন সামাজিক জীবনের চাইতে শ্রেষ্ঠতর।

আগেই বলা হয়েছে, ১৯৭১-এর শেষের দিকে সি এম ডি এর প্রচুর অর্থব্যয়ের ফলে কলকাতার জনসংখ্যা বাড়তে থাকে। অবশিষ্ট জায়গায় জায়গায় রাস্তা খোঁড়ার স্থপ, খোলা জায়গায় নির্মাণের জ্ঞান প্রচুর মজুদ মাল এবং বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে বড়ো বড়ো যন্ত্রপাতির পরিচালনা, কলকাতায় মাল্লুষের ভিড়ের পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। কিন্তু এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নাই যে, বহিরাগত কণ্ট্রাকটরের দল, দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিকের দল এবং তাদের উপস্থিতির সুবিধাভোগীদের দল, চাকুরীর গুণব, ১৯৭১ সাল থেকে স্বাভাবিক অবস্থার চাইতে দ্রুততর হারে কলকাতার জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে। এর ফলে ফুটপাতের জনসংখ্যা ও সেখানে তাদের দৈনন্দিন জীবনের চাহিদা মেটাবার নানা ব্যবস্থাপনার অস্বাভাবিক বৃদ্ধিতে পায়ে চলা পথ প্রায় বন্ধ এবং

পানীয় জল, জঞ্জাল সাফ, ময়লা নিষ্কাশন ও ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালীর উপর অত্যধিক চাপ বৃদ্ধি পেয়েছে।

কলকাতার আশপাশে উন্নয়নে নজর না দিয়ে কেবল কলকাতার উন্নয়নের উপর ঝোঁক দিলে জেলা ও মহকুমা সহরগুলি থেকে কলকাতায় বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালীদের সংখ্যা অসম্ভব বৃদ্ধি পাবে। ভারত-বর্ষের অগ্রাঙ্ক রাজ্যের চাইতে পশ্চিমবঙ্গের জেলা ও মহকুমা সহরগুলি এইভাবে ১৯৪৭ সাল থেকে এ ভাবেই অবহেলিত হয়ে কলকাতামুখী জনস্রোত ঠেলে পাঠিয়েছে। ১৯৫১ থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যে বৃহত্তর কলকাতার বাইরে পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন সহর-গুলির জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার, গোটা কলকাতায় গড় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের চাইতে অনেক পিছিয়ে পড়েছিলো। রাজ্য সরকারের আর্থিক সাহায্যে কম্যুনিটি উন্নয়ন পরিকল্পনা কেন্দ্রগুলোতে গ্রামাঞ্চলে আবার সচল না করে তুলতে পারলে, কলকাতার উপর জনসংখ্যার চাপ অসহনীয় হয়ে উঠবে। ১৯৭১ সাল থেকে সি, এম, ডি, এর কাজের ফলে কলকাতায় পরিবহণ ও পায়ে চলার ব্যবস্থা প্রায় অচল হয়ে যাবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে এবং কলকাতার উপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপও একই কারণে মাত্রাতিরিক্তভাবে লক্ষ্যণীয় হয়ে দাড়িয়েছে। ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন এলাকায় হয়তো বা ছোট ছোট রাস্তাঘাট ও গলিগুলি চলনসই ভিড়-মুক্ত রয়েছে।

কলকাতার উপর কী কী বিপদের ঝুঁকি উঠিয়ে আছে? সম্ভবত ৪০।৫০ টি বহুতল ও ঘনবসতিপূর্ণ আরও বাড়ী তৈরী হবে কারণ এখনও এই ধরনের নির্মাণ অনিয়মিতই রয়েছে। এ-ছাড়া, তিনটি বড়ো কাজের সূচনা হবে : ১। উত্তর-দক্ষিণে পাতাল রেল : ২। দ্বিতীয় হাওড়া সেতু ;

২৬৫ আমরা এখান থেকে কোথায় যাবো

৩। ব্র্যাবোন রোডের উপর এবং সম্ভবত শিয়ালদহের উপর একাধিক উড়াল সেতু। ফলে, কলকাতার বহু মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়ে সঙ্কীর্ণ স্থানে বসবাসের জন্য উদ্বোধিত হবে—কলকাতা ছেড়ে এরা কেউ যাবে না। এই কাজগুলির জন্য কমপক্ষে আনুমানিক ৫০,০০০ লোক লাগবে—যাদের মধ্যে থাকবে কন্ট্রাক্টার, কারিগরীবিদ্যাকুশলী, দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিক। যান-বাহন, তাদের মেরামতের ব্যবস্থা এবং ফুটপাথের ওপর এদের দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজন মেটাবার জন্য কমপক্ষে আরও পাঁচ থেকে দশহাজার লোক। এদের মধ্যে বেশীর ভাগই অল্পদিনের জন্য অথবা রাজ্য থেকে থেকে আসবে। যারা ফুটপাথে বসবাস করে কলকাতা করপোরেশনের সকলরকম সুযোগ-সুবিধা,—কোনো রকম ট্যাক্স না দিয়ে,—পুরোমাত্রায় ভোগ করবে এবং কলকাতা পরিচ্ছন্ন এবং বাসোপযোগী রাখবার জন্য যাদের বিন্দুমাত্রও নাগরিক-সচেতনতা থাকবে না। প্রায় এক বছরের মধ্যে কলকাতার ফুটপাথে প্রায় অর্ধলক্ষ বহিরাগতরা ভিড় জমাবে, কলকাতার উন্মুক্ত স্থান নূতন নির্মাণের চাপে আরও সমুচিত হবে—এ ভাবনা বড়ো বেদনাদায়ক অথচ এই পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণের জন্য কোনব্যবস্থাই আগে থাকতে ভেবে রাখা হয় নাই।

১৯৬৯-৭০ সালে কিংসলে এবং ক্রিষ্টফ্ নামক ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের দুই বিশেষজ্ঞকে, বৃহত্তর কলকাতায় স্বল্পমূল্যে বাড়ী তৈরীর সম্ভাবনা সম্পর্কে কলকাতা মেট্রোপলিটান প্ল্যানিং অরগ্যানাইজেশন একটি রিপোর্ট রচনার ভার দিয়েছিলেন। কিংসলে ক্রিষ্টফ্ রিপোর্টে বলা আছে যে, কলকাতার জমির এবং বাড়ী তৈরীর জন্য যা খরচ পড়বে, তাতে মাসিক ৩০০ টাকা আয় সম্পন্ন কোনো পরিবারই কলকাতা সহরে ২৬০ বর্গ

ফিট আয়তনসম্পন্ন বাড়ীর অধিকারী হ'তে পারবে না। অবশিষ্ট ব্যয় কমিয়ে নির্দিষ্ট মানের মাল দিয়ে বাড়ী তৈরী হলে, বৃহত্তর কলকাতার আধা-সহর ও গ্রামীণ এলাকায় হয়তো বা এদের গৃহ নির্মাণের সুযোগ হতে পারে, এই মন্তব্য ভারতবর্ষের অন্যান্য বড় সহরের সমপর্যায়ের জীবনমানসম্পন্ন মানুষ সম্পর্কেও প্রযোজ্য। এই পরিপ্রেক্ষিতে যে মূল সমস্যাটি সামনে এসে দাঁড়ায়, তা হোলো, কী ধরনের সহরীকরণকে (urbanisation) ভারতবর্ষে লালন করতে হবে এবং বৃহত্তর কলকাতায় তাকে কি করে বাস্তব রূপ দিতে হবে?

পশ্চিমীদেশগুলির মত শিল্পায়ন কিংবা সহরীকরণের গতিবেগ ল্যাটিন আমেরিকা আফ্রিকা অথবা এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশগুলিতে নেই, একথা আজ সকলেরই জানা আছে। ভারতবর্ষের কোনো বড়ো সহরেই তা নাই, মায় বোম্বাইতেও, পশ্চিমী সহরগুলির বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে সেখানকার জনসংখ্যার নিম্নতম দশমাংশের জীবনমান সমস্তরের গ্রামীণ জনসংখ্যার চাইতে উন্নততর। কিন্তু ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে দুই অর্থনীতিবিদের—ডাণ্ডেকার (Dandekar) এবং রথ (Rath)—হিসাব হ'ল সহরের জনসংখ্যার নিম্নতম দশমাংশের জীবনমান, এ-দেশের সমস্তরের গ্রামীণ জনসংখ্যার চাইতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিকৃষ্টতর। সুতরাং, ভারতবর্ষের সহরে জনসংখ্যার একটা বড়ো অংশের সঙ্গে পশ্চিমী সহরের কর্মচারী-শ্রমজীবীদের জীবনমানের কোনোই স্বাক্ষাত্য নেই; ভারতবর্ষের এই শ্রেণীর মানুষঃ (১) জুঃস্থ এলাকার ভূমিহীন কৃষিজীবীদের মতো কায়িক শ্রমে সামান্য উপায় করে, (২) পান-বিড়ি-সিগারেটের খুচরা বিক্রেতারূপে কিংবা গৃহভৃত্য-রূপে সামান্য উপায় করে শিল্প-সমৃদ্ধ দেশের কর্মচারী-

১৬৬ জয়শ্রী, ভাদ্র, ১৩৮০

শ্রমিকদের উপযোগী উপার্জনের যে স্বত্ব, ভারতবর্ষের জনসংখ্যার নিম্নতম কিস্তি ঠিক তার ওপরের দশমাংশ জনসংখ্যার জীবনমানের সে-স্তর পৌঁছাতে যে পরিমাণ অর্থলব্ধীর প্রয়োজন সে অবস্থা থেকে ভারতবর্ষ এখনও বহু দূরে রয়েছে। ভারতবর্ষের সহরে জনসংখ্যার নিম্নতম দশমাংশের জীবনমান যদি ১৯৬৮-৬৯ স্তরের মূল্যস্তর 'অমুযায়ী', পাঁচজন লোকের পরিবারসম্পদের ব্যয় মাসিক ৩৫০-৪০০ টাকা রোজগার দিয়ে পোষানো যায়, তবে বলতে হবে ভারতবর্ষের সহরে লোকেরা জাতে উঠলো।

এই পরিস্থিতিতে ভারতবর্ষ যদি আয়ের বৈষম্য এবং সহরে সম্পত্তির ব্যক্তিগত উচ্চতম সীমা কমাতে উঠে-পড়ে লাগে, তবে বৃহত্তর কলকাতায় বৃহত্তর বোম্বেতে, বোম্বের দ্বৈত সহর পরিকল্পনায় সি, এম, ডি, এ অথবা দিল্লী উন্নয়ন সংস্থা দিল্লীর জন্য যে অর্থ লব্ধী করছে, যে পরিমাণ অর্থব্যয়ের বহন ক্ষমতা কিস্তি পরিশোধ ক্ষমতা কিস্তি স্বচ্ছন্দ-তদারকির ক্ষমতা এই সহরগুলির অধিকাংশ অধিবাসীরই নাগালের বাইরে থেকে যাবে। সে অবস্থায় ভারতবর্ষের বড়ো বড়ো সহরগুলি দান কিস্তি ভরতুকির মুখাপেক্ষী হয়ে পড়বে। এই সহরগুলির উন্নয়নের কাঠামো এতো বড়ো মাপের যে তা তাদের অধিবাসীদের আর্থিক সঙ্গতির বাইরে আর মিউনিসিপ্যাল করের ও ট্যাক্সের ব্যবস্থাও এমন যে উন্নয়নের জন্য বিপুল অর্থব্যয়ের ভগ্নাংশ মাত্র তার ভেতর দিয়ে আদায় হতে পারে। কলকাতার উন্নয়নের হার বজায় রাখতে হলে সহরের নিয়মিত অধিবাসীদের মধ্যে বহু লোককে সহর ছাড়া করেও একদিন এই সহর আর্থিক অসঙ্গতির চাপে মুখ খুবড়ে পড়বে। কলকাতা মেট্রোপলিটান এলাকা যদি এমন কোনো ব্যবস্থা বাতলাতে পারে, যার

ফলে বৃহত্তর কলকাতার অধিকাংশ নিয়মিত অধিবাসীদের ১৯৬৮-৬৯ সালের মূল্যস্তর অনুযায়ী পাঁচজন লোকের পরিবারের খাওয়া-পাচার জন্য ব্যয় মাসিক ৩৫০ টাকা হতে পারে, তবে বর্তমান চোখ ধাঁধানো উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলির চাইতে, সেটা একটা কাজের কাজ হবে।

বাস্তবে তা ঘটলো না। কারণ কলকাতার রাজনৈতিক গুরুত্বের ফলে উন্নয়নের জন্য প্রাপ্ত বেশীর ভাগ সম্পদই কলকাতার ভোগে লাগলো। জনসংখ্যা ও আয়তনের ভিত্তিতে এই অঞ্চলের অন্যান্য এলাকা কলকাতায় পণ্যের প্রবেশ কর, বা অকট্রয় (Octroi) করের কোনো অংশই পেলো না, যদিও এই সব এলাকায় সহরায়ণে পশ্চিমবঙ্গের গৌরব এবং সম্পদস্বরূপ বড় বড় শিল্পের ঘাঁটি রয়েছে। আর এটাও মনে রাখা দরকার যে কলকাতার বাইরের পৌরসভাগুলির পৌর ব্যয় কদাচিৎ মাথাপিছু ২ টাকার বেশী হয়, আর খাস কলকাতার উপযোগী সুযোগ-সুবিধার জন্য মাথাপিছু ব্যয় ১৩০ টাকার কম হবে না।

তাই বাস্তব দৃষ্টিতে এই অঞ্চলকে দুই বা তিন স্তরে ভাগ করে কলকাতার চারপাশে কয়েকটি পৌর সভার সুসংহত গোষ্ঠি গড়ে তুলতে হবে। তাদের ছকটা হবে এ-ধরনের : ১) একেবারে নিম্নস্তরে একটি মিউনিসিপ্যালিটির দায়িত্বে থাকবে পরিবহন, সেবা-প্রকরণ (servicing) এবং মানুষের বসতির দিক থেকে স্বাচ্ছন্দ্যসম্পন্ন তার সংলগ্ন গ্রামাঞ্চল, ২) মাঝের স্তরে থাকবে একটি মিউনিসিপ্যাল এলাকা ও তার সংলগ্ন গ্রামাঞ্চল, যার সঙ্গে সংহত থাকবে প্রথম স্তরের কয়েকটি পৌরসভা—বনাম—গ্রামাঞ্চলে

২৬৭ আমরা এখান থেকে কোথায় যাবো

৪২৭৫৭৩

গাষ্টি এবং এই বৃহত্তর গাষ্টির প্রতিটি সহর-গ্রামাঞ্চল গাষ্টির প্রতিনিধিদের সমবায়ে গঠিত কনফেডারেশন,) সকলের শীর্ষে থাকবে এই সহর-গ্রামাঞ্চল গাষ্টিগুলির সমবায়ে গঠিত মেট্রোপলিটন এলাকা, যার এই বিভিন্ন সহর-গ্রামাঞ্চল গাষ্টির সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরিকল্পনা ও যে রূপায়ণের, লোক নিয়োগের এবং অর্থসংস্থানের অনেকটা স্বাভাবিক থাকবে। কলকাতা মেট্রোপলিটন এলাকার গড়নে কিছুটা বিকেন্দ্রীকরণের এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তা কাজে পরিণত করবার ক্ষমতা, এই এলাকার মর্মমূলে তৈরী না করতে পারলে, কলকাতায় একতরফা সম্পদ কেন্দ্রীভূত হয়ে, অবশিষ্ট এলাকার বঞ্চনা ও নিঃস্বতা চলতে থাকবে।

কলকাতার বিশেষ পরিস্থিতির অভিজ্ঞতা নিয়ে সি, এম, ডি, এর আওতায় কাজ করে ১৫টি সংস্থার কলকাতার বাইরেরকার অভিজ্ঞতা নিয়ে কাজ করে ৯টি সংস্থা, প্রকৃতপক্ষে চার-পাঁচটির বেশী সংস্থার কোনো ধারণাই নাই কলকাতার বাইরেরকার এলাকায়, কী প্রয়োগ করা যাবে কি যাবে না। কিন্তু কলকাতার বাইরেরকার এই নয়টি সংস্থার অর্থসঙ্গতির প্রচুর অনটন রয়েছে, তা ছাড়া এদের গোড়ার সমস্যা তুলে ধরবার কিস্তি বিকল্প নীতি অনুসরণের কোনো অধিকারও নাই। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে বাঁশ-বেড়িয়াতে যেখানে মাথাপিছু গ্যালন খানেক কিস্তি স্তরপাড়ায় তিন গ্যালন পরিষ্কৃত পানীয় জলেরও স্তাবনা নেই, সেখানে মাথা পিছু ৪০ গ্যালন পরিষ্কৃত পানীয় জলের বরাদ্দের অর্থ কী? যদি কের খাতিরে ধরেই নেওয়া যায়, বাঁশবেড়িয়া কিস্তি স্তরপাড়ায় মাথাপিছু ৪০ গ্যালন পরিষ্কৃত পানীয় জল সরবরাহ করা যাবে, তবে সেখানকার দরিদ্র হস্তরা এতো জল ধরে রাখবার পাত্র পাবে কোথায়?

আর ব্যবহারের পর এই পরিমাণ জল নিষ্কাশনের নদমাই বা পাবে কোথায়? এছাড়া ময়লাজল নিষ্কাশনের, পয়ঃপ্রণালীর, জঞ্জাল সাফাই-এর ঢালাও ব্যবস্থা না করে, যথাক্রমে ভূগর্ভস্থ পৃথক পৃথক সেপটিক ট্যাঙ্ক, ময়লাজল পরিষ্কৃত করবার বিকেন্দ্রিত ব্যবস্থা, মিউনিসিপ্যাল ও তার বাইরেরকার এলাকায় সার উৎপাদনের ছোট ছোট ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে জঞ্জাল সাফাই-এর ব্যবস্থা হবে না কেন? বড় বড় পথের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষাকারী হালকা পরিবহণের জন্য পৃথকভাবে মিউনিসিপ্যালিটির বা পৌর সংস্থাগাষ্টির আভ্যন্তরীণ ছোট অল্পব্যয়ে রাস্তা-ঘাট তৈরী হবে না কেন? কিন্তু এই ধরনের অনুবিধাজনক, গতানুগতিকতার প্রশ্ন করতে কে দেবে?

কলকাতা মেট্রোপলিটন প্ল্যানিং অর্গানাইজেশন এবং কলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি গোটা বৃহত্তর কলকাতার উন্নয়নে প্রতিশ্রুত হলেও; কার্যত কলকাতা করপোরেশন এলাকারই উন্নয়নের সকল রকম সম্পদ জড়ো হয়েছে এবং একচেটিয়া ভাবে উন্নয়নের কাজও এই এলাকাতেই রূপান্তরিত হয়েছে। আর যা বাদবাকী সম্পদের বেশীটাই হাওড়া, বালী, বরানগর, ভাটপাড়া এবং দমদমের মত আশপাশের এলাকার ভাগেই জুটেছে।

সি, এম, ডি, এর রিভিউ কমিটির শেষ বিবরণীতে ৪র্থ প্লানের সম্পদের ভৌগোলিক বাঁটোয়ারার হিসাব থেকে জানা যায় যে প্রায় ১৮ কোটি টাকার, কিস্তি ১৯ কোটি টাকাও ধরা যেতে পারে—ব্যয় কলকাতা করপোরেশনের ভিত শক্ত করবার কাজে—ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরীতে ব্যয় হয়েছে। কলকাতা করপোরেশন ও হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির সম্পদ বৃদ্ধিতে কতটা ব্যয় হয়েছে, আরও খতিয়ে না দেখলে, তা জানা যাবে না।

কলকাতা মেট্রোপলিটান এলাকার মোট আয়তন ৫৫০ বর্গ মাইলের মধ্যে ৫০ বর্গমাইলের বেশী এলাকা এই ব্যয়ের ফলভোগ করে নাই। মোট এলাকার এক-দশমাংশে কেন্দ্রীভূত লগ্নীর আনুপাতিক অসঙ্গতি আমাদের দেশের দারুণ অর্থ নৈতিক বৈষম্যের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে লগ্নীর এই মারাত্মক অসঙ্গতি খাস কলকাতার সমস্তাগুলিকে মিটিয়ে না দিয়ে কিম্বা গোটা বৃহত্তর কলকাতা অঞ্চলে সমানভাবে ছড়িয়ে না দিয়ে সঙ্কট সৃষ্টি করেছে।

বাজেট বরাদ্দের বাইরেও তিন বছরে ১৩০ কোটি টাকা কলকাতা মেট্রোপলিটন অঞ্চলে ব্যয় করা পর ভাবতে হয়, এই পরিমাণ লগ্নীতে এবং নূতন সম্পদের বিলি ব্যবস্থায় কলকাতা মেট্রোপলিটন অঞ্চলে যে ধরণের উন্নতির কথা ভাবা গিয়েছিলো, তা সম্ভব কিনা। কলকাতার উন্নয়নের জন্য জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক অনুদান ও ঋণ সংগ্রহ করে উপযোগী সম্পদ লগ্নী করলে কী আমরা আরও গুরুতর ভাবে বহিরাগতদের কলকাতায় প্রবেশ বন্ধ করতে পারবো? এবং সেই পরিস্থিতি কী মেট্রো-পলিটন অঞ্চলের জনসংখ্যার সমবর্তনের ও এই অঞ্চলের কেন্দ্র থেকে তাদের চাপ কমানোর অনুকূল হবে? তাই ভারতবর্ষের লক্ষাধিক জনসংখ্যার সহর-গুলিতে নূতন আগন্তুকদের জন্য ছাড়পত্রের ব্যবস্থা ও সহরে প্রবেশ ফি কিম্বা টার্মিনাল ট্যাক্স আদায় করা অপরিহার্য হয়ে উঠছে। তার ফলে উন্নয়ন, তদারকি কিম্বা পুনর্নির্মাণের জন্য যেমন সম্পদ সংগ্রহ করা হবে। তেমনি বেকারের সংখ্যা অথবা কার্যিক শ্রমে বাধ্যতামূলক ভাবে সামান্য আয়ের পথ বন্ধ করা যাবে। এই ব্যবস্থায় রাজ্যে রাজ্যে রেযারেশি এবং স্থানীয় লোক ও বহিরাগতদের মধ্যে চাকুরী নিয়ে সংঘাতটাও বন্ধ করা যাবে।

পশ্চিমী দেশগুলির কলকারখানার শ্রমিকদের কিম্বা দপ্তরের কর্মচারীদের সমস্তুরে ভারতবর্ষের সমপর্যায়ের মানুষদের পৌছে দিতে এবং কলকাতার মত সহরের জনজীবনে আগামী দুই-তিনটি পরিকল্পনায় শিল্পায়নের জন্য প্রয়োজনীয় লগ্নী ভারতবর্ষের সামর্থের অতীত। মেট্রোপলিটন অঞ্চলের প্রতিটি পরিবারের জন্য ১৯৬৮-৬৯ সালের মূল্যস্তর অনুযায়ী আর্থিক আয় যদি মাসে ৪০০ টাকা হয় কিম্বা পাঁচজনের পরিবারের জীবনমান যদি ৩২৫ থেকে ৩৫০-এর মধ্যে হয় তবেই ভারতবর্ষের সামাজিক-অর্থনৈতিক উভয়ের, আধুনিক করণের এবং সাংস্কৃতিক জীবনের পরিবর্তনের পক্ষে যথেষ্ট হবে।

ভারতবর্ষের বেশীর ভাগ সহরে মানুষই গ্রামীণ-সহরের পরিবেশে বাস করে এবং তাদের অর্থনৈতিক উদ্যোগ সেই অনুযায়ী। আধুনিক শহর-কেন্দ্রের চারপাশে গ্রামীণ-সহরে স্বল্প আয়সম্পন্নদের বাড়ী এবং আশ্রয় প্রয়োজন, যে কর্তব্য পালনে সি, এম, ডি, এ কলকাতা-বহির্ভূত অঞ্চলেই নয়, খাস কলকাতা এবং হাওড়াতেও অবহেলা করেছে। এই বাড়ী-ঘরগুলি ইট, ইম্পাত এবং কংক্রিটের তৈরী না হলেও চলবে। আর ভারতবর্ষে কম এবং মাঝারী আয় সম্পন্নদের বাড়ী তৈরীর জন্য, সিমেন্ট ইম্পাত ছুস্পাণ্য এবং অত্যন্ত ছুয়ল্য হবে, কারণ আরও জরুরী জাতীয় নির্মাণে তাদের প্রয়োজন পড়বে তাছাড়া কলকাতা মেট্রো-পলিটন এলাকার জন্য জল সরবাহের, ময়লা নিষ্কাশনের, পয়ঃপ্রণালীর, জল নিষ্কাশনের যে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থার পরিকল্পনা করা হয়েছে, সংগৃহীত সম্পদ দিয়ে তা মেটানো অসম্ভব। সুতরাং, ১০ থেকে ১৫ বর্গ মাইল ভৌগোলিক এলাকার জন্য স্থায়ী সম্পদের সামর্থ অনুযায়ী বিশিষ্ট ছোট ছোট বিকেন্দ্রিত পরিকল্পনা

২৬৯ আমরা এখান থেকে কোথায় যাবো

তৈরী ও রূপায়িত করতে হবে। এই ছোট ছোট ব্যবস্থা, বিশেষভাবে জলসরবরাহ এবং জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা, সঙ্কটের সময় সংলগ্ন সংগঠিত ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া যেতে পারে।

বস্তী উন্নয়ন সম্পর্কে ১৯৭০-৭১-এ সি, এম, ডি, এ-গোড়ায় প্রস্তাবে বলেছিলাম যে প্রতিটি বস্তীকে ৬০০ থেকে ১০০০ মানুষের এক একটি ব্লকে বিভক্ত করতে হবে এবং নির্দিষ্ট দিনে চার-ঘণ্টা পর পর সফটে, বস্তীতে তৈরী সুযোগ সুবিধাগুলির তদারকির ভার সেই ব্লকের বেকার তরুণ-তরুণীদের উপর তুলে দেওয়া হোক। তাদের কাজ হবে; ১) বাড়ী বাড়ী ঘুরে দেখা যে জলের কল সরবরাহের ব্যবস্থা, ময়লা নিষ্কাশন, জল নিষ্কাশন, রাস্তার এবং নর্দমার বাঁধানো জায়গাগুলি এবং জঞ্জাল সাফাইয়ের কাজ ঠিকমত চলছে কিনা ২) ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ঠিকমতভাবে স্কুলে যাচ্ছে কিনা, তারা উপযুক্ত পোষাক পরছে কিনা। খাবার খাচ্ছে কিনা তাদের প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়েছে কিনা ৩) গর্ভবতী কিম্বা সন্তানপ্রসবা মায়েরা, নবজাত শিশুরা এবং বাচ্চারা কমুনিটি সেন্টারে উপযুক্ত নজর দেওয়া। ৪০০০ বস্তীবাসীর দুইটি ব্লকে একটি স্কুল—ক্লিনিক—গতাতুগতিক নয় এমন বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র থাকবে যাদের তত্ত্বাবধানে থাকবে সেই বস্তীরই আধা-ট্রেন্ড যুবক-যুবতীরা যাদের আংশিক সমাজের কাজের ভিত্তিতে যাকে ১৫০ থেকে ২৫০ টাকা বেতন দেওয়া হবে, বর্ষ শ্রেণীর মান পর্যন্ত প্রাইমারী ও মধ্য স্কুল শিক্ষার ব্যবস্থায়, এখানে স্বাস্থ্য-কেন্দ্র—শিশু ও মাতাদের স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও পুষ্টিকেন্দ্র চার-সফটে পরিচালিত নয়, এমন বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র সবই একই খেলার মাঠ সংলগ্ন দালানে। আমাদের আর্থিক ও সামাজিক পরিস্থিতির উপযোগী করে মেট্রোপলিটন সহরাঞ্চলের

পুনর্নির্মাণ সম্পর্কে ভাবনাটাই বর্তমানে সব চাইতে বড়ো কাজ। পশ্চিমবঙ্গের তিনদশকের অবহেলিত জেলা ও মহকুমা সহরগুলি সম্বন্ধেও একই কথা বলতে হয়। এই অবহেলা কলকাতার মেট্রোপলিটন অঞ্চলেই শুধু সমস্যা-স্রব্দ করে তোলে নাই, এই রাজ্যের কৃষি-উন্নয়নকেও গুরুতরভাবে ব্যাহত করেছে। কিন্তু উন্নত দেশের সহরের পুনরুজ্জীবনের কার্যক্রম এখানে আমদানী করলে চলবে না। সেজন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন এবং আমাদের উন্নয়নের জন্য একেবারে অগ্রাসঙ্গিক সেটা স্বীকার করতে হবে। আমাদের আধা-সহরের অবস্থার উন্নতি করে সহরের প্রান্তে নতুন শিল্প বসতিকে আকর্ষণ করতে হবে, তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী সহরের ছোট মাপের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টিতে এবং নাগরিকদের সামাজিক-আর্থিক পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রযুক্ত বিস্তার ব্যবস্থাপনায়। তাদের আধুনিকতার পথে এগিয়ে দেবে পরিকল্পনা ও রূপায়নের বিকেন্দ্রায়ন এবং সামগ্রিকভাবে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্য আর্থিক ব্যবস্থার ছক একে তিন স্তরের কার্যকর ব্যবস্থাপনাই অস্তিম উদ্দেশ্য হবে।

আমাদের প্রয়োজন সুসংহত, তৃপ্ত, গ্রামীণ সহরের মালা-গাঁথা যার বায়ু অপেক্ষাকৃত কম বিষাক্ত থাকবে কিন্তু যে বিকেন্দ্রিত গ্রন্থনের মানুষেরা যৌথ জীবনের অংশীদার হবে—এই ধরনের ব্যবস্থাই হবে উচ্চতল সম্পন্ন, ঘনজন সংখ্যা সন্নিবিষ্ট, বিষাক্ত বায়ুসম্পন্ন পরিবহন-রুদ্ধ সহরের বিকল্প—কলকাতা আজ যে ধ্বংসের পথে দ্রুত এগোচ্ছে। ভারতের সহর উন্নয়ন এখনও স্বকীয়তার পথে অগ্রসর হতে, পারে এবং সেই সঙ্গে স্বল্প আয় সম্পন্ন, দরিদ্র দেশের সহর-উন্নয়নের বিকল্প ইশারা দিতে পারে।

ঐশ্বজ্যী শ্যে কলকাতা

ভোলানাথ সেন

—চেয়ারম্যান, সি. এম. ডি. এ

আজ থেকে ১৬৫ বছর আগে লণ্ডনের লোকসংখ্যা ছিল ১০ লক্ষ ১০ হাজার। আজ থেকে একশ'উনিশ বছর আগে ১৮৫৭ সালে প্যারিসের লোকসংখ্যা ছিল ১০ লক্ষ ৫৬ হাজার। নিউইয়র্কের জনসংখ্যা ১৮৮০ সালেই (প্রায় ৯৬ বছর আগে) ছিল ১০ লক্ষ ৮৯ হাজার। ঐ সময়ই বার্লিনের লোকসংখ্যা দাঁড়াল ১১ লক্ষ ২২ হাজারে। মস্কোতে ১৯০১ সালে পুরজনের সংখ্যা ছিল সাড়ে নয় লক্ষের মত। ইঠাৎ এই সংখ্যাভ্রু কেন; কারণটা আর কিছুই নয় যে কোন স্থানে পুরজনের সংখ্যা ১০ লক্ষ ছাড়ালে সে শহর 'মেট্রোপলিটন' শহরের পদ-মর্যাদা পায়। আজ সারা ভারতে ১০ লক্ষাধিক জনবল নিয়ে ১০টি শহর রয়েছে। যাইহোক কলকাতা শহরের জনসংখ্যা ১০ লক্ষের উপর উঠল মাত্র ৪৫ বছর আগে অর্থাৎ ১৯০১ সালে। তখন লোকসংখ্যা ছিল ১২ লক্ষ ৬১ হাজার। মেট্রোপলিটন শহরের মর্যাদা ঐ সময় থেকেই পেতে শুরু করল আদরের কলকাতা। কিন্তু যত দিন যেতে লাগল শহরে লোক বাড়তে শুরু করল, ঐ সময় শহরের বাসিন্দার অনুপাতে পানীয় জল, রাস্তাঘাট চলনসই ছিল সন্দেহ নেই। আর ৬০ এর দশক থেকে কেবল শহর কলকাতাকে দৈনিক যাত্রীসহ ৪০ লক্ষ লোকের চাপ সহ্য করতে হচ্ছে। আর এই সঙ্গে পুরব্যবস্থাও বেহাল হয়ে পড়তে থাকে কেবল কলকাতাতেই নয় এর আশে-পাশের এলাকাতেও। কারণ সেখানেও হু-হু করে লোক বসতি বাড়তে শুরু করে

স্বাধীনোত্তর কাল থেকেই। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যাকে স্মৃষ্টিভাবে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে রাখার জ্ঞাত পূর্ন-ব্যবস্থার কাজ চলছে। শহরায়নের ও নগর উন্নয়নের সঙ্গে আঞ্চলিক অর্থনীতি বিকাশের চেষ্টা চালান হচ্ছে।

আজ নগরউন্নয়নের ও শহরায়নের পরিকল্পনার কাজ চালাচ্ছে সি, এম, ডি, এ। বৃহত্তর কলকাতা (প্রায় ৫৪০ বর্গ মাইল) তৈরি হয়েছে এই ছোট শহর কলকাতাকে (প্রায় ৪০ বর্গ মাইল) ঘিরে। শতাধিক প্রকল্পে চার হাজার কাম্বের জায়গায় কাজ চলছে ৩৪টি পুরসভা ও একাধিক উন্নয়ন সংস্থার মাধ্যমে, এবং শতাধিক অঞ্চল জুড়ে। এত বড় অঞ্চলে পুরসেবার কাজ একযোগে হচ্ছে কারণ পুর-ব্যবস্থা শুধু কলকাতাতেই আছে (তাও পর্যাপ্ত নয়); অগ্রাগ্র এলাকায় এ ব্যবস্থা সীমিত ও সংকুচিত, বাকী অংশে নেই বলা চলে। তাই সময়ের সঙ্গে মুখো-মুখি হয়েই পুর উন্নয়নমূলক কাজ চালান হচ্ছে। ১৯৭০ সাল নাগাদ বৃহত্তর কলকাতা উন্নয়নের চিত্র বিশেষভাবে খতিয়ে দেখা হল। ভারত সরকারের প্রকাশিত মিউনিসিপ্যাল প্রশাসন ব্যবস্থা সংক্রান্ত রিপোর্টে বলা হয়েছে মেট্রোপলিটন শহরে পুরজনের মাথা পিছু বছরে ১৯৭৪ সালের হিসাবে ১০৯ টাকা ব্যয় ধার্য করতে হবে। আজ কলকাতাবাসীর মাথা-পিছু ব্যয় বছরে ৫০ টাকার বেশি নয়। বেসামাল পুরব্যবস্থা হবে বৈকি। বস্তুতে এ ব্যয়ের মাত্রা ১২০ টাকা, দিল্লীতে ৮২ টাকা, আমেদাবাদে ৭১, তবে ওদের

সঙ্গে চট করে তুলনাটা ঠিক হবে না। এই বড় কলকাতায় অর্থনৈতিক সংকট যাতে উন্নতিমূলক কাজকর্মকে ব্যাহত করতে না পারে তার জন্য চুঙ্গীকর থেকে একটা অংশ নেওয়া ঠিক হল। রাজস্ব থেকে কিছু নেওয়া হবে, কেন্দ্রীয় সরকারী অনুদান ও কেন্দ্রের অনুমোদিত নিজস্ব ঋণ ও বিশ্বব্যাংক খাত থেকে যে কেন্দ্র-অনুমোদিত ঋণ পাওয়া যাবে, আর বাজার থেকে উন্নয়ন-বণ্ড বিক্রি করে কিছু অর্থ সংগৃহীত হবে। আর্থিক সংস্থানের কথাই ধরা যাক। চতুর্থ পরিকল্পনার শেষ-আর্থিক বছর পর্যন্ত অর্থাৎ ৩১শে মার্চ ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত—উন্নয়ন বাবদে সি, এম, ডি, এ এলাকায় সি, এম, ডি, এ-র মাধ্যমে ১৫০ কোটি টাকা লগ্নী করা হবে ঠিক হয়। কাজ শুরু করতে করতে ১৯৭৩-৭৪ সালের আর্থিক বছর পর্যন্ত সি, এম, ডি, এ ১২০ কোটি টাকালগ্নী করে। এর মধ্যে ৪৬ কোটি টাকা সি, এম, ডি, এ বাজার ঋণ থেকে সংগ্রহ করে উন্নয়ন বণ্ড বিক্রি করে। ৪০ কোটি টাকা রাজ্য সরকার থেকে সাহায্য পেয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকার ১০ কোটি টাকা সাহায্য দিয়েছেন বস্তিউন্নয়ন বাবদে। এছাড়া

১৯৭৩ সালে বিশ্বব্যাংক (আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা, আই-ডি-এ) রাজী হয়েছেন কলকাতা উন্নয়নে ঋণ দিতে। এই সংস্থা প্রথম খাতে ২৬ কোটি টাকার ঋণ দেবেন। এই খাতের টাকাতে সি, এম, ডি, এ-র চালু ৪৪টি প্রকল্প আগামী ৩৪ বছরের মধ্যে বাস্তবায়নে সমর্থ হবে। '৭০-৭৪ সালের মধ্যে এই টাকা খরচ করাতে মহানগরী আশু অবক্ষয়ের হাত থেকে বেঁচেছে বলা যায়। কলকাতা উন্নয়নে সি, এম, ডি, এ বছরে গড়ে ৩০ কোটি টাকার বেশি লগ্নী করেছে। স্বাধীনোত্তর কলকাতায় পূর্বের বছরগুলোতে উন্নয়ন খাতে আর্থিক বিনিয়োগের হার বছরে গড়ে সর্বাধিক পাঁচ-কোটি টাকার মত। আর ঐ একই পর্বে ভারতের অন্যান্য মেট্রোপলিটন শহর সমূহে গড়ে ১০ কোটি থেকে ৫০ কোটি টাকা পর্যন্ত নিয়োজিত হয়েছে। অথচ গণচাপ ও ক্রমবর্ধমান পুরচাহিদা কলকাতাকেই সামলাতে হয়েছে অনেক বেশি-পরিমাণে সন্দেহ নেই। সি, এম, ডি, এ-র আর্থিক বছরগুলোর খরচের হিসাব দেওয়া হ'ল। চুঙ্গীকর বাদে যা অর্থ পাওয়া গেছে রেখা-বন্ধনীর মধ্যে তা দেওয়া হল।

১৯৬৯-৭০	৪ কোটি	৩৬ লক্ষ	(৪ কো : ৩৬ লক্ষ)
১৯৭০-৭১	৮ কোটি	৬৬ লক্ষ	(১৮ কো : ৮৯ লক্ষ)
১৯৭১-৭২	৩১ কোটি	৩৯ লক্ষ	(২৪ কো : ৯১ লক্ষ)
১৯৭২-৭৩	৩৭ কোটি	১৯ লক্ষ	(৩৫ কো : ২২ লক্ষ)
১৯৭৩-৭৪	৩১ কোটি	৬২ লক্ষ	(৩২ কো : ৬২ লক্ষ)
১৯৭৪-৭৫	২৭ কোটি	৩৫ লক্ষ	(২৮ কো : ৫৬ লক্ষ)

১৯৭৫-৭৬সালে ৩৬ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়। এর মধ্যে ৩ কোটি টাকা ডাচ সরকারের কাছ থেকে সাহায্য পাওয়া গেছে। রাজ্য-প্রকল্প থেকে ৪ কোটি ৬০ লক্ষ,

বাজার ঋণ ১৫ কোটি ৪০ লক্ষ, বস্তি-উন্নয়ন খাতে প্রায় দেড় কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সাহায্য, ৬ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সাহায্য, চুঙ্গীকর থেকে ৬ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা ও বাকী অর্থ নানা-

সূত্রে প্রাপ্ত। ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত আর্থিক বছরে মোট খরচের পরিমাণ ১৭০ কোটি টাকা, যার ফলশ্রুতি মহানগরীর আশু অবক্ষয় রোধ ও জরুরী এবং দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচীর মাধ্যমে ভাবী প্রকল্প রূপায়ণ। ঐ ১৭০ কোটি টাকার মধ্যে বাজারে উন্নয়ন বণ্ড বিক্রী করে ৭৭ কোটি টাকা ঋণ পাওয়া গেছে—প্রতিবছরে ছয় শতাংশের কিছু বেশী হ্রদ চড়বে এই ঋণের ওপর। বিশ্বব্যাংক থেকে স্বল্প সুদে দীর্ঘ-মেয়াদী পরিশোধযোগ্য ঋণের প্রথম দেয় ২৬ কোটি টাকার মধ্যে ১৩ কোটি টাকা পাওয়া যাচ্ছে। প্রথম দফায় বিশ্বব্যাংক থেকে সাড়ে তিন কোটি ডলার মঞ্জুর হয়েছে। এর মধ্যে দু-কোটি ডলার পাওয়া গেছে। ৭৫-৭৬ সাল পর্যন্ত সি, এম, ডি, এ শহরোন্নয়নে মোট ১৮৫ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে। এর মধ্যে বাজার ঋণ ৮৭ কোটি টাকা, চুক্তীকর থেকে ৩০ কোটি টাকা, কেন্দ্রীয় সাহায্য ১৫ কোটি টাকা (বস্তীউন্নয়ন খাতে) ডাচ সাহায্য ৩ কোটি টাকা এবং বাকী অর্থ এসেছে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের নানা সূত্রে থেকে। সি, এম, ডি, এ-র আর্থিক ব্যয়ান মোটামুটি দিলাম। আগামী চার বছর শহরোন্নয়নের ব্যাপারে আর্থিক বাজেটের খসড়া দেওয়া হ'ল। ১৯৭৬-৭৭ উন্নয়ন বাবদে সি, এম, ডি, এ খরচ করবে ৩৭ কোটি টাকা। ১৯৭৭-৭৮ সালের ব্যয়-বরাদ্দ ৪২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। '৭৮-৭৯তে খরচা হবে ৪৫ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। ১৯৭৯-৮০ সালে ব্যয়-বরাদ্দ ৪৫ কোটি টাকা ধরা হয়েছে। অর্থাৎ ৮০ সাল পর্যন্ত মোট ১৭০ কোটি টাকা লগ্নী হবে বৃহত্তর কলকাতা উন্নয়নকল্পে। বর্তমানে বিশ্বব্যাংক থেকে যাতে ঐ বাজেটের মধ্যে ৯০ কোটি টাকার মত ঋণ পাওয়া যায় তার জন্য নানা প্রকল্প বিশেষজ্ঞদের কাছে পেশ করা হচ্ছে। প্রকল্প-

গুলোর রূপায়ণের পরেও রক্ষণা-বেক্ষণের জন্য ধারা-বাহিক খরচের ব্যাপার আছে। এখন মহানগর উন্নয়ন তহবিলে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য অনুদান জমা পড়ছে, ঋণ সংগৃহীত হচ্ছে কিন্তু শতাব্দীর শেষে এই বিশাল এলাকাকে সুস্থ পরিবেশে রাখার জন্য আর্থিক সংস্থানের উৎসগুলোর খোঁজ-খবর উন্নয়ন সংস্থা-গুলোকে নিতে হবে। আশার কথা এই যে পুরসভা সমূহ, সি, এম, ডি, এ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার এবং আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা সকলেরই কাম্য-শতাব্দী শেষে উন্নয়ন সংস্থাগুলোর আর্থিক স্বয়ম্ভরতা পূর্ণ হোক। পুরসভাগুলোর আর্থিক বনিয়াদ শক্ত হোক।

আগামী দশকে কলকাতার হালচালের উন্নতি কি ধরনের হবে তার কথা বলি। শহর জীবনে মূল চাহিদার ন্যূনতম যোগানকে অব্যাহত রাখার সঙ্গে সঙ্গে পুরসেবামূলক কর্মকাণ্ডের সম্প্রসারণ চলছে, আর বর্তমানের তুলনায় আরও বেশি সুস্থ পরিবেশ বেশি এলাকার রচনার কাজ চলছে। যেমন ধরা যাক পানীয় জলের কথা। কলকাতাতে বর্তমানে যা লোক আছেন তাঁদের জন্য কমসে কম দৈনিক ২০ কোটি গ্যালন পরিস্কৃত জল দরকার। অথচ এর অর্ধেক পরিমাণ যোগানও টালা-পলতা প্রকল্প কর্তৃক '৭০ সাল পর্যন্ত হয়নি। ৬০-এর দশকে জলের বরাদ্দে ঘাটতি শুরু হয় ও '৭০ সালে কলকাতাবাসী গড়ে দৈনিক ২২ গ্যালন মত জল পেতেন। সি, এম, ডি, এ-র কাজের ফলে প্রায় ৩২ গ্যালন জল এখন পাচ্ছেন। টালা-পলতার আমূল সংস্কার ছাড়া ৩০০ গভীর নলকূপ বসানো হয়েছে, আরও বেশি লোক বেশি এলাকায় বেশি পরিমাণে জল পাচ্ছেন। জলের বরাদ্দ বাড়িয়ে মাথাপিছু ৫০ গ্যালন পর্যন্ত যোগানই এ সংস্থার চূড়ান্ত লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যেই গার্ডেনরীচ, বরাহনগর ও হাওড়ায় অতিকায় জল-প্রকল্পের সূচনা হয়েছে। অক্ল্যাণ্ড স্কোয়ারে ও সুবোধ

মল্লিক স্কোয়ারে ভূগর্ভস্থ জলাধার তৈরি হচ্ছে। অস্বাস্থ্য-
কর, দুর্গন্ধ পরিবেশ হটানোর জন্ত এখনই মহানগরীর
দেড়লক্ষাধিক খাটা-পায়খানা অপসারণের প্রকল্প নেওয়া
হয়েছে। বর্তমানে ২৭ হাজার স্যানিটারি পায়খানা
বসানো হয়েছে। '৭১ সাল পর্যন্ত খাস কলকাতারই
৪৫ শতাংশ এলাকার বাসিন্দা পয়ঃপ্রণালী ব্যবহারের
সুযোগ পাননি, আর সি, এম, ডি এলাকার মধ্যে মাত্র
২৬ শতাংশ বাসিন্দা পয়ঃপ্রণালী ও নিকাশী ব্যবস্থার
সুযোগ পেতেন। এখন পাকা-ঢাকা ড্রেনে ও নিকাশী
ব্যবস্থা প্রসারের ফলে এ সুযোগ বাড়ছে। সি, এম,
ডি, এ-র কাজের ফলে অন্ততঃ ৭০ শতাংশ বাসিন্দা
পয়ঃপ্রণালী ব্যবহারের সুযোগ পাবেন সন্দেহ নেই।
হাওড়ায় নোংরা জলসহ মল-শোধন প্রকল্পের কাজ
চলছে। শ্রীরামপুরেও এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।
সি, এম, ডি, এ কৃত নিকাশী ব্যবস্থা সম্প্রসারণের ফলে
বিগত বর্ষাগুলোতে যেখানে কমপক্ষে ১০।১৫ বার
শহর জলে ডুবত সেখানে আগামী বছরগুলোতে বড়-
জোঁর ছ-তিনবার ডুববে আর জল জমা এলাকায়
পূর্বের তুলনায় ক্রমশঃই জল কম জমবে ও কম সময়
থাকবে। পথ-পরিবহণের বর্তমানের জটিলতা ও
ব্যাপকতা হ্রাস পাবে। বহু রাস্তা বেশি চওড়া হবে,
আরও নতুন রাস্তা হবে এবং বর্তমানের তুলনায়
কমপক্ষে ২৫ শতাংশ ধারণ ক্ষমতা বাড়বে। এইসঙ্গে
সড়ক সেতু ও হুগলি নদীর ওপরের সেতুগুলো সহজ
যোগাযোগের পথ তৈরি করবে, এতে দূরের পথ দ্রুত
পাড়ি দেওয়া সম্ভব হবে, সময় সংক্ষেপ হবে।
কলকাতাতেই চেতলায় যতীনদাস সেতু, উন্টাডাঙ্গায়
অরবিন্দ সেতু, চওড়া কালীঘাট সেতু তৈরি হল।
কুড়িটির বেশি রাস্তা চওড়া হল। ৬০টি রাস্তার
সংস্কার হল, ত্রাবোর্ণ রোডে ১৪০০ ফুট দীর্ঘ ২২ফুট

চওড়া উড়াল সেতুর কাজ চলছে। হাওড়া স্টেশন
এলাকায় প্রায় হাজার ফুট দীর্ঘ সাবওয়ে হল, এই
সঙ্গে এলাকার আমূল সংস্কার হয়েছে। হাওড়া
ময়দানে বঙ্কিম সেতুর কাজ শেষ হল—উত্তর ও
দক্ষিণ হাওড়ার মধ্যে যোগাযোগ সুদৃঢ় হবে। সহজ
যোগাযোগের রাস্তা কসবা-বালিগঞ্জ ওভার ব্রিজের
কাজ শেষ হলেই হবে। শিয়ালদহে ট্রাফিক জ্যামের
জট খুলতে সাহায্য করবে ভাবী হ্যাম্প বা মিনি উড়াল
সেতু। তৈরি হচ্ছে সেন্ট্রাল-হাওড়া এক্সপ্রেসওয়ে,
কোণা এক্সপ্রেসওয়ে, জিটি রোড বাইপাস, এপাড়ে
বেলঘরিয়া এক্সপ্রেসওয়ে, বারাকপুর কল্যানী এক্স-
প্রেসওয়ে, ইষ্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাস, ডায়মণ্ড-
হারবার রোড বাইপাস ইত্যাদি। কোণাতে 'ট্রিক
টার্মিনাল' প্রকল্পের সূচনা হয়েছে। ডানকুনিতে
দুর্গপ্রকল্পের কাজ হবে, এই সঙ্গে প্রায় ২২টি বিভিন্ন
এলাকায় বিকাশ-যোজনার কাজ চলবে। প্রাথমিক
স্বাস্থ্যউন্নয়নের জন্ত মহানগরীর হাসপাতালগুলোতে
অতিরিক্ত ২৩০০ শয্যাসংখ্যা বাড়ান হয়েছে তৎসহ
ভ্রাম্যমান ও স্থানীয় চিকিৎসা কেন্দ্রের সংখ্যা বাড়ান
হচ্ছে। রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থাকে ৫কোটি টাকা ও
ট্রাম কোম্পানীকে সাড়ে ৬ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে
বাড়তি ভিড়ের চাপকে সাধের মধ্যে আনার জন্ত।
সি, এম, ডি, এ প্রকল্পগুলোর সঙ্গে দ্বিতীয় হুগলি
সেতু প্রকল্পের কাজ চলছে যার বাস্তবায়নে প্রায়
৭৫ কোটি টাকা বাজেট ধরা হয়েছে। এই কলকাতা-
তেই মেট্রোপলিটন ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট ২৫০ কোটি
টাকার বাজেট নিয়ে পাতাল রেল প্রকল্পের কাজ শুরু
করেছেন। এত টাকা, প্রকল্পের বোঝা ও কর্মকাণ্ড
নেওয়া হয়েছে কারণ দীর্ঘদিন বাদে কলকাতাকে
বাঁচার মত পরিবেশে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হচ্ছে

বলেই না। বিশাল কর্মসূচীর বাস্তবায়নের বিপুল কর্মকাণ্ডের রূপ দেখে স্বভাবতঃই মনে হতে পারে এগুলো শহরবাসীর পক্ষে পর্যাপ্ত নয় কি? তবে পূর্ব প্রসঙ্গে বলি যে এ শতাব্দী শেষে বৃহত্তর কলকাতার লোক সংখ্যা প্রায় দেড় কোটি হবে। অর্থাৎ আরও একটা সি, এম ডি, এলাকার লোক (৭৬ সালে ৮৩ লক্ষ) থাকবেন এই পরিধির (৫৪০ বঃ মাঃ) মধ্যেই। তাই আজকের ও আগামী দিনের নাগরিকের ন্যূনতম চাহিদা মেটাতেই পূর্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। অত্যাশ্চর্য দেশে বহুক্ষেত্রে দেখা গেছে মেট্রোপলিটন সিটির কাছাকাছি ছোট ছোট শহর শিল্পায়নের ফলে বা কর্মকেন্দ্রিক উন্নত পরিবেশ রচনার ফলে নিজেদের চেহারা ও জনসংখ্যা ঐ বড় শহরের মতই ধীরে ধীরে বাড়িয়ে তুলেছে। কিন্তু পূর্ব ভারতে সেরকম চিত্র দেখিনা। পূর্বাঞ্চলে শহুরে লোকসংখ্যা ও শহরায়ণের বন্দোবস্ত ভারতের অত্যাশ্চর্য অংশের তুলনায় কম। এখানে মোট ১৫ কোটি বাসিন্দার মধ্যে মাত্র পৌনে ছ'কোটি লোক হচ্ছেন শহরের বাসিন্দা। আর এই শহরেদের মধ্যেই ৮০ লাখের বেশি জনসংখ্যা সি, এম, ডি, এলাকাবাসী। পূর্বভারতের দ্বিতীয় শহর পাটনা মাত্র সাত লাখ লোক নিয়েই সন্তুষ্ট। তাই কলকাতায় হল আঞ্চলিক উন্নয়ন কেন্দ্র। সি, এম, পি-ও সমীক্ষাস্ত্রে জানিয়েছেন ১৯৮৬ সালে পূর্বাঞ্চলে শহরবাসীর সংখ্যা তিন কোটি ছাড়াবে। আর সি, এম, ডি, এলাকায় ১ কোটি ২০ লক্ষাধিক বাসিন্দা থাকবেন। লোক বাড়বে শিল্পাঞ্চল সমূহে, নতুন শিল্পনগরীগুলোতে। বহু কর্মী বহু জায়গায় কাজ পাবেন। বর্ধিত জনচাপ রাঁচী-বোকারো, জামসেদপুর, ধানবাদ, দুর্গাপুর-আসান-সোল ইত্যাদি ও খনিজ অঞ্চল এলাকায় বেশি পড়বে।

কিন্তু আগামী দশকে কলকাতা এবং সংলগ্ন এলাকাতে যে লোকসংখ্যা বাড়বে তাদের কর্মসংস্থান পাশ্চাত্য এলাকাতে ও নিজস্ব এলাকাতে যাতে হয় তার ব্যবস্থা কলকাতাবাসীকেই করতে হবে। ঐ দলে ধনী-দরিদ্র থাকবেন শিক্ষিত, অশিক্ষিত, নিরক্ষর থাকবেন। বর্ধিত জনচাপ ধরে রাখার জন্য মাকড়সার জালের মত কলকাতার চারপাশে টাউনশিপ থাকবে, এর কাজ চলছে। ১৯৯১-তে সি, এম, ডি এলাকায় ১ কোটি ২৪ লক্ষাধিক বাসিন্দা থাকবেন, ৯৬ সালে ১ কোটি ৩৪ লক্ষ এবং ছ' হাজার সালে ১ কোটি ৪০ লক্ষাধিক বাসিন্দা থাকবেন। এ জনতরঙ্গ বাড়বে। তবে গ্রামীণ উন্নয়নের কাজ ও পশ্চিমবঙ্গের জেলা সদর সমূহের উন্নতির প্রকল্পগুলো কপায়ণের প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন উন্নয়ন ও পরিকল্পনা দপ্তর, নগর ও শহর উন্নয়ন পরিকল্পনা বিভাগ এবং রাজ্য যোজনা পর্ষদ। এতে গ্রাম থেকে লোক আসা অনেক কমবে, কিন্তু শহুরে চাহিদা ও আকাংখা মেটানর আশায় উন্নততর চেহারার গ্রামবাংলা থেকেও তখন কিছু লোক আসবে। সার্বিক উন্নয়নের কাজে সাক্ষরতা প্রসারে এগোতে হবে। আজ সি, এম, ডি এলাকায় প্রায় ৩০ লক্ষ লোক নিরক্ষর। শিল্পাঞ্চলগুলোতে নিরক্ষর জনগণের হার বেশি। বয়স্কদের কার্যকারী সাক্ষরতা প্রকল্পর মধ্যে এবং বাচ্চাদের আবেতনিক প্রাথমিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্তি করার কাজ বাড়ান হচ্ছে। কিন্তু দ্রুত-গতিতে নিরক্ষরতা দূরীকরণ না করলে আগামী দিনে সাক্ষর ও নিরক্ষর জনগণ পাশাপাশি থাকবে। সি, এম, ডি, এ কাজে নেবেই প্রায় ৬০০ প্রাথমিক বিদ্যালয়কে ভবন নির্মাণ বা মেরামতকল্পে সাহায্য দিয়েছে। সরকারী, বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান এ ব্যাপারে কাজ চালাচ্ছেন। হুগলির পূর্ব তীরে ও

পশ্চিম তীরে যে সব এলাকায় লোকসংখ্যা বাড়বে বোঝা যাচ্ছে সেখানে এলাকা উন্নয়নের কাজ চালান হচ্ছে। বর্ধিত জনসংখ্যা ধরে রাখার জায়গাগুলো যথাক্রমে পূর্বপাড়ে কল্যাণী, কাঁচরাপাড়া, নৈহাটি, হালিসহর, উত্তর বারাকপুর, রাজারহাট, বারাসত, উত্তর দমদম, বরাহনগর, দক্ষিণেশ্বর, লবণহ্রদ, পূর্ব-কলকাতা, তিলজলা-তপসিয়া, সাউথসুবার্বন, যাদবপুর, গড়িয়া, বজ্রবজ্র, বারুইপুর, রাজপুর ইত্যাদি এলাকায়। পশ্চিমপাড়ে বাঁশবেড়িয়া, জুগলি, চুঁচুড়া, ব্যাঙুল, চন্দননগর, ভদ্রেশ্বর, চাঁপদানী, শ্রীরামপুর, রিষড়া, উত্তরপাড়া, কোমলগর, ডানকুনি, পঃহাওড়া, আন্দুল, সাঁকরাইল, বাউরিয়া এবং নতুন এলাকা সমূহ। এইসব এলাকার সঙ্গে পথপরিবহন, জলপথ পরিবহন ব্যবস্থা ভালমত যোগাযোগ রাখবে। পশ্চাৎভূমির সঙ্গে রেলপথে, সড়ক ও জল পথে এদের যোগাযোগ থাকবে। সি, এম, ডি, এ-র সর্বত্র সড়ক পথে সংযোগ থাকছে। যেমন দ্বিতীয় জুগলি সেতুপথ চৌরঙ্গী ভবানীপুর এলাকার সঙ্গে সেতু পথের দ্বারা যোগ রাখবে অপরপ্রান্তে পশ্চিমপাড়ে দক্ষিণ হাওড়ার জাতীয় সড়ক ৬-এর সঙ্গে। ঐ দিকের প্রবেশ পথের সঙ্গে জাতীয় সড়ক ২ এ-র বাইপাস—কোণা এক্সপ্রেসওয়ে এবং সেন্ট্রাল হাওড়া এক্সপ্রেসওয়ের যোগাযোগ থাকবে। জি, টি রোড বাইপাস ও বঙ্কিম সেতুর সঙ্গে কোণা এক্সপ্রেসওয়ের একপ্রান্ত যোগাযোগ রাখবে অন্যদিকে বাঁশবেড়িয়া, কল্যাণী সেতু পথের সঙ্গে যুক্ত থাকবে। এদিকে পূর্বপাড়ে ভাবী কল্যাণী সেতু পথের সঙ্গে বারাকপুর এক্সপ্রেসওয়ে মিশবে। এ পথের সঙ্গে দমদম স্পার হাইওয়ে ও বেলঘরিয়া এক্সপ্রেসওয়ের যোগ থাকবে। আবার ডানকুনি থেকে চওড়া রাস্তা, বিবেকানন্দ সেতু ও

দক্ষিণেশ্বর হয়ে বেলঘরিয়া এক্সপ্রেসওয়েতে জাতীয় সড়ক দুই-তে মিলবে। প্রকল্প আছে—শোভা-বাজার ও নিমতা ঘাটের কাছে তৃতীয় জুগলি সেতু, উত্তর হাওড়ার সঙ্গে পূর্ব কলকাতা ও লবণহ্রদের যোগাযোগ সহজ করবে। এদিকে লবণহ্রদ উপনগরীতে যাতে উঁচু গাড়ী ও দোতলা বাস যেতে পারে তারজন্য মাণিকতলা রেলসেতুর নীচে ও উল্টাডাঙ্গা রেলসেতুর নীচে ‘আগার পাস’ প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। লবণহ্রদ থেকে উল্টাডাঙ্গা অরবিন্দ সেতু হয়ে বড়বাজার এলাকা দিয়ে তৃতীয় জুগলি সেতু দিয়ে কোণা এক্সপ্রেসওয়ে, কোণা ট্রাকটার্মিনাল উপনগরীতে দ্রুত যাতায়াত সম্ভব হবে। ইষ্টার্ন মেট্রো বাইপাস, দক্ষিণ-পূর্ব কলকাতার রাজপুর এলাকা হয়ে গড়িয়া পাটুলি, বৈষ্ণবঘাটা, তিলজলা-তপসিয়া, পার্কসার্কাস এলাকা হয়ে লবণহ্রদ উপনগরী ছুঁয়ে বেলঘরিয়া এক্সপ্রেসওয়ে ও বারাকপুর এক্সপ্রেসওয়ের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে। বজ্রবজ্র এলাকার সঙ্গে নদীপথে বাউড়িয়া অঞ্চলের যোগ থাকবে। রেলস্টেশনের, জাতীয় সড়কের এবং এক্সপ্রেসওয়ের ও নদীবন্দরের সঙ্গে যুক্ত রেখেই সন্নিহিত এলাকায় ও নতুন এলাকায় বিকাশকেন্দ্র এবং অঞ্চল উন্নয়নের কাজ চালান হচ্ছে। পাতাল রেলের কাজ সম্পূর্ণ হলে দমদম থেকে টালিগঞ্জ, দক্ষিণেশ্বর থেকে ঠাকুরপুকুর এবং লবণহ্রদ থেকে রামরাজাতলা পর্যন্ত টিউব রেল চলবে। এর ছপাশের পথ গুলোয় আরও বসতি হবে।

পাতালরেল যেমন বহু বাড়তি যাত্রীবহন করবে তেমন তখন যাত্রীসংখ্যাও বাড়বে। এখন যদি কলকাতাতে ৪৬লক্ষ যাত্রী দৈনিক চলাচল করেন শতাব্দী শেষে তা ৮০ লক্ষের বেশী হবে। পাতাল রেল প্রথমে ১৩ লক্ষ যাত্রী নেবে পরে রোজ ৩৫ লক্ষ

পর্যন্ত যাত্রীবহনে সক্ষম হলেও গণ-পরিবহণ ব্যবস্থায় ভিড় দেখা যাবেই। শহরের আবর্জনা বর্তমানে ২২০০ থেকে ২৫০০ টন পর্যন্ত দৈনিক জমা হয়। এর পরিমাণ আরও বাড়বে। তবে সবটা না হলেও হাজার টন মতন আবর্জনা থেকে দৈনিক কম্পোষ্ট সার তৈরির কারখানার প্রকল্প শুরু হয়েছে। এছাড়া ঐ আবর্জনা থেকে জৈব তেল তৈরীর প্রকল্প রচনা হয়েছে। এতে জঞ্জাল আদরণীয় হবে কারণ কৃষি ক্ষেত্রে ঐ সার কাজে লাগবে। তবে জঞ্জাল থাকছেই। বাসস্থানের ক্ষেত্রে বলা যায় বর্তমানে সি, এম, ডি এলাকায় ১৫ লক্ষাধিক গৃহবাসী পরিবারের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশের আয় মাসে ৩৫০ টাকার কম। সি, এম, ডি এলাকায় মাত্র ২৬লক্ষ লোক রুজ্জী-রোজগার করে থাকে যা পশ্চিমবঙ্গের শতাধিক ছোট-বড় শহরের বাসিন্দার মোট রোজগারের ৭৯শতাংশ ধরে রেখেছে। এখানে মাত্র ৮শতাংশ বাসিন্দা পাকা-আবাসনের (সুযোগ-সুবিধা সমন্বিত) ভাড়া দিতে সক্ষম। বর্তমানে মোট গৃহবাসীর মধ্যে মাত্র ১৬ শতাংশের নিজস্ব জলের কল বাথরুম এবং মাত্র ১১ শতাংশের নিজস্ব পায়খানা আছে। বর্তমানে কমপক্ষে ৫ লক্ষ-৬০ হাজার বাসগৃহ ইউনিট দরকার। এখন বছরে মোটে ৩০-৪০ হাজার বাসগৃহ ইউনিট তৈরী সম্ভব হচ্ছে। এই সমস্যা ব্যাপক ও ব্যয়বহুল ছাড়া এলাকা উন্নয়ন সাপেক্ষ বলে আশু সমাধান সম্ভব নয়। শতাব্দী শেষে সম্ভায় বাড়ী বানানো সম্ভব হলে তাতে এ এলাকা ভরে যাবে সন্দেহ নেই। কিন্তু বর্তমানের বাসগৃহ চিত্র থেকে বলতে পারি তখন বাড়ী-ঘর বাড়বো প্রতি আবাসিক ইউনিটে এখন যেখানে গড়ে ৭-৮ জন বাসিন্দা আছেন ঐ সময় সেখানে কিছু কম সংখ্যক থাকবেন। বৃহত্তর কলকাতার এক-চতুর্থাংশ

বাসিন্দাই বস্তীতে থাকেন। কলকাতাতে দশ লক্ষাধিক বস্তীবাসী আছেন। সি, এম, ডি, এ মহানগরীর তিন হাজার রেজিস্টার্ড বস্তীর মধ্যে দেড়হাজার বস্তীর ১২লক্ষাধিক বাসিন্দার পুরসেবা জুগিয়েছেন। আরও বস্তীতে ও উদ্বাস্ত কলোনীতে পরিবেশ উন্নয়নের প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। কিন্তু বস্তীতে স্বস্তিতে নিঃশ্বাস এখন দেখা গেলেও দারিদ্র্য কারণবশতঃ বহু বস্তী ইতিমধ্যে গজিয়ে উঠবে বলা চলে। সি, এম, ডি, এ হকার্স-কর্ণার, সুপার মার্কেট ও মিউনিসিপ্যালমার্কেট তৈরী করে দিচ্ছে। শিল্প ভিত্তিক কর্মচঞ্চল বিকাশ-কেন্দ্রগুলির সঙ্গে যোগ রেখেই বাজারগুলো থাকবে। লবণহ্রদে 'অবাধ বাণিজ্যনীতি' চালু হলে এবং দমদমে 'একসপোর্টজোন' হলে এবং হলদীয়া নগরীর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই এলাকায় আর্থিক বিকাশ উন্নত হবে সন্দেহ নেই। বিকাশযোজনার ফলে ও শিল্পায়ণের ফলে বহুলোক নানাভাবে কাজ পাবেন। তবু চাকুরীয়াদের সংখ্যা যদি বছরে গড়ে ৩.৪ শতাংশ হারে বৃদ্ধি হয় তবুও ১৯৮৬ সালে ৪০-৪৫ লক্ষের বেশী লোকের কর্মসংস্থান হবে না। আর দুহাজার সালে কর্মী সংখ্যা ৬০-৬৫ লক্ষ হবে। তাই বেকার থাকবে কিন্তু বর্তমানের থেকে বেশী লোক কাজ পাবে ও কম বেকার থাকবে। কলকাতার ৩ বাকী ৩৪টি পুরসভা এবং সি, এম, ডি, এ-র কর্মভোগের ফলে যে উন্নতি হবে তা বজায় রেখে আগামী শতকের জন্য টিকিয়ে রাখা এবং আধুনিকীকরণ করা বায়সাধ্য সেকথাও সকলে ভাবছে। পশ্চিমবাংলার ৯২টি পুরসভার মধ্যে এই ৩৫টির নিজস্ব এলাকায় যে উন্নতি চলছে তা দেখে বাকীরাও নিজস্ব প্রয়োজনবোধে উন্নয়নসংস্থা গড়ে তুলতে পারে আশা করা যায়। কেননা শহুরে চাহিদা ও আধুনিকতার স্বাদ সব নাগরিকই পেতে চান। আজ পশ্চিমবাংলার মোট জন-

সংখ্যার ২৪-৭৫ শতাংশ শহরে বাস করেন। এরমধ্যে প্রায় ১৮ শতাংশলোকই সি, এম, ডি. এলাকাসী। এ চিত্র পাণ্টাবে অর্থাৎ শহরায়ণের প্রসার সারা বাঙলায় হবে সন্দেহ নেই। আজকের মেট্রোপলিস কলকাতা তার কসমোপলিটন চেহারা নিয়ে বিচিত্র সাহিত্য-সংস্কৃতি নিয়ে, ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-নিরক্ষর বহুভাবীদের নিয়েই

বস্ত্রী-স্টাইল স্কাপার বৃকে ধরেই কোটির বেশী লোক নিয়ে ৮৬ তে মেগালোপলিস কলকাতা হবে। যে কলকাতা আজকের সে কলকাতা চিরদিনের একথা মনে রেখে নাগরিকদের দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধের অমুশীলন সর্বস্তরে চালিয়ে যেতে হবে তাতেই পরিচ্ছন্ন কলকাতা গড়ে উঠবে।

একসঙ্গে চারবছরের জন্য

সি. এম. ডি. এ-কে

যোজনা কমিশনের ব্যয় মঞ্জুরী

এযাবৎ যোজনা কমিশন সি এম ডি-এর প্রান দফায় দফায় পাশ করতেন, টাকা মঞ্জুর করতেন কিস্তিতে কিস্তিতে। এবার (১৯৭৬-এ) যোজনা কমিশন, সি. এম ডি.-এর সব প্রান সহ চার বছরের জন্ত একসঙ্গে ১৭৫ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছেন। তাই বরাদ্দের বেশীভাগ বৃহত্তর কলকাতাব (মেট্রো-পলিটান ডিস্ট্রিক্টের) আধা-শহর, আধা-গ্রাম এলাকার দিকে নজর রেখে মঞ্জুর করা হয়েছে। ১৭৫ কোটি টাকার ব্যয় বরাদ্দের মধ্যে ১৯৭৬-এ ৩৭ কোটি, ১৯৭৭-৭৮-এ ৪২ কোটি ৫০ লক্ষ, ১৯৭৮-৭৯তে ৪৫ কোটি ৫০ লক্ষ, ১৯৭৯-৮০তে উন্নয়নের জন্ত ৪৫ কোটি ২০ লক্ষ, পানীয় জল প্রকল্পে ৩৮ কোটি, ভূগর্ভস্থ পয়ঃ প্রণালী নির্মাণে ৩১ কোটি, অঞ্চল উন্নয়ন পরিকল্পনায় ৩০ কোটি ৮০ লক্ষ, বস্তি উন্নয়নে ১০ কোটি, পার্ক, খেলার মাঠ ইত্যাদির উন্নয়নে ২ কোটি, সি. এম. ডি-এ এলাকায় পঞ্চায়েত প্রশাসিত অঞ্চলের উন্নয়নে ৫ কোটি ৩০ লক্ষ, প্রশাসনিক ব্যয় বাবদ ৯ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। টাকা আসবে কেন্দ্র ও রাজ্যের উভয়ের সমায়ুপাতিক গ্রান্ট, বাজারে ঋণ পত্র বিক্রী ও চুক্তিকর (অকটয়) আদায় থেকে।

For Flavour & Quality

Drink

Oodlabari Tea

It is delicious & fresh Oodlabari teas are manufactured under strict supervision to ensure that it suits your taste.

Contact :

THE OODLABARI CO. LTD.

“NILHAT HOUSE”

11, Rajendra Nath Mukherjee Road,

CALCUTTA-700001.

Telephone : 23-1101 & 23-4093

Jaipur Sales Depot :

The Oodlabari Co. Ltd.,

C-36, Lajpat Marg,

‘C’ Scheme, Jaipur.

Telephone : 62317

66074

Delhi Sales Depot :

The Oodlabari Co. Ltd.,

809, Clock Tower,

(Subji Mandi),

Delhi—7.

Telephone : 22-3523

22-9477

পৌর সংস্থা তথা রৌগ্যমুদ্রানি

শিবপ্রসাদ সমাদ্দার

কলকাতা পুরসভা তথা কলকাতা মহানগরী এলাকা (মেট্রোপলিটান)-এর আঁওতায় ৩৪ টি মিউনিসিপ্যালিটির পৌনঃপুনিক আর্থিক সঙ্কটের দরুণ ১৯৭০ সাল থেকে উন্নয়নমূলক এবং মূলধনী কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন একটি বিশেষ সংস্থা—কলকাতা মহানগরী উন্নয়ন সংস্থা (ক্যালকাটা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি সংক্ষেপে সি.এম.ডি.এ. ওদিকে পৌর) সংস্থাগুলির দায়িত্ব দৈনন্দিন পরিচালনার, অর্থাৎ চালানো, তদারকি এবং মেরামতি তবে, তদারকি এবং উন্নয়নমূলক কাজ পুরোপুরি আলাদা করার পক্ষে এবং বিপক্ষে প্রচুর বলা যেতে পারে। আসলে মূল সমস্যা হোল, কি ভাবে যথেষ্ট সম্পদ বৃদ্ধি সম্ভব যাতে উন্নয়নমূলক কাজ চালিয়েও পরিচালনা, তদারকি এবং মেরামতির জন্য উদ্বৃত্ত থাকে। সি.এম.ডি.এ. সম্পদ সংগ্রহকরেন কিছুটা অর্কট্রয় বা চুঙ্গী কর থেকে, কিছুটা ঋণ পত্র বাজারে ছেড়ে আর কিছুটা রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দ ঋণ থেকে।

তদারকি বনাম উন্নয়ন

২। সি.এম.ডি.এর পক্ষে বছরের পর বছর যেমন বাজারী এবং সরকারী ঋণ পরিশোধের সমস্যাটা বড়ো হতে থাকবে তেমনি তার তৈরী সম্পদ পরিচালনা ও তদারকি করার দায়িত্ব যখন পৌরসংস্থাগুলির উপর বর্তায় তখন গোড়া

থেকেই প্রশ্ন উঠে, আশু এবং অনিবার্য মীমাংসার দাবীও হাজির হয় চালু ব্যাখার এই খরচা কোথা থেকে আসবে। বড়ো বেড়ের নলকূপ হোক অথবা নূতন তৈরী পার্ক, সাম্প্রতিক চওড়া করা সড়ক, সাধারণ ইলেকট্রিক বালবের বদলে ভাপা পারদের (মার্করি ভেপার) এর বাড়ির সার. কিংবা শক্তিশালী পাম্প সমেত প্রতিষ্ঠিত নূতন ময়লা নিষ্কাশন স্টেশন—এই সব নূতন উদ্যোগে অনিবার্য প্রশ্ন হল রাজস্ব খাতে ব্যয় বৃদ্ধি। হিসাব করে দেখা গেছে নূতন তৈরী সম্পদের বাৎসরিক পরিচালনা, তদারকি এবং মেরামতিতে বিনিয়োগিত মূলধনী অর্থের শতকরা ১০ ভাগ অর্থের প্রয়োজন। সুতরাং মিউনিসিপ্যালিটি ও করপোরেশনের হাতে নূতন মূলধনী কাজগুলি অর্পণ করতেই এই সমস্যাটা দেখা দেবে। এই সম্পদের নবলব্ধ সুযোগ সুবিধা করদাতাদের কাছে পৌঁছতে হলে পৌরসংস্থাগুলির রাজস্ব বৃদ্ধি এবং সেই বাড়তি অর্থে সূষ্ঠু পরিচালনা সুনিশ্চিত করা ছাড়া উপায় নাই। আর এক হিসাবে দেখা গেছে ফি বছর পুরসেবার সকল বাড়তি দাবী মেটাতে বাজেট শতকরা দশভাগের মত বাড়ি দরকার, কিন্তু রাজস্বের বিবৃদ্ধি পাঁচ ভাগ ছাড়াতে পারে না।

৩। প্রয়োজনের তুলনায় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানের রাজস্ব বৃদ্ধির সুযোগ অত্যন্ত সীমিত। বাড়ীর এবং সম্পত্তির ট্যাক্সই এদের রাজস্বের মূল উৎস, যাকে কলকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন অনুযায়ী একত্রিত কর (কনসলিডেটেড রেট) বলা হয়ে থাকে।

এই কবের পরিমাণ পুরসভার মোট রাজস্বের দুই-মি তৃতীয়াংশ। আর অবশিষ্ট ট্যাক্সের অর্ধেক পেশা, ব্যবসা ও বৃত্তির উপর ধার্ব লাইসেন্স ফী থেকে, প্রেমোদ কর ও প্রেমোদ-প্রদর্শনী থেকে এবং অন্যান্য বিশেষ বিশেষ সেবা-প্রকরণ বা কর্ম-উদ্যোগ, যথা, বাজার মোটর গাড়ীর পার্কিং বা রাখার ফী এবং বিশেষ জল সরবরাহ থেকে উপার্জন করা হয়। বাকী অর্ধেক আসে সরকারে কাছ থেকে—মেট্রোপলিটান এলাকায় আদায়ীকৃত পণ্যের চুঙ্গীকর এবং কর্মচারীদের দেয় মহার্ঘ ভাতার শতকরা ৮০ ভাগ ভরতুকি থেকে। চুঙ্গী করের আদায় খরচা খরচ বাদ দিয়ে অর্ধেক পায় সি এম ডি এ, বাকীটার আধাআধি কলকাতা পুরসভা এবং অন্যান্য মিউনিসিপ্যালিটি-গুলি তুল্য অংশে। সি এম ডি এ গঠনের পর থেকে এই যে নূতন রাজস্ব পাওয়া গেল এটি ওদের মূলধনী কাজের জন্য অকিঞ্চিৎকর তো বটেই হস্তান্তরিত সম্পদের পরিচালনা ও তদারকির জন্য পৌরসংস্থাগুলির পক্ষেও। এছাড়া পুরানো সম্পদ পরিচালনার দায়িত্বওতো ওদের আছে, যার খরচও বাড়বে।

পৌর জালে কি পড়ে, আরো পাকড়াই কি করে ?

৪। কলকাতা পুরসভার রাজস্ব ফী অকিঞ্চিৎকর। সম্পত্তি কর, ব্যবসা ও পেশার ওপর লাইসেন্স ফী ইত্যাদি থেকে বছরে আয় মাত্র ১৩ কোটি টাকা। এ-ছাড়া চুঙ্গী করের শতকরা ২৫ ভাগ থেকে পাওয়া মাত্র ২.৭০ কোটি টাকা এবং কর্মচারীদের মহার্ঘভাতার জন্য ভরতুকি বাবদ ৩ কোটি টাকা। এই সভার অর্থ সঙ্কট ভারত সরকার কর্তৃক গঠিত “পৌর প্রশাসনে আয়ব্যয় ব্যাপারে সংস্কার (বাজেটরি রিফর্মস ইন দি

উনিসিপ্যাল এ্যাডমিনিস্ট্রেশন) কমিটি প্রণীত রিপোর্ট অনুধাবন করলে পাওয়া যাবে। এই রিপোর্ট অনুযায়ী ১০ লক্ষের বেশী জনসংখ্যা সমন্বিত শহরে (১৯৭৪-এর মূল্যস্তর অনুযায়ী) উপযুক্ত পৌর সেবা-প্রকরণের আয়োজন করতে মাথাপিছু বছরে ১০৯ টাকা ব্যয় করতে হবে। কলকাতা করপোরেশন ১৯৭৪-৭৫ সালেও মাথাপিছু ৫৫ টাকার বেশী বছরে ব্যয় করতে পারেনি। এতেই স্মৃতিত করে পুর সেবার সামর্থ্য করপোরেশনের কত সীমিত ! সেই তুলনায় বোম্বে ব্যয় করছে ১২১ টাকা, দিল্লী ৮২ টাকা, আহমেদাবাদ ৭১ টাকা।

৫। বর্তমানের (১৯৭৬-৭৭) আনুমানিক বাজেটে করপোরেশনের রাজস্ব খাতে মোট আয় দেখা যায় ২৩.৪ কোটি টাকা আর রাজস্ব খাতে মোট ব্যয় ২৮ কোটি টাকা অর্থাৎ ৪.৫ কোটি টাকার ঘাটতি। পূর্ব বছরগুলি থেকে ঘাটতি রয়েছে ১৯.৫২ কোটি টাকা ; অর্থাৎ মোট ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ২৪ কোটি টাকা। করপোরেশন আয় বাড়াবার জন্য বিভিন্ন প্রস্তাব দিয়েছে তাদের মধ্যে কয়েকটি নীচে দেওয়া হল :

ক] ট্যাক্সের হার বৃদ্ধি এবং ব্যবসায়, পেশা ও বৃত্তির ওপর ফীসের হার বৃদ্ধি। কলকাতা মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্ট সংশোধনসহ এই প্রস্তাব আইন সভায় গৃহীত হয়েছে এবং চলতি বছরে রাজস্ব খাতে আয় ৫ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাবে।

খ] বেতনভোগী ব্যক্তিদের ওপর কর্মসংস্থানগত (এমপ্লয়মেন্ট) কর প্রবর্তন যা সরকারের অনুমোদন পেলে বছরে রাজস্ব খাতে আয় ৭৫ লক্ষ টাকা রাজস্ব আয় আদায় হবে।

গ] যে দশলক্ষ লোক প্রতিদিন বাইরে থেকে কলকাতায় ট্রেন, মোটরযান ইত্যাদিতে আসা-যাওয়া করেন এবং শহরের ব্যবস্থাপনা-গুলি ভোগ করতে কোন মাসুল দেন না, তাদের ওপর প্রাস্তিক (টার্মিনাল) কর ধার্য করা। এই প্রস্তাব গৃহীত হলে বছরে ছু কোটি টাকা আয় হবে।

ঘ] সংশ্লিষ্ট আইনের পরিবর্তন করে বিদ্যুৎ শুদ্ধ বাবদ আদায়ীকৃত মোট রাজস্বের শতকরা দশভাগ যেন পুরসভাকে দেন। এই প্রস্তাব কার্যকরী হলে কর্পোরেশনের ৫০ লক্ষ টাকা রাজস্ব খাতে আয় হবে।

ঙ] আমোদ-প্রমোদ করের অন্তত শতকরা ২৫ ভাগ করপোরেশনের হাতে গভর্নমেন্ট তুলে দিলে করপোরেশনের আয় অন্ততঃ ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাবে।

চ] সম্পত্তি হস্তান্তরের ওপর শুদ্ধ ধার্য করা।

ছ] ১৯৭১ সালে পুরসভা প্রথম কলকাতার মোটরযানের ওপর চক্র কর (হুইল ট্যাক্স) ধার্যের প্রস্তাব দিয়েছেন। বর্তমান বাজেটেও এই ট্যাক্সের পুনরুজ্জীবন আছে। বর্তমানে গভর্নমেন্ট যে হারে মোটরযান ট্যাক্স নেন পুরসভা চান তার অধিক হারে আদায় করতে।

জ] সরকার যে মোটরযান কর আদায় করেন তার গরিষ্ঠাংশ পুরসভাকে দেওয়া উচিত। কারণ ভারী মোটরযানগুলির পরিবহনে শহরের সড়ক দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই ট্যাক্স

গভর্নমেন্ট আদায় করেন, অথচ ক্ষতিগ্রস্ত পথ মেরামতের ভার কর্পোরেশনের। গভর্নমেন্ট এখন বুঝতে পেরেছেন, যে শহরের সড়কগুলির ঠিকমত মেরামতের জন্য, নতুন ট্যাক্স আদায় করে তার বৃহদাংশ করপোরেশনকে দিতে হবে।

ঝ] পণ্য প্রবেশ বা চুঙ্গী করের আরও বেশী অংশ পুরসভার জন্য ধার্য করে নাগরিক জীবনের জরুরী সেবা-প্রকরণগুলির দায়িত্ব পালনের ব্যবস্থাপনা। বর্তমানে করপোরেশন এই ট্যাক্সের শতকরা ২৫ ভাগ, প্রায় ২.৭ কোটি টাকা পেয়ে থাকে।

ঞ] একত্রিত কর আদায়ের জন্য পাঁচটি ধাপে জমি বা বাড়ীর ট্যাক্স নির্দিষ্ট করা আছে। এই ধাপগুলি হল ১৫, বার্ষিক মূল্যায়নের ১৮.৫, ২২.৫, ২৭.৫ এবং শতকরা ৩০.৫ ভাগ। সংশ্লিষ্ট আইনের সংশোধন করে ধাপগুলি শতকরা ১৫, ২৫, ৩৫ এবং ৫০—এরকম চারটি ধাপে উন্নীত করলে অতিরিক্ত তিন কোটি টাকার রাজস্ব আদায় করা যেতে পারে। এই খাতে আয়-বৃদ্ধির আর একটি প্রস্তাব অনাবাসী বাড়ী-গুলির ওপর শতকরা ৫০ ভাগ অতিরিক্ত কর (সারচার্জ) ধার্য করে আরও ২.৫০ কোটি টাকার রাজস্ব বৃদ্ধি।

৬। উপরে যে দশ দফায় নতুন আয়ের উৎস দেখানো হয়েছে তার মধ্যে শেষের তিনটি (জ) থেকে (ঞ) চালু আয়ের পুনর্বিহাণ বা পুনর্বণ্টন পর্যায়ে পড়ে। বাকীগুলি আমাদের পক্ষে নতুন হলেও ভারতের অনেক

২৮১ পৌর সংস্থা তথা রৌপ্যমুদ্রানি

পৌর সংস্থার আয়ের স্বীকৃত পন্থা। (ছ) অনুচ্ছেদে প্রস্তাবিত মোটরযান করের পুনর্বর্ধন সরকার যদি মঞ্জুর করেন তবে চক্রকর সম্বন্ধে (জ) প্রস্তাবটির ইতর-বিশেষ করা দরকার হবে। (ঞ)-তে বর্ণিত একত্রিত কর সম্বন্ধে জুলাই ১৯৭৬-এ পাশ করা সংশোধনী মিউনিসিপ্যাল অর্ডিনাল্সে কেবল অনাবাসী বাড়ী সম্বন্ধে ব্যবস্থা করা হয়েছে। একত্রিত কর বা কনসোলিডেটেড রেট পৌর আয়ের প্রধান অংশ বলে এই সম্বন্ধে একটু বিশদ আলোচনা দরকার।

বাসা বাধার মাপদুল

৭। বাড়ী (তথা জমি) এর কর ধার্য হয় বার্ষিক মূল্যমানের উপর। এ মূল্য ছ ভাবে স্থির করা যেতে পারে। এক, এবং সেটিই প্রধান পন্থা, বাড়ীভাড়া থেকে প্রাপ্ত আয়ের উপর। মালিক প্রথম পার্যায় যাকে বাড়ীর দখল দিয়ে ভাড়া আদায় করে তার কাছ থেকে রসিদ বই অনুযায়ী যে আয় হয় কিছুটা খরচা খরচের ছাড় দিয়ে সেটিই ভাড়াভিত্তিক আয়। বাড়ীতে ভাড়াটে থাকলে যে স্তরে ট্যাক্স ধার্য হচ্ছে (পাশের কলামে দেখুন) তার অর্ধেকটা আয়ের থেকে ছাড় হবে। তার পর ক্ষেত্রবিশেষে ছাড় দেওয়া হয় অনধিক শতকরা দশ ভাগ আসবাব, পাম্প, লিফ্ট এই সব সুবিধা ভাড়াটেকে দিতে যে খরচা তার দরুন। তার পরে আসে রক্ষণাবেক্ষণ ও সারাইয়ের জন্য শতকরা দশ ভাগ ছাড়। একটা বাড়ী যদি একজনকে ভাড়া দেওয়া হয় মাসিক ১০০ টাকায় এবং সে যদি ৭৫ টাকায় একাংশে দ্বিতীয় পর্যায়ের বা উপভাড়াটে রাখে তাহলে ঐ বাড়ীর বার্ষিক মূল্যায়ন সাধারণতঃ করা হয় এই ভাবে :—

বার্ষিক ভাড়া ১০০×১২	১২০০ টাকা
এই স্তরে ধার্য ১৫ ১/২ শতকরা	
ট্যাক্সের অর্ধেক ছাড় অর্থাৎ	
শতকরা	৭ ৩/৪ ২০
	১১০৭
ভাড়াটেকে সুবিধা দিতে খরচা	
শতকরা ১০ পর্যন্ত	
ধরুন শতকরা ১০	১১০
	২২৭
রক্ষণাবেক্ষণের খরচ শতকরা ১০	১১০

বার্ষিক মূল্যায়ন বা নীট আয় ৮৮৭
উল্লেখযোগ্য যে দ্বিতীয় বা আরও তলার স্তরে আরও ক্ষীতকায় ভাড়া আদায় হলেও পৌর আইনে তার হিসেব নেওয়ার কোন অবকাশ নেই। ফলে মনগড়া রসিদ দেখিয়ে বা বেনামীতে লাখ লাখ টাকার আসল ভাড়া হিসাবের বাইরে চলে যাচ্ছে।

৮। বার্ষিক মূল্যায়নের দ্বিতীয় উপায় হল বাড়ী বানানোর বাজার দর। এটির হিসাব করতে প্রথমে সাম্প্রতিক খরচার হিসাবে বাড়ীর মূল্য স্থির করে তার সঙ্গে জমির মূল্য জুড়তে হবে। বাড়ীর জীবনকাল সাধারণতঃ ২০০ বছর ধরা হয়। তাই বাৎসরিক মূল্যক্ষয় বা ডিপ্রিসিয়েশন ধরা হয় শতকরা ১/২। বাড়ী বানানোর খরচা থেকে বয়স অনুযায়ী ডিপ্রিসিয়েশন বাদ দিয়ে বর্তমান মূল্য স্থির হল। তার শতকরা ৫ ভাগ ধরা হয় বার্ষিক ন্যায্য ভাড়া বা ভাড়াটের কাছ থেকে নীট প্রাপ্তব্য (লেটিং ভ্যালু)। এই নীট ভাড়ার সমতুল্য থোক (গ্রোস) হিসাব আয় কাগজে কলামে দেখাতে ঐ প্রথম পদ্ধতি অনুযায়ী রক্ষণাবেক্ষণের জন্য শতকরা ১০ যোগ করতে হবে। বাড়ীর বাজার দর ভিত্তি

২৮২ জয়শ্রী, ভাদ্র ১৩৮৩

নিঃসন্দেহে বৈজ্ঞানিক এবং পুরসভার অর্থাগমের পক্ষে প্রশস্ততর, কিন্তু আইনের দুর্বলতায় কদাচিৎ এটির আশ্রয় নেওয়া যায়। পুরসভাকে তাই মালিকের দেওয়া ভাড়ার হিসাবেই সম্বৃষ্ট থাকতে হয়।

৯। বার্ষিক মূল্যায়নের উপর বাড়ীর ট্যাক্স ধরা হয় পাঁচটি স্তরে, যার কথা আগেই বলেছি। তার হিসাব হল এই রকম ১০০০ টাকার কম মূল্য হলে বার্ষিক ট্যাক্স শতকরা ১৫ ভাগ ১০০০—৩০০০ টাকায় শতকরা ১৮ ভাগ, ৩০০০—১২০০০ টাকায় শতকরা ২৭ ভাগ এবং তদুর্ধ্ব শতকরা ৩৩ ভাগ। এই পরিমাণের উপর রবীন্দ্রসেতু বা হুগড়া পুলের দরুন যোগ করতে হবে শতকরা ১/২ খাস কলকাতার জন্য অথবা শতকরা ১/৪ টালিগঞ্জ এলাকার জন্য। এই আদায় বর্তমান বাজার দরে খুবই কম। তাই সংশোধনী প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল : ১০০০ টাকা পর্যন্ত (অথবা নামক-ওয়াস্বে এই স্তরটি রাখতে হলে ৫০০ টাকা পর্যন্ত) বার্ষিক ট্যাক্স থাকুক শতকরা ১৫ ভাগ; তার উপরে ১০০০—৫০০০ টাকার স্তরে শতকরা ২৫ ভাগ, ৫০০০—২০০০০ টাকায় শতকরা ৩৫ ভাগ এবং ২০০০ টাকার উর্ধ্ব শতকরা ৫০ ভাগ। সরকার এই প্রস্তাব এখনো মঞ্জুর করছেন না। ভারতের সব চাইতে বড় ও বিস্তারিত পুরসভা 'বৃহন্নুর্ধ্বই মহা-পালিকা' (বৃহৎ বোম্বাই মিউনিসিপ্যালিটি) কিন্তু বাড়ীর ট্যাক্সে কাউকেই বেশী রেয়াত করে না। ঢালা শতকরা ৩৬ ভাগ হারে বার্ষিক মূল্যায়নের উপরে কর আদায় করে। তার ভিতরে শতকরা ২৪ ভাগ সাধারণ পুরসেবার দরুন, শতকরা ৮ ভাগ সাফাই বা হালুল কর এবং শতকরা ৪ ভাগ জলকর।

১০। কলকাতায় যে বাড়ীর ট্যাক্স বা একত্রিত

কর আদায় হয় তার ভিতরে চারটি উপাদান আছে : জলনিকাশী (স্ফায়ারেজ) এর দরুন শতকরা ৯ ভাগ, রাস্তায় আলোর দরুন শতকরা ১০ ভাগ, জলকর শতকরা ২৫ ভাগ এবং বাকী শতকরা ৫৬ ভাগ জঞ্জাল সাফাই ও অন্যান্য পুরসেবার দরুন। উল্লেখযোগ্য যে এর ভিতরে রাস্তা মেরামতীর কোন আলাদা হিস্তা নেই। তার মানে সাধারণ পুরসেবায় জঞ্জাল সাফাই শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শ্মশান-কবর স্থান, বাজার পার্ক সমস্ত কিছু চালিয়ে যদি সম্ভব হয় রাস্তার দরুন খরচও ঐ শতকরা ৫৬ ভাগের হিস্তা থেকে আসবে। তার বাইরে মোটরযান করের ঐ ১০ লাখ টাকা। অবশ্য প্রশ্ন তোলা যায় গাড়ী পার্কিংয়ের দরুন বছরে যে ১০ লাখ টাকা আদায় হয় সেটাও তো রাস্তায়ই খরচ করা উচিত। উচিত হয়তো বলা যায়, তবে এই শুষ্ক বসানোর কৈফিয়ত কর্পোরেশনের সাধারণ আয় বৃদ্ধি। তাছাড়া পুরসভা সাধারণ খাতের টাকা টেনেই রাস্তা মেরামতীতে কয়েক বছর ৭০ লাখ টাকার মত খরচা করেছে।

আমাদের বাড়ী ভাঙে কারা দিল মুষ ?

১১। একথা হয়তো উঠতে পারে যে চক্রকর অথবা অন্য প্রস্তাবিত ট্যাক্স, সরাসরি অথবা ঘুরিয়ে, গভর্নমেন্টের রাজস্বের প্রতিযোগী হবে। উদাহরণ-স্বরূপ চাকর উপর ট্যাক্স ধার্য করার প্রস্তাবের উল্লেখ করা যেতে পারে যে ট্যাক্স কলকাতা শহরের সীমানার ভিতরে চালু মোটরযানের উপর ধার্য হবে। এই ট্যাক্স ধার্যের বেশ গুরুতর যৌক্তিকতা রয়েছে, কারণ শহরের রাস্তাগুলি ভারী মেটেরয়ানে, যথা, লেল্যান্ড ট্রাক, দোতলা বাস, এবং ট্রেইলার ছাড়াও মেট্রো-পলিটান ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (ভূগর্ভ রেল) এর

ভারী চলন্ত যন্ত্রাদিতে ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাতে শহরের অর্থসঙ্গতির ওপর অতিরিক্ত চাপ আসে, কারণ এই ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তাঘাটগুলির তদারকির এবং মেরামতের দায় শহরের। অপরপক্ষে, রাজ্যসরকার বলতে পারেন তাঁদের মোটর যান করের সাথে পুরসভার এই চক্রকর প্রতিযোগিতা করবে। সে যাই হোক, পুরসভা সরবে ঘোষণা করতে চায় চক্রকর যে কারণে ধার্য করা হবে, সে-কারণেই ব্যয় করা হবে, অর্থাৎ রাস্তার তদারকি, মেরামত ও আলোর ব্যবস্থাপনা ছাড়া এই ট্যাক্সের কোন অংশই অর্থ খাতে ব্যয় করা হবে না। মোটর যানের মালিক এবং পারিচালকরা হয় তো আতঙ্কিত হবেন যে ডবল ট্যাক্সের চাপে তাদের ব্যবসায়ের নাভিস্থান উঠবে। পুরসভা তা মনে করে না। বোম্বাইতে তো মোটর ভেহিকলস্ ট্যাক্সের পাশাপাশি একই হারে পুরসভার চক্রকর চালু রয়েছে। ১৯৭২-৭৩ সালে এই খাতে বোম্বে পুরসভার আয় হয়েছে ৩.৯৮ কোটি টাকা।

১২। বছরে ৮০০০ টাকার উর্ধ্ব বেতন-ভোগীদের ওপর কর্মসংস্থানগত ট্যাক্স ধার্যের প্রস্তাব রাজ্য সরকারের গুরুতর বিবেচনাধীন রয়েছে। আয়কর ছাড়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই ৮০০০ টাকা বার্ষিক আয় সম্পন্নদের এই প্রস্তাবিত কর্মকর থেকে ছাড় দেবার প্রস্তাব করা হয়েছে। কর্ম কর ধার্য হলে আয়করের সঙ্গে একটা বিরোধের ধারণা হতে পারে; কারণ ট্যাক্সদাতার মনে হবে তাকে দোকর ট্যাক্স দিতে হচ্ছে। চাকুরীজীবীদের কিন্তু মনে রাখা উচিত যে তারা যখন পুরসভার পরিধির মধ্যে রুজি রোজগার করেন, তখন তাদেরও এই শহরের তদারকির জন্য কিছু ট্যাক্স দেওয়া উচিত, যেমন স্ব-নিয়োজিত উপার্জকেরা তাদের ব্যবসা, পেশা, কিংবা বৃত্তি থেকে দিয়ে

থাকেন। তাছাড়া, এই ট্যাক্স ভারতবর্ষের কয়েকটি মিউনিসিপ্যালিটিতে বর্তমানে চালু রয়েছে।

১৩। চুঙ্গীকরের ব্যাপারে বলা যায় যে ভারতের অগ্রাগ্র পুরসভা করপোরেশন কলকাতার মতন, নাগরিক অগ্রাগ্র সংস্থার সঙ্গে এই ট্যাক্স ভাগাভাগি করে না। বোম্বে এই খাতে ২৩ কোটি টাকা উপায় করে, যে আয় কলকাতা করপোরেশনের ১৯৭৫-৭৬ সালের সংশোধিত বাজেটের মোট আয়ের সমপরিমাণ। আমেদাবাদ যার লোকসংখ্যা কলকাতার অর্ধেকেরও কম সেই করপোরেশন পণ্যের প্রবেশ ট্যাক্স বাবদ পায় ১০ কোটি টাকা, বাঙ্গালোর পায় বছরে ৭ থেকে ৮ কোটি টাকা। কলকাতায় এই ট্যাক্স থেকে আয় মাত্র ২.৭০ কোটি টাকা। চুঙ্গী কর বিক্রয় করের সঙ্গে কিছুটা প্রতিযোগিতা করতে পারে, কারণ এই দুই ধরনের করই পণ্যের উপর আরোপিত হয় যার বর্ধিত মূল্য ক্রেতাদের উপর বর্তায়। তাই বিক্রয় কর রাজ্য সরকারের রাজস্বের একটি মস্ত বড়ো উৎস। বিক্রয় কর থেকে আয়ের প্রভূত বৃদ্ধিতে চুঙ্গী করের আদায় হ্রাস পাবার সম্ভাবনা থাকে।

১৪। সম্প্রতি পাঁচতলার চাইতেও উঁচু বহুতল বাড়ীর ওপর ট্যাক্সধার্য করে সরকার পৌরসংস্থার অর্থক্ষেত্রে হাত বাড়িয়েছেন। এর ফলে, করপোরেশনের আয়ের সব চাইতে বড় উৎস, বাড়ী ও সম্পত্তির ওপর ট্যাক্স ব্যাহত হবে। এই উপলক্ষ্যে বলা যেতে পারে যে, জমির উর্ধ্বতম পরিমাপ সংক্রান্ত আইনে, অতিরিক্ত জমি অধিগ্রহণের জন্য জমির মূল্য ধার্য করে দেওয়া হয়েছে। সামাজিক শ্রায় বিচারের দিক থেকে এই আইনের ধাক্কা এসে পড়বে পৌর প্রতিষ্ঠানের ওপর। কারণ এই আইনের জমির দাম কমে যাবার

সম্ভাবনা দেখা দেবে, যার ফলে শহরের সম্পত্তির মূল্য হ্রাস পাবে। কলকাতা সমেত বিভিন্ন শহরের সম্পত্তির মূল্যের বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে প্রতি বছরেই শহর-সম্পত্তি বার্ষিক মূল্যায়নের ক্রম-উত্থবমুখীনতার ফলে বছর বছর সম্পত্তি থেকে ট্যাক্সের পরিমাণ বেড়ে যায়। বর্তমান মূল্যায়নের ভিত্তিতে সম্পত্তির ট্যাক্সের পরিমাণ নিম্নগামী হবার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে।

১৫। যে ট্যাক্সের উৎসগুলি মিউনিসিপ্যালিটির প্রাপ্য, গোড়ার দিকে সে ধরনের উৎসগুলি গভর্ণমেন্ট হাতে নিয়েছে; যেমন মোটর যান কর এবং প্রমোদ কর সরকার মোটর যান কর থেকে ৮ কোটি টাকা পান, তার মধ্যে পুরসভাকে দেওয়া হয় মাত্র ১০ লক্ষ টাকা। তামিলনাড়ু সরকার প্রমোদ কর আদায় করলেন, সেটা পায় মাদ্রাজ পুরসভা। কিন্তু কলকাতা করপোরেশনের বেলায় তা হয় না। সরকার ও পুরসভার মধ্যে অর্থ সংস্থানের ক্ষেত্রে সংঘাতের এগুলি দৃষ্টান্ত। কিন্তু এ ধরনের সংঘাত এড়িয়ে মিগনের ক্ষেত্র বার করতে হবে, কারণ মিউনিসিপ্যাল করপোরেশনগুলিরও দায় দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের জন্ত, তাদের আর্থিক সঙ্কটিকেও শক্ত ভিতের ওপরে দাঁড় করাতে হবে। সেজন্য প্রমোদ কর বা বিদ্যুৎ শুল্কের উপর সারচার্জ, মোটর যান কর কিম্বা বহুতলবিশিষ্ট বাড়ীর ওপর সম্পত্তি কর ধার্য করার প্রস্তাব বিবেচ্য তা না হলে গল্লে গোল ডিলক্স যেমন ভালুকের বাড়ি ভাতে মুখ দিয়েছিল তাই হবে আর তিন কেন তাবৎ পৌরসংস্থার চৈচানিই সার হবে।

ওগো পুরবাসী, চাইব খানিক ধন

১৬। জুলাইমাসে আর্ডিন্যান্স বলে একত্রিত কর সম্বন্ধে যে ব্যবস্থাগুলি নেওয়া হয়েছে সেটি

আলোচনা করা যাক। এই আইনে অনাবাসী (দোকান, অফিস ইত্যাদি) বাড়ীর উপর শতকরা ৫০ ভাগ অতিরিক্ত কর বা সারচার্জ ধার্য করা হয়েছে। এটি আদায় করতে শহর জুড়ে কর নির্ধারণ (অ্যাসেসমেন্ট) এর এক বিপুল আয়োজন করতে হবে। এটি সময়সাপেক্ষ এবং মিশ্র (যেমন একাংশে মকান অপরাংশে দোকান) বাড়ীর বেলা জটিলও বটে। পুরসভা চিন্তা করছে কত তাড়াতাড়ি এই কাজে হাত লাগানো যায়।

বাড়ীর ট্যাক্সের ব্যাপারে আরও ছোটো ছোটো ছোটো মঞ্জুরী দেওয়া হয়েছে। এক, সি এম ডি এর হাতে যে সব বস্তীর উন্নতি হয়েছে, তার কর আগেকার উত্থবসীমা শতকরা ১৮'৫ ভাগের জায়গায় শতকরা ৩৩'৫ ভাগ পর্যন্ত ধার্য করা যাবে। এর দরুন আয় ২৮ লাখ থেকে ৩ কোটি টাকায় উঠবে দ্বিতীয়ত, কলকাতা উন্নয়নসংস্থা (সি আই টি) এর বাড়ীর উপর সর্বোচ্চ কর ছিল শতকরা ২২'৫ ভাগ। এগুলির উপরও সাধারণ হারে শতকরা ৩৩'৫ ভাগ পর্যন্ত কর ধার্য করলে আগেকার তিন লাখ টাকার জায়গায় চার লাখ আয় হবে।

১৮। আইনের একটা সংশোধন আদায়ের ব্যাপারে খুব সাহায্য করবে। কলকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনের ১৮৩ ধারা সংশোধন করে বলা হয়েছে ধার্য একত্রিত করের বিকল্পে কারুর যদি আপীল থাকে তবে মূল্যায়ন ও করের শুনানী চূড়ান্ত না হওয়া পর্যন্ত বিতর্কিত কর জমা দিতে হবে। শুনানীর নিষ্পত্তি হলে ঐ হিসাবে জমা কর ফেরত দেওয়া হবে। এ ছাড়া অনাদায়ী করের উপরে বাৎসরিক শতকরা ১২ ভাগ সুদ আদায় হবে। আগে ছিল শতকরা ৬ ভাগ। এই ছুটি পরিবর্তনের ফলে কর দেওয়ার

গাফিলতি বন্ধ হবে। আগে একখানা আপীল ঠুকেই লোকেরা হয় পুরানো রেটে কর দিত, নয়তো এক দম বন্ধ। রায় বেরতে বছরের পর বছর ঘুরে যেত, তখন সামান্য হুদে বকেয়া চুকানোর সুযোগ পুরোপুরি করদাতার, আর পুরসভার ভাঁড়ে মা ভবানী।

১৯. আনন্দের বিষয় যে পৌর সংস্থাগুলির আদায় উত্তলের ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ সরকার আজ বেশ সচেতন। আগষ্ট ১৯৭৬এ বিশ্ব ব্যাঙ্ক প্রতিনিধিদল যে কলকাতা সফর করে গেলেন তাতে এই কথাই ঘুরে ফিরে উঠেছে যে সি এম ডি এলাকায় যে কোটি কোটি টাকার সম্পদ সরকারী খরচা ও আর্থিক সংস্থাগুলির আমুকুল্যে গড়া হচ্ছে কলকাতা পুরসভা তথা স্থানীয় সংস্থাগুলি সে সম্পদ রক্ষা ও চালাবার জন্ত কতটা টাকার বন্দোবস্ত করছেন। উপরে উল্লিখিত ব্যবস্থাগুলি বিশ্ব ব্যাঙ্কে বলা হয়েছে। তা ছাড়া সরকারী সিদ্ধান্তও জানানো হয়েছে যে অদূর ভবিষ্যতে একটি কেন্দ্রীয় মূল্যায়নপর্বদ গঠিত হবে। পুরসভাগুলির বদলে এই পর্বদ পুর এলাকায় গৃহসম্পত্তি মূল্যায়নের ভার নেবে সূত্রে একটি অর্ডিন্যান্স জারী করা হবে। এই সূত্রে একটা প্রস্তাব তোলা হয়েছে যে বাড়ীর বাজার দাম বা ভাড়ার আয় এই দুটি পরিচিত পন্থার বদলে এলাকা বা বাড়ীর রকমফের অনুযায়ী একক এলাকাভিত্তিক করের দর ধার্য করা হোক—অর্থাৎ প্রতি বর্গ মিটারে এত টাকা। এ সম্বন্ধে মুশকিল আছে। সেটি কলকাতা পুরসভা যেমন তুলে ধরেছে তেমনি বলেছেন বিশ্ব ব্যাঙ্কের অর্থবিশেষজ্ঞ মিঃ ডব্লু বেয়ার্ড। তিনি কয়েক মাস আগেই একটি রিপোর্টে বলেছেন অচিরে কেন্দ্রীয়

মূল্যায়নপর্বদ গঠিত হোক এবং আপাততঃ পরিচিত পন্থায় কাজ শুরু করুক।

২০. অর্ডিন্যান্স বলে অপর একটি বড় পদক্ষেপ সূচিত হয়েছে। সেটি হল জলসরবরাহ ও জল-নিকাশীর জন্ত যত্র আয় তত্র ব্যয় নীতি গ্রহণ এবং জল মেপে জলের ট্যাক্স বসাবার জন্ত মিটার বসানো। এই মহানগরীতে প্রায় শতাব্দীর বয়সী জলচালনা-পদ্ধতিতে মিটার বসাতে প্রচুর সময় ও অর্থের প্রয়োজন—সত্যি কথা বলতে কি মেইন, অগ্রাশ্রু পাইপ ও ঘরে ঘরে নল সব ঢেলে সাজতে হবে। তাই নূতন সংযোগ, বহুতল বাড়ী, হোটেল, কারখানা ইত্যাদিতেই প্রথম মিটার বসানোর হাত লাগানো হবে। ইতিমধ্যে একত্রিত করের শতকরা ২৫ ভাগ জলকর ও শতকরা ৫ ভাগ জলনিকাশী বা স্যুয়ারেজ কর হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এটি অবশ্য প্রতীক পৃথকীকরণ, কেন না পুরসভার বর্তমান বাজেটে জলসরবরাহের দরুন বছরকার মোটা খরচ ৭.২৮ কোটি টাকা, যেখানে একত্রিত করের শতকরা ২৫ ভাগ হিসাবে আয় ৩ কোটি; জলনিকাশী (স্যুয়ারেজ ও ড্রেনেজ) এর জন্য এই দুটি পরিমাণ দাঁড়াবে যথাক্রমে ২ কোটি ও ৬০ লক্ষ টাকা। স্বয়ংসম্ভার করতে তাই জলের দাম অনেকটা বাড়তে হবে। পুরসেবা শুরু করার আমলে মাগনা জল বা হাওয়া জোগানোর আদর্শ ছিল। আজ জলশোধন ও সরবরাহের খরচায় পড়ে এবং পলিউশন রুখতে ও নির্মল পরিবেশ রচনায় প্রকৃতির সাধে বিজ্ঞানকে জড়াতে হবে। তাই আদর্শের রূপান্তর হতে বাধ্য।



বস্তি-উন্নয়ন পরিকল্পনায় কয়েকটি ভাবনার বিষয়

সুবিমল ঘোষ ও পীযুষকান্তি সোম

গোড়ার কথা

বহুরত্নকে আগে কোলকাতায় একটি বস্তির উন্নয়ন প্রকল্প তৈরীর জন্য আমাদের একটি সমীক্ষক দল কাজ করেছিল। এই সময় কয়েকজন সমাজ-বিজ্ঞানী; স্থপতি ও পরিকল্পনাবিদেব' সঙ্গে বস্তি সমস্যার আলোচনার ফলশ্রুতি আর আমাদের সামান্য অভিজ্ঞতা বর্তমান রচনার মূলধন।

বস্তিসমস্যা দূরীকরণে আজকাল দৈনিকপত্রে খবরাখবর বের হচ্ছে। কয়েকটি প্রকল্পের সংবাদও মাঝে মাঝে পরিবেশিত হতে দেখা যায়। এই সব প্রকল্পে জনসাধারণের নৈতিক সমর্থন পাওয়া দরকার। যে প্রয়োগবাদী চিন্তাধারার কল্যাণে এই সব প্রকল্পের সার্থক রূপায়ণ সম্ভব বলে মনে হয় তার জন্য জনসাধারণের বিশেষ চেতনার প্রয়োজন আছে। এই চেতনার উন্মেষের জন্য কয়েকটি মৌলিক বিষয়ের আলোচনা করতে এই প্রবন্ধের অবতারণা।

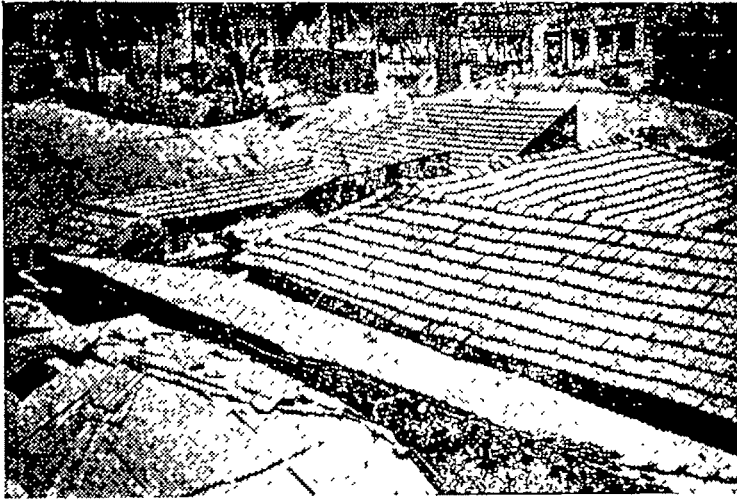
পৃথিবীর অনেক শহরেই বস্তি আছে। তবে দেশের অবস্থা যতই খারাপ হয় তার বস্তির হুর্দশাও ততই পীড়াদায়ক হয়। আমাদের দেশে কোলকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি বড় বড় শহরে বস্তি আছে ভিন্ন ভিন্ন নামে। বস্তি দেখে চোখ সয়ে গেলেও সমাজবিজ্ঞানীরা কিন্তু এই সমস্যাটিকে সহনীয় বলে মনে করেন না। তাঁরা মনে করেন এটি একটি জাতীয় সমস্যা। এত বড় করে তাঁরা এই সমস্যাটিকে দেখছেন কেন? ইতিহাসে দেখি যে, অবহেলিত মানুষের লাঞ্ছনা

যখন তীব্র হয় তখন সভ্যমানুষের নিশ্চেষ্টতার অচলায়তন ভেঙ্গে পড়ে। সমাজবিজ্ঞানীরা এ সত্যটা জানেন বলেই সময় থাকতে বস্তি দূরীকরণে সমাজকে সচেতন করতে চেয়েছেন। কথায় বলে, ঘরে আগুন লাগলে কুয়ো খোঁড়ার চেষ্টা বুধা। তাই বস্তিবাসীর উন্নতির জন্য সময় থাকতে কাজে হাত দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ। কিন্তু বস্তির জীবনযাত্রা সম্বন্ধে আমরা কতটুকুই বা জানি যে, তাদের মধ্যে গিয়ে আমরা সার্থকভাবে কাজ করতে পারি? তাই এখন বস্তিজীবনের কিছু তথ্য ছবি ও পরিসংখ্যানের সাহায্যে উপস্থিত করছি।

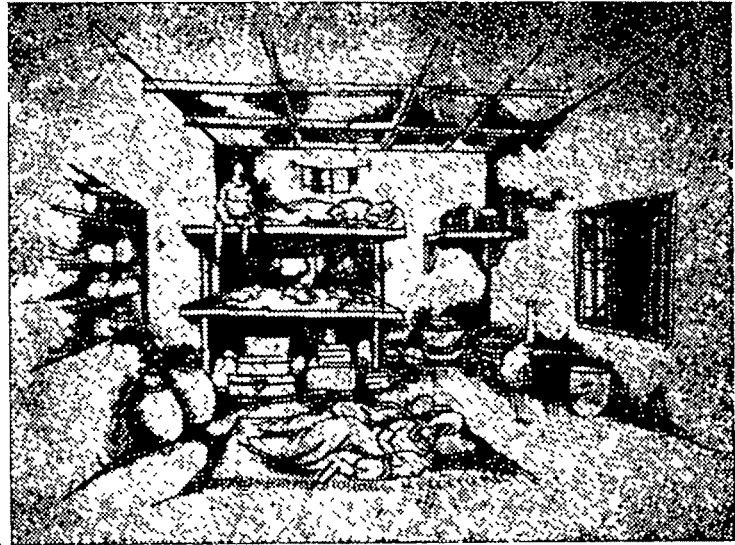
কাছে থেকে দেখা বস্তি

বস্তি বলতেই চোখের সামনে সাধারণতঃ যে ছবি ভেসে ওঠে তা হচ্ছে গায়ে গায়ে লাগা অনেকগুলি টালি বা টিনের ছাদওয়ালা মাটি কিংবা টিনের বেড়া দেওয়া ঘর। ১নং চিত্রে (ফটো) সেইরকম দৃশ্যই দেখান হয়েছে কোলকাতার কোন একটি বস্তির। ছবিটি দূর থেকে তোলা। বস্তি সম্বন্ধে আমাদের অনেকের মনের ছবিটিও দূর থেকে পাওয়া। ক'জনই বা আমরা বস্তিবাসীর মাঝে গিয়ে ওদের বাড়ীঘর এবং জীবনযাত্রা লক্ষ্য করেছি?

যে বস্তিটির ছবি দেখান হল তার ঘরগুলি সাজানর একটা রীতি আছে। একটি বড় উঠানের চারপাশ বা তিনদিক ঘিরে দশবারখানা ঘর ও বারান্দা নিয়ে



चित्र १



चित्र २



चित्र ३



চিত্র ৪



চিত্র ৫



চিত্র ৬

কয়েকঘর বস্তিবাসী থাকেন। এরকম কয়েকটি চাকবাঁধা মৌজাকের মত বস্তির গঠন। যাতায়াতের জ্ঞতা পায়ে চলার কাঁচা ও বাঁধান ছুরকম রাস্তাই দেখা যায়। যে বস্তির ছবি নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে সেখানে উঠোন ও ঘরের বিহীন অধিকাংশ ক্ষেত্রে যে ভাবে আছে তাতে দক্ষিণের বাতাস সহজেই ঘরগুলিতে বয়ে যাবে। ঘরদোর আর সংসারের জিনিষপত্র বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বস্তিবাসীদের ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যনীতি-বোধ বেশ প্রখর। স্থানাভাব অবশ্যই আছে। ২নং চিত্রে একটি খাটের উপর আরেকটি খাট চাপিয়ে “থ্রিটিয়ার” (three tier) শোবার ব্যবস্থা দেখান হয়েছে। আবহাওয়া অল্পকূল থাকলে বাইরের উঠানেও শোওয়া চলে। রান্না-খাওয়া অনেকেরই বারাগায় সারতে হয়। এ ছাড়া বারাগা নানারকম কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ৩নং ছবিটিতে স্কেচের সাহায্যে বারাগা ও উঠানের আংশিক দৃশ্য দেখান হয়েছে। এই বস্তিতে সমীক্ষা চালানর সময় প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, কয়েকটি পরিবারের জন্য একটি “কম্যুনিটি কিচেন” বা সার্বজনীন রান্নাঘর দিলে তারা পছন্দ করবে কিনা। রান্নার ব্যাপারে এরা গোপনীয়তা বা privacy পছন্দ করে—“কম্যুনিটি কিচেন” এদের কাছে জনপ্রিয় হবে বলে মনে হয় না।

ইস্কুলে যাবার বয়সী ছেলেপুলেরা অনেকেই অর্থাত্বে বেশীদূর পড়াশুনা করতে পারেনি। বস্তির মধ্যে ফাঁকা জায়গা থাকলে এরা খেলাধুলা করে সময় কাটায়। ৪নং ছবিটিতে এই ছেলেদের দেখা যাচ্ছে। খুব দামী কিছু খেলার সামগ্রী অবশ্য জোটেনি—মেজাজ কিন্তু হাসিখুশী।

এদের বেশ কিছু পরিবারের দারিদ্র্য অবর্ণনীয়। ৫নং ছবিটিতে দেখা যাচ্ছে একটি ছোট দোকানঘর

তারই নীচে উবু হয়ে বসে থাকা (প্রায় অদৃশ্য) একটি বৃদ্ধা। সমীক্ষকরা এই বৃদ্ধার সঙ্গে কথা বলেন। সংসারে তার একটি মেয়ে ছাড়া আর কেউই নেই। ঐ ঘরখানিই ওদের একমাত্র সম্বল। সামনের অংশ দোকানঘর হিসাবে ভাড়া দিয়ে মাসের সামান্য কয়েকটি টাকাঘ ছজনের দিন চলে কোনমতে। মেয়েটিকে বিয়ে দেয়নি কেন জিজ্ঞাসা করাতে বৃদ্ধা উত্তর দিল যে, তালাক দিয়ে ওর মেয়ের বিয়ে ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। কেউ না বলে দিলেও সমীক্ষকদের ধারণা বস্তিবাসীদের অর্থসাহায্যে এদের দিন চলে। এরকম কিছু পরিবারের সন্ধান এই বস্তিটিতে পাওয়া গেল। মানুষের চরম যে মহত্ব—নিঃস্বার্থ দানের ক্ষমতা—তা এই বস্তিবাসীদের মধ্যে কিন্তু যথেষ্ট দেখা গেল। এ কথাটা কি আমরা সবাই জানি ?

পরিসংখ্যান

বস্তিবাসীর বিষয়ে কিছু কিছু পরিসংখ্যান হয়ত অনেক পাঠকের জানা আছে। তবুও আবার উল্লেখ করলে দোষ নেই। বস্তিবাসীদের অধিকাংশ পরিবারের রোজগার মাসে ৩৫০ টাকার বেশী নয়। ১৯৬৩ সনে এরকম দশটি পরিবারের মধ্যে মাত্র একটি পরিবারের নিজস্ব স্নানাগার ছিল। পানীয় জলের জ্ঞতা নিজস্ব কল ব্যবহার করতে পারে এমন ভাগ্যবান পরিবারের প্রাতি ছ’টিতে একটির বেশী নয় (৬নং চিত্র)। এসব পরিবারের জনপ্রাতি থাকার জায়গা প্রায় ২৫ বর্গফুট অর্থাৎ পাঁচজনের একটি পরিবার ৬৩ সনে কোলকাতায় যদি ৩৫০ টাকার কম রোজগার করে থাকে তাহলে ঐ পরিবার গড়ে ৯২৫ বর্গফুটের বাসস্থান পেয়ে থাকবে। অনেক বস্তিবাসীর অবস্থা এর চেয়েও খারাপ। একটু আগে যে বস্তিটি

সমীক্ষা করার কথা বলা হ'ল সেখানে শতকরা ৯০টি পরিবার মাসে ৪০০ টাকার কম রোজগার করে। এরা গড়ে ১৩২ বর্গফুটের বাসগৃহ পেয়েছে—পরিবারের জনসংখ্যা পাঁচের সামান্য কম। অতীতের একটি হিসাবে কোলকাতা শহরে কর্পোরেশন এলাকায় বস্তির সংখ্যা ৩০০০ আর তার জনসংখ্যা প্রায় ৭ লক্ষ ছিল। অথচ দেখা যাচ্ছে ন্যূনতম নাগরিক সুবিধাগুলি থেকে এই বিশাল দরিদ্রসমাজ বঞ্চিত—শহরের ভিতরেই কিন্তু এদের বাস। অনেক সময় শহরের অভিজাত পল্লীর আশেপাশেই এরা জোট বেঁধে বসিতে থাকে। নাগরিক সভ্যতাকে যদি সামাজিক উৎকর্ষের নিদর্শন হিসাবে ধরা যায় তবে তারই মাঝে মাঝে এত লাক্ষিত মানুষ অভিগণ্ড জীবনযাপন করে কেন? কিসের জন্যই বা এরা শহরে থাকতে বাধ্য হয়? শহরবাসী এবং কতৃপক্ষ এতদিন এদের সম্বন্ধে উদাসীন আচরণ করেছেন কেন?

গ্রাম ও শহর

যাযাবরবৃত্তিকে বাদ দিলে মানুষের আদিম বৃত্তি হ'ল চাষ-বাস। আর চাষ-বাসকে কেন্দ্র করেই গ্রামের সভ্যতা বা কৃষ্টি। গ্রামের মধ্যে কারিগরী-পণ্যসম্ভার মোটামুটি গ্রামের চাহিদা মেটাতেই ব্যবহৃত হ'ত। গ্রামের কামার, কুমোর এবং ছুতোর মিস্ত্রীরা গ্রামের জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় পণ্যসম্ভারটুকুর চাহিদা মিটিয়ে নিজেদের জীবিকানির্বাহ করত। গ্রামের লোকজনের ক্রয়ক্ষমতার উপর নির্ভর করেই সাধারণতঃ গ্রামবাসীর আয় ও ব্যয় নির্ধারিত হ'ত। এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় পুঁজিবাদী ক্ষমতা গ্রামের জমিদার ও মহাজনদের হাতেই ছিল।

ইংরাজ আমলে বাংলাদেশে কোলকাতা ধীরে

ধীরে শিল্পনগরী হয়ে গড়ে উঠতে থাকে। পুঁজি শিল্পপতিদের হাতে চলে আসে। সেই পুঁজির চক্রবৃদ্ধি গতি নগরবাসী শিল্পপতিদের অর্থনৈতিক ক্ষমতা বহুগুণ বাড়িয়ে তোলে। শহরাঞ্চলের আগ্রাসী অর্থনীতির কবলে পড়ে আশেপাশের মধ্যবিত্ত এবং দরিদ্র গ্রামবাসী শহরের দিকে আসতে আরম্ভ করে চাকরীর উদ্দেশ্যে। এদিকে শহরবাসীর ক্রয়ক্ষমতা গ্রামবাসীর তুলনায় অনেক বেশী হওয়ায় সীমিত খাদ্যপণ্য শহরের বাজারে বেশী দামে বিক্রী হতে থাকে। এই বিক্রয়লব্ধ অর্থ অধিক পরিমাণে গ্রামের জোতদার, মহাজনদের হাতেই চলে আসতে থাকে। আর ধনের ভোগ গ্রামে সম্ভব নয় বলেই শহরের ধনস্বীতি স্বাভাবিক কারণেই বেড়ে উঠতে লাগল। এই অর্থনৈতিক শক্তির বলেই শহর গ্রামের চেয়ে প্রাধান্য লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন “দেশের প্রাণ যে নগরে বেশী বিকাশ পায় তা নয়; দেশের শক্তি নগরে বেশী সংহত হয়ে ওঠে এই তার গৌরব।”

আমাদের গ্রামীণ সমাজব্যবস্থায় একদা ধনীর ধনে সমাজের যে অধিকার নানাভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল তার সাহায্যে দরিদ্র প্রজার দল ধনের ভাগ হয়ত কিছু পেয়েছে কিন্তু আত্মবশ হতে শেখেনি। ধনী যখন ধনের ব্যবহার করবার জন্য নাগরিক সভ্যতার কেন্দ্রে বাসা বাঁধল গ্রামে রায়তের দিন চালান অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। আরও কারণ ছিল। উত্তরাধিকার সূত্রে জমি খণ্ডিত হতে হতে যে আকৃতি পেল তার সাহায্যে রায়তের জীবন ধারণ আর সম্ভব ছিল না। তখন খোলা বাজারে পণ্যের মতই জমি বিক্রী করে ছোট ছোট রায়তরা ক্ষুদে জমিদার বা জোতদার শ্রেণী তৈরী করল। আর এই নিরন্ন ভূমিহীন, স্বল্পবিত্ত গ্রামের

লোক নগরে এসে ভিড় করলে ধনী নাগরিক আর শিল্পপতিদের নুতন দাস-শক্তি রূপে।

হিন্নমূল গ্রামবাসী—বস্তির খোরাক

এ গ্রাম থেকে হিন্নমূল হয়ে যারা শহরে এল তারা কল-কারখানায় এবং আরও নানাভাবে কাজে লেগে গেল। শহরে এরা শ্রমের বিনিময়ে বা পারিশ্রমিক পেত তার সাহায্যে শহরের সুবিধা ভোগ করা হুঃস্থগ্ন হলেও শুধু জীবনধারণের জন্য তা গ্রামের তুলনায় পর্যাপ্ত ছিল। শহরে তারা যেভাবেই জীবন আরম্ভ করে থাকুক ভবিষ্যতের অর্থোপার্জনের আশায় তাদের আর গ্রামে ফিরে যাবার প্রশ্ন উঠতেই পারেনা। তারাও বুঝতে পারল শহরে বড় হবার সুযোগ এবং সুবিধা অনেক। প্রথম অবস্থায় তারা কোন রকমে নিজের ও পরিবারের ভরণপোষণের জন্ত অর্থোপার্জনকেই একমাত্র উদ্দেশ্য করে নিলে। দ্বিতীয় অবস্থায় এরাই নানাবিধ বৃত্তিমূলক শিক্ষার সাহায্যে নিজের ও পরিবারের অমৃত্যু অনেকের উপার্জন ক্ষমতা বাড়িয়ে অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত পর্যায়ে উঠে আসার চেষ্টা করে থাকে। প্রথমাবস্থায় এরা নিজেদের অঞ্চলের লোক বা একই ধর্মাবলম্বীদের মাঝে বাস করার ইচ্ছা নিয়ে পূর্বসূরীদের আস্তানায় হাজির হয়। এই দরিদ্র বসবাসকারীদের নিয়েই শহরের নানা জায়গায় বস্তির উদ্ভব। জমির মালিক সাধারণতঃ কয়েকশর ঠিকানোড়াটে হাতে বাৎসরিক খাজনায় জমিকে লীজে ভাড়া দিয়ে থাকেন। ঠিকানোড়াটেরা ঐ জমিতে ঘর তুলে আগন্তুকদের কাছ থেকে ভাড়া নিয়ে থাকেন। মালিক যদি লীজসূত্রে বছরে কাঠাপ্রতি ২৫০ টাকার মত রোজগার করেন সেখানে প্রতি পাঁচ কাঠায় পনের থেকে কুড়িটি

কাঁচা ঘর তুলে একজন ঠিকানোড়াটে মাসে ৩০০ টাকা রোজগার করতে পারেন। ভাড়া ছাড়াও বস্তির মধ্যে দোকান দিয়ে বা ছোটখাটো ব্যবসার সাহায্যে এরা রোজগার আরও বাড়িতে পারে। ঠিকানোড়াটেরা বস্তিবাসী হলেও তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা অনেকের তুলনায় ভাল। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে বস্তির জমিতে মালিকের স্বার্থ যতটা তার চেয়ে ঢের বেশী স্বার্থ ঠিকানোড়াটের। তাই যদি হয় তবে সরকারী বস্তি উন্নয়ন প্রকল্পে উভয়ের উৎসাহ কতটুকু? তা বুঝতে গেলে সরকারের বস্তি-উন্নয়ন আইনের যে অনুচ্ছেদে এদের খেসারত দেবার কথা বলা হয়েছে তার আলোচনা করা দরকার।

উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থনীতি

মনে করা যাক কোন বস্তির মালিক এক একর জমি বাৎসরিক ৯০০০ টাকা খাজনায় কয়েকজন ঠিকানোড়াটীকে লীজ দিয়েছেন। জমির মালিকের দেয় কর ও ভাড়ার আদায়-খরচ বাদ প্রায় ১২ শতাংশ বাদ দিলে বাৎসরিক নীট আয়ের পরিমাণ হয় ৭৯০০ টাকা। এই জমির স্বস্থ ক্রয় করতে হলে আইনতঃ সরকারকে ৭৯০০ × ২০ বা প্রায় ১,৬০,০০০ টাকা জমির মালিককে দিতে হবে। তাহলে কাঠাপ্রতি মালিকের প্রাপ্য দাঁড়ায় ২৭০০ টাকার মত। এইসব বস্তির আশেপাশের জমি অনেক ক্ষেত্রে সাত আট গুণ বেশী দামে বিক্রী হয়ে থাকে। তবু জমির মালিক জমি বিক্রয় করতে অনিচ্ছুক হবেনা যেহেতু ঠিকানোড়াটে উচ্ছেদ করে চড়াদামে জমি বিক্রয়ের সুযোগ তার কাছে আকাশকুসুম। এছাড়া ১,৬০,০০০ টাকা ব্যঞ্চে “ফিল্ড ডিপোজিট” স্বীকৃতি জমা রাখলে বর্তমান সুদের হারে তার বাৎসরিক আয় দাঁড়ায় ১৬০০০ টাকা;

অন্যথায় ঠিকাভাড়াটের তদ্বির করেও অনেক সময় তার পক্ষে বাৎসরিক ১০০০ টাকার খাজনা আদায় করা দুষ্কর হয়ে পড়ে। এসব কথা বিবেচনা করলে জমির মালিকের পক্ষে বস্তির জমি সরকারী মালিকানায গেলে লাভ বই লোকসান দেখিনা।

এখন দেখা যাক বস্তি পুনর্বিন্যাস প্রকল্পের জন্য ঠিকা ভাড়াটের খেসারত কত? ঐ এক একর জমিতে জনা দশেক ঠিকা ভাড়াটে মিলে বছরে হাজার চল্লিশের বেশী রোজগার করা সম্ভব। ধরা গেল বছরের আয় ৪৫০০০ টাকা। এর থেকে মালিকের খাজনা, কর্পোরেশনের কর, মেরামতি খরচ, ভাড়া আদায়বাবদ অছাত্র খরচ বাদ দিলে নীট বাৎসরিক আয় ২৭০০০ টাকা হবেই। আইনতঃ এই দশজন ঠিকাভাড়াটের খেসারত দাঁড়ায় ২৭০০০ × ৫ বা ১, ৩৫,০০০ টাকা। সুতরাং মাথাপিছু খেসারতের পরিমাণ হ'ল ১৩,৫০০ টাকা। এই টাকায় ব্যাঙ্কের “ফিল্ড ডিপোজিট” স্কীমে বর্তমান সুদের হারে বাৎসরিক আয়ের পরিমাণ ১৩৫০ টাকা। কিন্তু ভাড়া থেকে নীট আয় ২৭০০ টাকা। স্পষ্টই অনুমান করা চলে যে, এতে ঠিকা ভাড়াটের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। কাজে কাজেই বস্তি পুনর্বিন্যাস করার জন্য সরকারী প্রকল্পে উৎসাহী হওয়া ঠিকাভাড়াটের পক্ষে সহজ নয়। এখন Slum Improvement Act হয়েছে, সুতরাং উপরোক্ত হিসাব অনুযায়ী যার যার খেসারত মিটিয়ে দিলে সরকার অবশ্য আইন প্রয়োগ করে বস্তি-পুনর্বিন্যাস প্রকল্প গ্রহণ করতে পারেন।

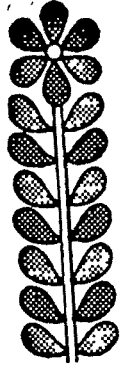
এতক্ষণের আলোচনা থেকে বোঝা গেল যে বস্তির জমি দখল করতে সরকারী তহবিল থেকে একর প্রতি প্রায় ৩ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ হিসাবে দিতে হবে। কোলকাতার কর্পোরেশনে বস্তি এলাকার আয়তন

১৭০০ একর। সমস্ত বস্তির জমি রাষ্ট্রীয়ত্ত্ব করতে হলে সরকারের খরচ দাঁড়ায় ৫১ কোটি টাকা। এর ওপর আছে পুনর্বিন্যাস প্রকল্প রূপায়ণের খরচ। '৬১ সনের হিসাবে রেজিস্টার্ড বস্তির জনসংখ্যা প্রায় ৭ লক্ষ। সুতরাং জমির পূর্বক্রয়াদিকার বাবদ মাথা পিছু খরচ প্রায় ৭০০ টাকা। জন প্রতি হাজার টাকা বরাদ্দ করলে বাকী থাকে জনপ্রতি ৩০০ টাকা খরচ করার ক্ষমতা। এর সাহায্যে কি আমরা বস্তি পুনর্বিন্যাস প্রকল্পের নাগরিক সুবিধাগুলি বস্তিবাসীদের হাতে তুলে দিতে পারি?

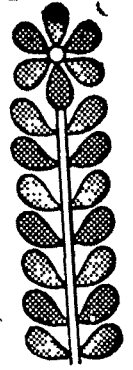
অর্থের যোগান যদি যথেষ্ট না হয় তবে বস্তিসমস্যা দূর করতে কিভাবে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন? বস্তি উন্নয়ন ও বস্তি পুনর্বিন্যাস বা আধুনিকীকরণের মধ্যে প্রথমটিতে খরচ কম আর দ্বিতীয়টিতে খরচের মাত্রা বেশী। এ দু'টির মধ্যে কোনটি কোথায় করতে হবে? সীমিত অর্থের সাহায্যে ন্যূনতম নাগরিক সুবিধাগুলি কী ভাবে দেওয়া যেতে পারে? বস্তিবাসীর জীবনযাত্রার সঙ্গে সামঞ্জস্য দেখে পরিকল্পনার ন্যূনতম মান নির্ধারণ কী উপায়ে সম্ভব? পরবর্তী আলোচনায় এই প্রশ্নগুলির উত্তর দেবার চেষ্টা করব।

হিতসাধন

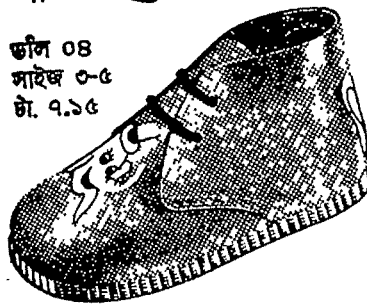
বস্তিবাসীর হিতসাধন করার জন্য আমরা যখন কাজে নামি তখন আমাদের জানা উচিত সেই বস্তির লোকেরা কেমনভাবে বসবাস করে আর তাদের সামাজিক ও পারিবারিক সম্পর্কগুলি কী ধরণের, তারা কী পছন্দ করে, আর কিসেরই বা বিরোধিতা করতে পারে। যারা হিতসাধনে ত্রুটি হয়েছেন, যথা পরিকল্পনাবিদ, স্থপতি প্রভৃতি তারা কেবল নিজেদের প্রযুক্তিবিচার সাহায্যেই এদের উপকার করতে পারবেন



শ্রীজোয় চাই নতুন জুতা



ডালি ০৪
সাইজ ৩-৫
ট. ৭.৯৫



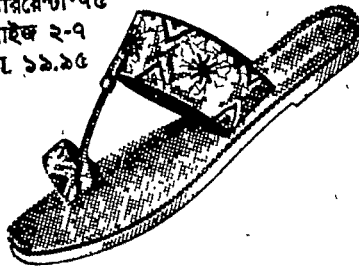
লিঙ্গিপট ৫১
সাইজ ৫-৮
ট. ১৬.৯৫



বালোরিনা ৫৫
সাইজ ৯-১১, ১২-১, ২-৬
ট. ২০.৯৫,
২৩.৯৫,
২৬.৯৫



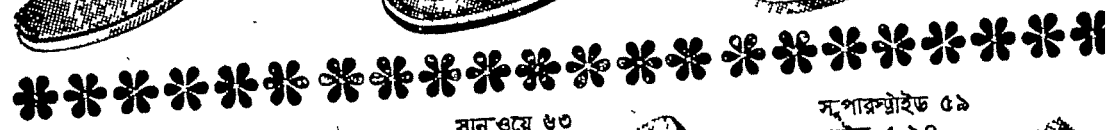
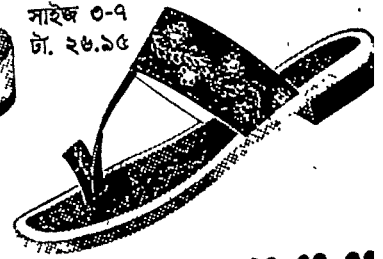
ওরিয়েন্টা ৭৫
সাইজ ২-৭
ট. ১৯.৯৫



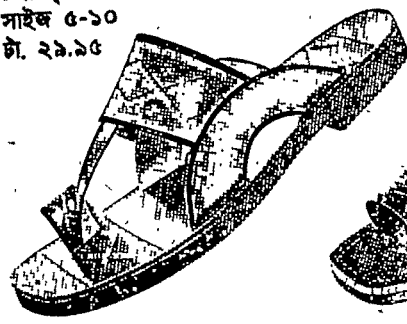
কুমকুম ১৮
সাইজ ২-৭
ট. ১৮.৯৫



রাখী ০৭
সাইজ ৩-৭
ট. ২৬.৯৫



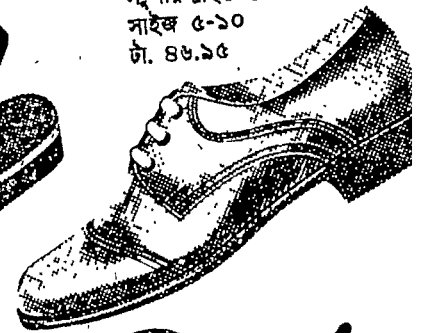
টপাস ৫৫
সাইজ ৫-১০
ট. ২৯.৯৫



সান্‌ওয়ে ৬৩
সাইজ ৫-১০
ট. ৩২.৯৫



সুপারস্টাইড ৫৯
সাইজ ৫-১০
ট. ৪৬.৯৫



***** Bata *****

এমন মনে করার যুক্তি নেই। কারণ অধিকাংশ পরিকল্পনাবিদ, স্থপতি প্রভৃতি উচ্চশিক্ষাভিমাত্রীদের সাথে বস্তিবাসীদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রভেদ অনেক গভীর।

বস্তুউন্নয়নের জ্ঞান সমীক্ষায় বস্তিবাসীর ঘরের আয়তন প্রভৃতি জ্ঞানার প্রয়োজনীয়তা যেমন আছে তেমনই জ্ঞান দরকার তার অর্থনৈতিক অবস্থা ও পারিবারিক গঠনতন্ত্র। যে কাঠামোর মধ্যে তার জীবনযাত্রার বিকাশ তাকে উদ্দেশ্য করে তার জ্ঞান পুনর্বাসন প্রকল্প তৈরী করলে তা চমকপ্রদ হ'তে পারে কিন্তু প্রশংসিত হয় না।

পারিবারিক গঠনতন্ত্র

যে বস্তুটি সমীক্ষার কথা বলেছি তাতে বাসিন্দাদের পারিবারিক গঠনতন্ত্র সম্বন্ধে কয়েকটি তথ্য পাওয়া গেল। বলে রাখা দরকার আলোচ্য বস্তুটির বাসিন্দারা মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত। এখানে পরিবারগুলিকে মোটামুটি ৪ ভাগে ভাগ করা যায় যথা, জৈব (nuclear), যৌথ, যৌগিক ও পরাশিত। নামগুলির ব্যাখ্যা প্রয়োজন। কেবল বাবা মা ও অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তান বা অবিবাহিত কন্যা নিয়ে যে পরিবার তাকেই আমরা জৈব পরিবার বলব। আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ কয়েকটি জৈব পরিবার একই রান্নায় খাওয়া-দাওয়া করলে তাকে যৌথ পরিবার বলা হচ্ছে। অনেক সময় একটি জৈব পরিবারকে কেন্দ্র করে অবিবাহিত নিকট আত্মীয়স্বজন একাধিকভাবে হয়ে বাস করে। একেও যৌথ পরিবার বলে ধরা হ'ল। কেবল আত্মীয়তা বা গ্রামসম্পর্কে পরিচয় থাকার দরুন কয়েকটি জৈব পরিবার ভিন্ন হাঁড়িতে রান্নাবান্না করা সত্ত্বেও পরিবারস্থলভ মনো-ভাব নিয়ে যখন পরস্পরের নিকটবর্তী হয়ে বাস করে

তখন তাকে আমরা যৌগিক পরিবার বলতে পারি। আত্মীয়তার সূত্রে বা গ্রামসম্পর্কে পরিচিত বলে বা যে কোন কারণে যদি একটি ছুঃছু পরিবার আর্থিক কিংবা অন্য সহায়তার জন্য আর একটি পরিবারের পাশাপাশি বাস করে তবে তাকে পরাশিত পরিবার বলা হবে। সুতরাং যৌগিক ও পরাশিত পরিবারগুলি আপাতদৃষ্টিতে ভিন্ন ভিন্ন জৈবপরিবারের সমষ্টিমাত্র বলে প্রতীয়মান হলেও তারা একটি মিলনসূত্রে গাঁথা। পুনর্বাসন প্রকল্পে এদের জন্য আলাদা আলাদা জৈব পরিবার হিসাবে বাসস্থান নির্বাচন করে পরস্পরের মধ্যে ব্যবধান স্থাপ্তি করলে এরা অসুবিধায় পড়বে।

আবার একথাও মানতে হয় যে, আজ যারা যৌথ-পরিবারভুক্ত অদূর ভবিষ্যতে তারা বিভাজন দ্বারা জৈব পরিবারে রূপান্তরিত হয়ে যৌগিক-পরিবার তৈরী করতে পারে। তখন তাদের আবাসিক প্রয়োজনও ভিন্নতর হবে। বাসস্থান পরিকল্পনায় প্রয়োজনের প্রকারান্তরে তার পরিবর্তন করে কাজ চালানর ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন। নজ্জার রচনার সময় এই “ফ্লেক্সিবিলিটি” রাখলে পরে এই সব খুচরো কাজ অনায়াসেই করিয়ে নেওয়া চলে। নজ্জার পরিকল্পনা “রিজিড” হলে এই পরিবর্তনের সুবিধাগুলি বাদ পড়ে। আর তখনই নূতন করে পরিবেশ-দূষণ আরম্ভ হয়।

পারিবারিক আয়-ব্যয়

ভিন্ন ভিন্ন পরিবারের আর্থিক উপার্জনক্ষমতা আলাদা। ১নং তালিকায় আলোচ্য বস্তুটির পারি-বারিক আয় ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। এই বস্তুটির পারিবারিক আয়ের সমীক্ষা থেকে জানা গেল যে শতকরা ৫০টি পরিবারের মাসিক আয় ১৭৫ টাকা বা তার কম। মাসিক আয় যেমন জানা হ'ল সেই সঙ্গে মাসিক খরচের নমুনাও জানা দরকার।

২৯৫ বস্তি উন্নয়ন পরিকল্পনায় কয়েকটি ভাবনার বিষয়

আয়ানুসারে পরিবারগুলিকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করে শতকরা দশ টাকা চক্রবৃদ্ধি সুদে ২০ বছরের মেয়াদে ১নং তালিকায় এদের খরচের নমুনা দেখান হ'ল। এই বাৎসরিক বৃদ্ধির সাহায্যে প্রতিটি পরিবারের জন্য

১নং তালিকা—পারিবারিক আয়-ব্যয়

শতকরা ব্যয়									
মাসিক									
পরিবার	আয় (টাকা)	ঘর ভাড়া	খাদ্য	জালানী	পোষাক	ঔষধ	যানবাহন	বিবিধ	সঞ্চয়
ক	০-২২	১১%	৬৬ ৭%	৬ ৭%	৭ ৮%	—	—	৭ ৮%	—
খ	১০০-১২২	৬ ৭%	৬৬ ৭%	২%	৮%	—	৩ ৬%	৬%	—
গ	২০০-২২২	৮ ৩৩%	৬৩ ৩৩%	৮%	৮%	৮ ৩ ২%	—	৪%	—
ঘ	৩০০-৩২২	৬ ২৫%	৬৫%	৮%	৮%	৫%	—	৭ ৭ ৫%	—
ঙ	৪০০-৫০০	৬%	৬০%	৮%	৮%	৬%	—	৪%	৮%

দেখা যাচ্ছে যে একমাত্র 'ঙ' বিভাগের পরিবার ছাড়া আর কোন পরিবারের সঞ্চয় বলতে কিছু আছে কিনা সমীক্ষার সাহায্যে বোঝা যায়নি। তবে একথা ভাবা চলে যে, বিবিধ খরচ বলে যা দেখান হয়েছে তার যৎসামান্য অংশ হয়ত বা সঞ্চয় হিসাবে থাকতেও পারে। বাড়ীভাড়া বাবদ কোন পরিবারই আয়ের শতকরা দশ ভাগের বেশী খরচ করে না। এ বস্তিটি অত্যন্ত পুরনো বলে এত কম বাড়ীভাড়া সম্ভব। যদিও এরা ১৫—১৭ টাকার বেশী ভাড়া সাধারণতঃ দেয়না তবুও বাড়ী কেনার টাকা কিস্তিবন্দীতে দিতে পারবে কিনা জিজ্ঞাসা করা হ'লে তারা উৎসাহ দেখিয়ে বলে যে তারা মাসে মাসে ২০ টাকার মত কিস্তিতে ঋণের টাকা শোধ করতে রাজী। সঞ্চয়ের পরিমাণ যথেষ্ট না হওয়ার জন্য নতুন তৈরী বাড়ীতে আংশিক মূল্য ক্যাশে জমা দেওয়া এদের পক্ষে সম্ভবপর নয়। সুতরাং আলোচ্য বস্তিটির উন্নয়নপ্রকল্পের মূলধন বস্তিবাসীর সঞ্চিত মূলধন থেকে কিছুমাত্র পাবার আশা নেই। ব্যাঙ্কের মাধ্যমে ঋণের সাহায্যে এই নির্মাণ-প্রকল্পের খরচ মেটাতে বাৎসরিক বৃদ্ধির পরিমাণ পরিবার প্রতি (২০×১২) বা ২৭৬ টাকার মত ধরা যেতে পারে।

প্রায় ২৪০০ টাকার ঋণ গ্রহণ করা সম্ভব। কাজে কাজেই ঋণপ্রতি ঋণের পরিমাণ দাঁড়াল ৪৮০ টাকা। পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে, জমির স্বত্ব ক্রয়ের জন্য খেসারতের পরিমাণ ঋণ প্রতি ৭০০ টাকার মত। মাথাপিছু সরকারী খরচের বরাদ্দ হাজার টাকার মত ধরলে প্রতিটি পরিবারের জন্য ২৪০০ টাকার ঋণ গ্রহণ সম্ভবপর হচ্ছে না। এ অবস্থায় সরকারের ভরতুকি ছাড়া বস্তিবাসীর পুনর্বাসন বা আধুনিকীকরণ প্রকল্পের রূপায়ণ সম্ভব হয় না। আর একটি উপায় অবশ্য আছে।

ধনী প্রতিবেশীর দায়

বস্তি অনেক ক্ষেত্রে ধনী পরিবেশের মধ্যে অবস্থিত থাকে বলে বস্তির উন্নয়নপ্রকল্পে কিছু ভূমি ব্যবহার বিধি বস্তিবাসীর পুনর্বাসন ছাড়াও নানাবিধ লাভজনক ব্যবসায় নিয়োজিত করে ধনীর কাছ থেকে অগ্রিম মূলধন সংগ্রহ করা যেতে পারে। এর সাহায্যে ঋণের বোঝা কমালে বস্তিবাসীর পুনর্বাসন প্রকল্পে অর্থনৈতিক সঙ্কট হ্রাস পাবে। আর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অধিবাসীদের উপর পরিবেশ উন্নয়ন-কর বসিয়ে কিছু মূলধন

জোগাড় করাও সম্ভব। ক্ষেত্রবিশেষে এই ছুটি উপায়েরই সাহায্য নেওয়া চলে। যে বস্তুটি সমীক্ষার কথা বলা হয়েছে সেখানে এই ছুটি উপায়ের সাহায্যে বস্তুপুনর্বাসন-প্রকল্পের আর্থিক সফলতাকে অনেকখানি সম্ভব করা গেছে। সব বস্তুর ক্ষেত্রে তা' সম্ভব হবে এরকম দাবী করা চলে না।

নাগরিক সুবিধাদির সীমা

এতক্ষণ আলোচনার পর যে প্রশ্নটি মনে জাগে তা হ'ল এই যে, সম্পদের স্বল্পতাহেতু বস্তু পুনর্বাসন-প্রকল্পে বস্তুবাসীদের নাগরিক সুবিধাগুলি কতদূর দেওয়া যেতে পারে? নাগরিক সুবিধার মধ্যে আছে বাসগৃহের আয়তন, খোলা জায়গার পরিমাণ, রাস্তা, পয়ঃপ্রণালী, বিদ্যায়তন, স্বাস্থ্যকেন্দ্র ইত্যাদি। বিদ্যায়তন বা স্বাস্থ্যকেন্দ্র যে প্রতিটি বস্তুতেই দিতে হবে একথা বলা হচ্ছে না। কেননা এমন হতে পারে যে বস্তুটি যে অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত সেখানে উপযুক্ত বিদ্যায়তন বা স্বাস্থ্যকেন্দ্র রয়েছে এবং তারই সাহায্যে বস্তুবাসীর প্রয়োজন মিটে যায়। বস্তু বড় হ'লে এই ছুটি ব্যবস্থাই বস্তুউন্নয়নপ্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করতে হতে পারে।

আলোচ্য বস্তুটিতে প্রায় ৬০০০ লোক ১২০০ পরিবারে বিভক্ত হয়ে বসবাস করে। প্রায় ৫ বিঘে এলাকা জুড়ে এই বস্তুটি বিস্তৃত। ৬০০০ লোকের মধ্যে প্রায় ২৫০০ ছোট ছেলে মেয়ে। এদের মধ্যে ১৯০০ ছেলেমেয়ে ৫ থেকে ১৪ বৎসর বয়স্ক। সুতরাং বিদ্যার্থীর সংখ্যা মোটামুটি ২০০০ ধরা চলে। এদের জন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় দরকার। কাছাকাছি হাঁটা পথের দূরত্বে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় না থাকায় অন্ততঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়টিকে তৈরী করে না

দিলেই নয়। অন্যান্য বস্তুতে এ ধরনের সমীক্ষা গ্রহণ করলে বোঝা যাবে শিক্ষার সুযোগ কোন পর্যায়ে দিতে হবে। উন্নয়নপ্রকল্পে খরচের সীমা নির্ধারণের দিক থেকে এই তথ্যটির বিশেষ দরকার আছে।

স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরী করার ব্যাপারে নিম্নলিখিত হিসাবটির গুরুত্ব আছে। ১নং তালিকায় পারিবারিক খরচের হিসাব বেঁটে দেখা যাচ্ছে যে, ১২০০ পরিবার মাসে ওষুধপত্রর ও ডাক্তার খরচ বাবদ প্রায় ১১,০০০ টাকা ব্যয় করে। এই খরচের পরিমাণ দেখে অনুমান করা অসম্ভব হবে না যে, একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরী করে দিলে তার পরিচালন ব্যবস্থা আর্থিক সঙ্গতির দিক থেকে লাভজনক হবে। বস্তুবাসীরাও তাতে উপকার হ'বে। অনেক ক্ষেত্রে কেবল বস্তুবাসীর জন্যই একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিচালনা করার খরচ হয়ত দুগুণ হ'তে পারে। তখন বস্তুটি যে অঞ্চলে অবস্থিত সেই আঞ্চলিক প্রয়োজনের ভিত্তিতেই স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি বসাতে হ'বে উপযুক্ত স্থানে। এমন কোন যুক্তি নেই যে বস্তু উন্নয়ন করতে গেলেই স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। এই বিচারের জন্য পারিবারিক আয়-ব্যয়ের সমীক্ষাটি বিশেষভাবে সাহায্য করে।

বাসগৃহের পরিকল্পনায় দৈনিক কর্মসূচীর সমীক্ষা

পূর্বেই বলা হয়েছে যে অধিকাংশ কোলকাতাবাসী পরিবার ১২৫ বর্গফুটের বেশী আয়তনের বাসগৃহ পায়না। বাড়ীর আয়তন ছাড়াও যিনি বাস করবেন তার সুবিধানুযায়ী বাড়ীর ভিতরে বিভিন্ন স্থানের আয়তন স্থানির্দিষ্ট না করে দিলে কেবল বাড়ীটি বড় হলেই সুবিধাজনক হবে তা বলা চলে না।

আলোচ্য বস্তুটিতে বর্তমানে যেভাবে লোকেরা ঘরে ও বাইরে সময় কাটায় তার বিষয় আগে জানা

২৯৭. বস্তু উন্নয়ন পরিকল্পনার কয়েকটি ভাবনার বিবরণ

দরকার। এরজন্ম সমীক্ষার সময় সমীক্ষকদল একটি দৈনিক কর্মসূচীর সাহায্যে কয়েকটি পরিবারের দিবা-রাত্রির নানা কাজে বাড়ীর ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় ব্যবহার-বিধির একটি তালিকা তৈরী করেন। ২নং তালিকায় এর নমুনাটি দেখান হয়েছে। বাড়ীর বিভিন্ন অংশে যথা শোবার ঘর, রান্নার জায়গা, স্নানাগার, বা কলতলা, বারাণ্ডা, উঠোন, সংলগ্ন খোলা জায়গা প্রভৃতি স্থানে পরিবারের লোকেরা কখন কতজন মিলে থাকে তালিকাটিতে তাই দেখান হ'ল। তলায় সাম্প্রতিক চিহ্নের অর্থ ও ঐ সাম্প্রতিক চিহ্নের সাহায্যে পরিবারটির গঠনতন্ত্র বোঝান হয়েছে।

এই পরিবারটি একটি যৌথ পরিবার। পরিবারের কর্তা 'ক'-বাবু ৬৫ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ বিপন্নীক। তাঁর বড়ছেলে 'খ'-বাবু (৪০ বৎসর) কোথাও চাকরী করেন এবং বিবাহিত; একটি ছেলে আছে 'গ'। সে স্কুল-ফাইনাল পাশ করেছে। সকালে সে ঘণ্টাছয়কের জন্ম টুইশানি করতে যায়। 'ক'-বাবুর বিধবা মেয়ে তার মেয়েকে নিয়ে বাপের বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছেন। রাত্রে কে কোথায় কীভাবে শোয় তা' তালিকায় দেখান হয়েছে। 'খ'-বাবু ও তাঁর স্ত্রী শোবার ঘরে বাস্কে শুয়ে রাত্রি কাটান। তাঁর বিধবা বোন ও ভাগ্নী রাত্রে শোবার ঘরেই খাটে শুয়ে ঘুমান। বারাণ্ডায় বৃদ্ধ কর্তা তাঁর নাতিকে নিয়ে রাতের শয্যা পাতেন। বেলা সাতটা নাগাদ সকালের জলখাবার খেয়ে 'খ'-বাবু কাজে বেড়িয়ে যান। 'ক'-বাবুও এই সময় সাধারণতঃ বাইরে বেড়িয়ে বেলা ১১টার আগে ফেরেননা। 'খ'-বাবুর ছেলে সকাল ৯টা নাগাদ বারাণ্ডায় মার কাছে বসে একটু জলযোগ ক'রে টুইশানি করতে বেড়িয়ে যায়। নাতিরা সাধারণতঃ ভিতরের উঠোনেই খেলা করে। মাঝে মাঝে তার মা ও মামী এসে যোগ দেয়।

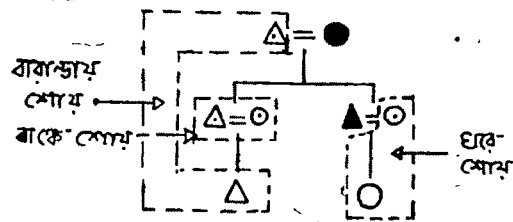
ছপুর ১টা নাগাদ 'খ'-বাবু ছাড়া বাড়ীর আর সকলে বারাণ্ডায় খাওয়া-দাওয়া করে। দ্বিপ্রাহ্নিক নিদ্রা শেষ করার পর 'ক'-বাবু বেলা ৪টা থেকে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত বাইরে সংলগ্ন খোলা জায়গায় সময় কাটান। 'খ'-বাবু সন্ধ্যা সাতটায় বাড়ী ফিরে বিশ্রামের পর বাবার সঙ্গে বাইরের খোলা জায়গায় বসে গল্পগুজব করেন। রাত আটটা থেকে প্রায় দশটা পর্যন্ত নাতি ও নাতিরা একসাথে শোবার ঘরে বসেই পড়াশুনা করে। রাত্রি দশটায় বাড়ীর সকলে বারাণ্ডায় বসে খাওয়া দাওয়া শেষ করে। রাত্রি এগারটায় সবাই শয্যা নেন।

এই পরিবারের লোকদের অবস্থান-সূচী থেকে দেখা যায় যে, এরা বারাণ্ডায় ও বাইরে খোলা জায়গায় বেশী সময় কাটায়। বারাণ্ডা থেকে ভিতরের উঠোনে খেলায়রত বালিকাটির উপর নজর রাখাও সহজ। রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার সময় জনাছয়ক লোক বারাণ্ডায় সমবেত হয়। ভিতরের উঠোন ও বাইরের সংলগ্ন খোলা জায়গা নানা কাজে ব্যবহৃত হয়। বিশেষ করে গরমের সময় এই জায়গা ছাড়া আরামের জায়গা এদের কাছে আর কিছুই থাকে না। শোবার ঘরে বাড়ীর মেয়েরা ও দম্পতি ছাড়া আর কেউ বড় বিশেষ ঘুমান না।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভাল যে, অল্প কয়েকটি পরিবারের মেয়েদের ছপুরবেলায় বারাণ্ডায় এবং ভিতরের উঠোনে নানা কাজকর্ম—যথা ঠোঙ্গা, বাস্কে, খেলনা তৈরী করতে দেখা গেছে। এদের কাছে বারাণ্ডা ও উঠোনের মত খোলা জায়গার প্রয়োজনীয়তা আরও বেশী। ঘরের মধ্যে বাস্কে প্রভৃতি সংসারের মূল্যবান সামগ্রী রাখাটাই অস্বাভাবিক বিশেষ প্রয়োজন।

একটি পরিবারের দৈনিক অবস্থান প্রদর্শনী।

অবস্থান	সং																			
	পূর্ব							অপরাহ্ন							বাস্তি					
	৫:০০	৬:০০	৭:০০	৮:০০	৯:০০	১০:০০	১১:০০	১২:০০	১:০০	২:০০	৩:০০	৪:০০	৫:০০	৬:০০	৭:০০	৮:০০	৯:০০	১০:০০	১১:০০	১২:০০
শোকার ঘর	০০ △	০		△						০০ ০	০০ ০	০△			০ △	০△	০△			০△ ০০
বাগ-৩ কুণ্ডল-৩	০△		০০ △△	০ ০	০ △	০	০০	০ ০	০০ ০△	△ △	△ △	০	△	০০	০ ০	০০	০ ০	০০ △△	০০ △△	△ △
শোকার		△ △																		
কনকনা দুয়ানার		০০ △																		
ড্রিং আরম			০	০	০	০ ০						০	০০ ০	০						
বাহির আরম					০		০	০				△	△		△ △	△△	△ △			
বাহির আরম	△			△△	△△	△△ △	△△ △	△ △△	△	△	△	△	△	△△ △						



- △ : পূর্ববঙ্গ (পুঃ)
- : " (দ্বিঃ)
- △ : অঙ্গুরণ (পুঃ)
- : " (দ্বিঃ)
- ▲ : মৃত (পুঃ)
- : মৃত (দ্বিঃ)

পারিবারিক গঠন।

(ঘোষণা ২৬ এপ্রিল ১৯৫৬ সালের মোকদ্দম প্রাপ্ত)

২ মং চিত্র

তাই যদি সত্য হয় তবে পুনর্বাসন প্রকল্পে কোন কোন পরিবারকে যদি দোতলা বা তিনতলায় নিয়ে বসান হয় তবে তাদের জন্ম এই খোলা জায়গা, উঠোন এবং বারান্দা বাবদ কিছু জায়গা তৈরী করে ক্ষতিপূরণ হিসাবে দেওয়া দরকার। মনে রাখতে হবে যে বহুতল-বিশিষ্ট বাড়ীর উপরতলার বাসিন্দাদের জন্ম ক্ষতিপূরণের জায়গা দেওয়া ব্যয়সাধ্য। অস্থায়ী একতলা বাড়ীতে সবাইয়ের পুনর্বাসন করতে গেলে ছাড়া-জমির পরিমাণ কমে যাবে আর রাস্তাঘাটেরও পয়ঃপ্রণালীর

খরচাদিও বেড়ে যাবে। এই দুটি দিক বিবেচনা করে পুনর্বাসন প্রকল্প তৈরী করা উচিত। আর তা' করতে গেলে পূর্বোক্ত সমীক্ষা ব্যতীত পরিবার পিছু গৃহের সম্পূর্ণ আয়তন ও বিভিন্ন অংশের প্রয়োজনীয় আয়তন ঠিক করার ব্যাপারে ভুল হতে পারে। ভুলের ফলে যদি প্রতি পরিবারের গৃহনির্মাণ খরচ অল্প পরিমাণেও বেড়ে যায় তাহলে অসংখ্য বস্তিবাসী পরিবারের বস্তি-পুনর্বাসন প্রকল্পে অনর্থক খরচের তার অনেক বেড়ে যাবে। এটা উচিত নয়।

আশা কর্তব্য কী ?

বিশ্বব্যাঙ্কের একটি সমীক্ষায় বস্তিবাসী পরিবারের গৃহের সংস্কার ও পারিপার্শ্বিক ব্যবস্থাদির উন্নতির সাহায্যে ছত্রবস্ত্রের আশু সমাধানের সুপারিশ করা হয়েছে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে বস্তিপুনর্বাসন প্রকল্পে খরচের টাকা সংগ্রহ করা সহজসাধ্য নয়। সুতরাং মাথাপিছু অল্প খরচে যাতে অধিকসংখ্যক বস্তিবাসীর পরিবেশ উন্নীত হয় তার জন্য অর্থ বিনিয়োগ করার যুক্তি খুবই জোরালো। এছাড়া শহরাঞ্চলে বস্তিবাসীর পাকা বাড়ী তৈরীর জন্য “স্পেশিফিকেশন” সহজ করা দরকার। প্রযুক্তিবিদরা সকলে মিলে এ কাজটুকু করে দিলে অপেক্ষাকৃত অল্পখরচে বহুলোকের পক্ষে তুলনায় সুন্দর জীবনযাপন করা সম্ভব। স্বল্পমেয়াদী প্রকল্প তৈরীর এই প্রয়োগিক লক্ষ্য অনেক দিক থেকে বিবেচনা করলে যুক্তিসংগত মনে হয়।

আত্মনির্ভরশীলতা

আমরা এতক্ষণ ধরে সরকারী উদ্যোগে বস্তিউন্নয়ন-প্রকল্প গ্রহণের কথা আলোচনা করছি। সরকারী উদ্যম বলতে অপরের চেষ্টাকেই বোঝায়। সরকারের টাকা বাইরের থেকে আসে; আমরা ও প্রযুক্তিবিদ সবাই বস্তিবাসীর কাছে বাইরের লোক। এইসব বহিরাগত সাহায্য যেমন দরকারী তেমনই প্রয়োজন কিছু আত্মনির্ভর হ’তে শেখা। কারণ আত্মনির্ভর-শীলতা কেড়ে নিয়ে তাকে প্রতিষ্ঠিত করা যায়না। এই আত্মনির্ভরশীলতা যদি বহিরাগত সাহায্যের সঙ্গে না মেলে তবে সে সাহায্যে মজল আসে না। বস্তিবাসী হয়ত তার বিস্তার সাহায্যে প্রকল্প কপায়ণে অক্ষম, কিন্তু শ্রমের বিনিময়ে সে তার শ্রীবৃদ্ধি ঘটালে মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় না। এসম্বন্ধে শ্রী সূচিত মিত্রের লেখা

“Brick Banks for West Bengal (A A Thesis, U K) আমাদের গোঁথে পড়ল।

এই থিসিসে শ্রীমিত্র বলেছেন যে, কর্মক্ষম নিম্নবিত্ত লোকেরা—স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই—অবসর সময় ইট-খোলায় শ্রমদান করতে পারে। অর্থের বিনিময়ে এদের শ্রমদানের মজুরির পরিমাণ ইটের সংখ্যায় নির্ণয় করে সার্টিফিকেট দেওয়া যেতে পারে। ব্রিক-ব্যাঙ্কের সাহায্যে এই সব সার্টিফিকেট প্রয়োজনমত ভাঙ্গিয়ে বস্তিবাসীর নির্মাণপ্রকল্পে শ্রমের বিনিময়ে বিনামূল্যে হাজার হাজার ইট পাবে বিভিন্ন ইটখোলা থেকে। ব্রিকব্যাঙ্কের প্রশাসনিক ব্যবস্থা অবশ্য সরকারী উদ্যোগে চলবে। এইভাবে মেঝের টালি তৈরীর কারখানায় বিনা পারিশ্রমিকে শ্রমদান করে সার্টিফিকেট সংগ্রহ করা যেতে পারে আর সেগুলি কাশ করে দরকারের সময় মেঝে তৈরীর টালি সংগ্রহ করা যায়। এই ব্যবস্থায় গৃহনির্মাণ প্রকল্প তৈরী হলে যারা সেখানে বসবাস করবে তারা শ্রমের মর্যাদায় ও আত্মনির্ভর-শীলতায় নিজেদের গৌরবান্বিত মনে করবে।

উপসংহার

বস্তিউন্নয়ন প্রকল্প মানবিকতাবোধের প্রয়োজন বলার অপেক্ষা রাখে না। পরিকল্পনাবিদ, অর্থ-নীতিবিদ, প্রযুক্তিবিদ, সরকারী লোকজন সকলেই ভিন্ন ভিন্ন স্তরে নিজেদের জ্ঞান ও কর্মকুশলতাকে এই মানবিকতাবোধে অবীভূত করে না নিলে এঁদের সাহায্যে প্রকল্পকপায়ণ নিয়মমাফিক হয়ত হতে পারে কিন্তু গ্রহণযোগ্য হবে কি না সন্দেহ। যাদের জন্য বাসগৃহ তাদের জীবনযাত্রা ও মূল্যবোধ সম্বন্ধে যোগ্য অনুসন্ধিৎসার অভাবে পরিকল্পনাবিদের চিন্তাধারা জীবনীশক্তি হারিয়ে ব্লু-প্রিন্টের সাগরেই নির্বাণলাভ করে। এতে আশ্চর্য্য হবার কারণ দেখিনা। এই অনুসন্ধিৎসা চরিতার্থ করতে গিয়ে কী কী সমীক্ষা করা যায় তার বেশ কিছু আলোচনা বর্তমান প্রবন্ধে করা হল। আশা করব, ভবিষ্যতে আরও সার্থক-ভাবে পরিকল্পনা রূপায়িত করার জন্য এই জাতীয় উন্নততর ও ব্যাপক সমীক্ষা গ্রহণ করা হবে।

এ কথা বললে বেশী বলা হবেনা যে আমাদের রাজ্যের অর্ধ-নৈতিক পুনর্জাগরণ বিদ্যুতের যোগানের উপর নির্ভরশীল। পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বণ্টনের প্রধানতম সংস্থা হিসাবে রাজ্যের প্রয়োজন সম্পর্কে আমরা সর্বদাই সচেতন। বর্তমানে আমাদের উৎপাদন কেন্দ্রগুলিতে ৬৬২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হচ্ছে। ভবিষ্যতের লক্ষ্যপূরণে আমরা আরও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। একদিন যা ছিল কেবল স্বপ্ন আজ দিনের পর দিন তাকে বাস্তবায়িত হতে দেখছি দিকে দিকে।

এ পর্যন্ত আমরা ৯,৯০৯টি মৌজার (১০,৪৪৭টি গ্রাম) বিদ্যুৎ পৌঁছে দিয়েছি। এছাড়া গত ৪ বছরে ২৩০০০ সার্কিট কিলোমিটারেরও বেশী বিদ্যুৎ সম্প্রসারণ ও পরিবহন লাইন পাতা হয়েছে, ফলে সুদূর গ্রামেও বিদ্যুৎ পৌঁছে গেছে। কৃষিক্ষেত্রে সাফল্যের স্বত্বাধীন আরো উল্লেখজনক। ১৯৭৬ সালের মার্চ পর্যন্ত ২১৪৫ টি গভীর নলকূপ, ৬৯৫২ টি অগভীর নলকূপ এবং ৬৮৯ টি রিতার ড্রিকট পাম্প বিদ্যুৎ চালিত করার ফলে অতিরিক্ত ৫০ লক্ষ হেক্টর জমি সেচের আওতাধীন এসেছে।

দু বছরের মধ্যে সাঁওতালভিহিত দুটি ১২০ মেগাওয়াট ইউনিট চালু করা হয়েছে, ফলে এখানে উৎপন্ন বিদ্যুৎ কলকাতার আশে-পাশের শিল্প এলাকার চাহিদা মেটানোর সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম বাঙালার বিদ্যুৎ চাহিদাও মেটাবে। আমাদের সম্প্রসারণ কার্যসূচী এগিয়েই চলবে। সাঁওতালভিহির ৩য় ও ৪র্থ ইউনিট স্থাপনের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। কোলাহাটের ৩×২০০ মেগাওয়াট ইউনিট ও ব্যাভেল তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রে একটি ২০০ মেগাওয়াট ইউনিট স্থাপন করে সেই

কেন্দ্রের সম্প্রসারণের কাজও একই রকম দ্রুতগতিতে চলেছে। সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত ট্রান্সমিশন লাইন পাতার কাজও চলেছে।

উত্তরবঙ্গে আমরা এখন নতুন জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরির কাজে ব্যস্ত। এদের মধ্যে আছে ২ মেগাওয়াটের রিটেনটন এবং ৮ মেগাওয়াটের জলচাকার ২য় পর্যায়ের কাজ। ৫০ মেগাওয়াটের রামশ্যাম জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের প্রাথমিক কাজ চলেছে। নতুন ডিজেল জেনারেটর সেটগুলি বসানোর কাজও এগিয়ে চলেছে।

১৯৭৬-৭৭ সালে আমাদের পরিকল্পনা ও কার্যসূচী বাবদ ৬৯.৭২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। আমরা চেষ্টা করছি আরো বেশী টাকা সংগ্রহের জন্য।

আরো বেশী বিদ্যুৎ যোগান দিতে আমরা প্রতিনিয়তই সচেষ্ট—বলতে গেলে এটাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য, আর অতিরিক্ত বিদ্যুৎ মানেইতো দেশের হৃদয় সার্বিক উন্নতি।



বিদ্যুৎ উৎপাদনের
লক্ষ্য পূরণে

পশ্চিমবঙ্গ
রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ

প্রগতির চারিকাঠি বিদ্যুৎ



ফে রো মো ন

শচীন্দ্রনাথ বসু

জায়গাটা প্রায় মরুভূমি, তাঁবুর ভিতরে সন্ধ্যা বেলা একমনে কাজ করে চলেছে ডঃ টমাস ফিলিপ। সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে দিনের তাপ অনেকটা কমে গিয়েছে, নিথর নীরব প্রকৃতি—শুধু মাঝে মাঝে মরু প্রাণীদের ডাক হঠাৎ বাতাস চমকে দিয়ে আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। এই সব পাখি, জন্তু ও পোকাকরই খোঁজে এসেছে ফিলিপ এবং তার সঙ্গী ডঃ জেরাল্ড ক্রস। ঘরে বিভিন্ন খাঁচায় ইঁদুর, সাপ, গিরগিটি ইত্যাদি কিছু কিছু বন্দী হয়ে আছে, কয়েক দিনের মধ্যে তারা আকাশ পথে পাড়ি দেবে উত্তর দিকে, বড় শহরের গবেষণাগারে তাদের উপর নানা রকম পরীক্ষা চলবে। এরই মধ্যে কেউ কেউ প্রাণ হারিয়েছে বিজ্ঞানীর ছুরির নীচে; ফিলিপ এখন তাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থেকে প্লাইড তৈরি করছে। এ ছাড়া তার টেবিলে মরু অঞ্চলের গাছ গাছড়াও কিছু আছে, অধিকাংশই বিভিন্ন জাতের ক্যাকটাস।

মাইক্রোটোম যন্ত্রে সে সেক্সন কাটছে, এই ফালিগুলি এক মিলিমিটারের তিন শো ভাগের এক ভাগ মাত্র পুরু; এক একটি খণ্ড লম্বা কাঁচের পাতে রেখে ছোট্ট এক কোঁটা রং অল্প গরমে সে তা রাঙাচ্ছে, তার পর বাড়তি রং ধুয়ে ফেলে অণুবীক্ষণের তলায়

পরীক্ষা করছে। প্রতিটি পাতের গায়ে আঁটা কাগজের তকমায় তার পরিচয় লিখছে, এমনি একের পর এক তৈরি হচ্ছে প্লাইড।

প্রায় ছ বছর আগে যুক্তরাষ্ট্রের এই দক্ষিণ সীমান্ত অঞ্চলে পরীক্ষার জন্য মাটির নীচে আগ্নেয় বোমা ফাটানো হয়েছিল। বিস্ফোরণে যে তেজস্ক্রিয়ার সৃষ্টি হয় ক্রমে তা বিচ্ছুরিত হয়েছে, এখন আর তার মাত্রা মানুষের পক্ষে ক্ষতিকর নয়। সেটা প্রমাণিত হওয়ার পর কলামবিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এই দুই জীব-বিজ্ঞানী এসেছে—উদ্দেশ্য তেজস্ক্রিয়ার ফলে প্রাণীদের মধ্যে কি কি পরিবর্তন ঘটেছে তার অনুসন্ধান। দিন রাত্রির অনেকটা সময় এদের কার্টে জীব জন্তু উদ্ভিদের খোঁজে, সে কাজে দুই তিনটি স্থানীয় লোককে এরা বহাল করেছে; তারা জাতে মেকসিকান, মাতৃভাষা স্পেনীয়, ইংরেজি বলে বিদেশী টানে, কিন্তু শিকার চিনতে ও ধরতে ওস্তাদ।

ফিলিপের বয়স পঁয়ত্রিশ, ধীরে ধীরে গুছিয়ে কাজ করে, এই রকম নিরিবিলিতে একাগ্র মনে কাজ করতে ভাল লাগে তার, বিশেষ করে সন্ধ্যার পরে। সময়ের কোনও খেয়াল ছিল না, হঠাৎ কি এক রাতের পাখির ডাকে চমকে ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখে আঁটটা বাজে—

ডিনারের সময় পেরিয়ে গিয়েছে। কিন্তু ক্রস আর ডিয়েগো এখনও ফিরল না কেন? বোধহয় একটু দূরে চলে গিয়েছে শিকারের খোঁজে, হয়তো কোনও চতুর প্রাণী বারে বারে ফাঁদ এড়িয়ে যাচ্ছে। ফিলিপ আবার কাছে মন দিল।

কিন্তু মিনিট কয়েক পরেই এক অদ্ভুত চিৎকারে সে আবার চমকে উঠল—চিৎকার তো নয়, যেন এক প্রলম্বিত আতর্নাদ, মারাত্মক বিপদে সাহায্য প্রার্থনা। শব্দটা যেন এসেছে খুবই কাছের থেকে, তাই সে এতটা অঁৎকে উঠেছে, কিন্তু একটু পরেই তার মনে পড়ল মরু অঞ্চলের খোলা হালকা বাতাস এ রকমই প্রতারণা করে থাকে, দূরকে কাছে এনে দেয়। তাড়া-তাড়ি বাইরে এল সে—পরিস্কার উজ্জ্বল আকাশ ভরে ঝকঝকে তারার মেলা, পশ্চিম দিগন্তে শুধু শুধু পক্ষের এক ফালি চাঁদ; রাত্রি খুব অন্ধকার নয়, কোনও দিকে দৃষ্টির পথে গাছ বা ঘর বাড়ির বাধা নেই, কিন্তু কিছুই চোখে পড়ল না। এখানে প্রকৃতি নীরস নির্দয়, মাটি রুক্ষ, তবু খোলা আকাশের নীচে তারার আলো আর ফিকে জ্যোৎস্না শাস্ত স্তব্ধ পৃথিবীর এক অপরাপ মূর্তি খুলে দিয়েছে। এর মধ্যে অজানা আতঙ্ক কি থাকতে পারে?

কিন্তু এই আতর্নাদ কাল্পনিক নয়, বেশ কিছু ক্ষণ টেনে টেনে তা যেন হতাশায় মিলিয়ে গিয়েছিল। মনে হচ্ছে তা যেন তার সঙ্গী জেরির গলা। তাঁবুর অদূরে দাঁড়িয়ে ছিল স্টেশন ওআগন, ফিলিপ তাতে চড়ে বড় আলো জ্বালল, তার পর আস্তে আস্তে গাড়ি ঘুরিয়ে তা চার দিকে ফেলল; কিন্তু চোখে বাইনকুলার লাগিয়েও কিছু দেখতে পেল না, শুধু কানে এল ছ একটা অদৃশ্য ছোট জন্তুর পলায়নের খশ খশ আওয়াজ। অবশেষে ঘর থেকে পিস্তল এনে সে গাড়ি চালিয়ে দিল

যে দিক থেকে চিৎকার এসেছিল সেই দিক আন্দাজ করে।

ফিরে এল ঘন্টা দুই পরে কোথাও কিছু না পেয়ে। একটু আশা ছিল যে ঘরে দেখতে পাবে অভিযাত্রীদের, কিন্তু শূন্য তাঁবু। প্রায় বিন্দ্র রাত্রি কাটিয়ে পর দিন প্রথর সূর্যালোকে সে ব্যর্থ অনুসন্ধান করলে দিকে দিকে অনেক দূর পর্যন্ত। তার পর আর একটা রাত কাটিয়ে ভোর বেলা মাল পত্র গাড়িতে তুলে রওনা হল উত্তর মুখে। সামনে তার নির্জন হাইওও পথ বাদামী কাপড়ের গায়ে চকচকে কালো ফিতের মত টানা।

এক দিনে এই মরু দেশকে সে সত্যিই ভালবেসেছিল, এখন বিরস প্রত্যাবর্তনের পথে আভাসে মনে হল আসলে এই প্রকৃতির প্রকৃত পরিচয় সে পায় নি; চোখের দৃষ্টিতে মনে হয় এখানে কিছুই নেই, কিন্তু তলে তলে আছে কত গুঢ় অজানা শক্তি—মানুষের সঙ্গে তাদের যোগ নেই, আছে বিরোধ। তাই তীব্র গতিতে তার গাড়ি ছুটে চলেছে টানা জনশূন্য পথে।



অবিশ্রাম চলে যখন সে নিউ মেকসিকোর রাজধানী সান্টা ফে শহরে পৌঁছাল তখন খিদের পেট চন চন করছে, হাত পায়ের গিট প্রায় অসাড়। প্রথমেই সে কলামবিয়ায় নিজের ল্যাবরেটরিতে ফোন করলে, হুঃসংবাদ জানাবার পর প্রায় মিনিট পনের আলোচনা চলল কর্তাদের সঙ্গে। খবরটা অবশ্য তাদের কাছেও সম্পূর্ণ অকল্পনীয়। যুক্তরাষ্ট্র সরকারের অমুরোধে এই গবেষণার তত্ত্বাবধান করছিল জাতীয় বিজ্ঞান পরিষদ, তারা কাজের ভার দিয়েছে কলামবিয়াকে। ফিলিপ সেখানে ফিরে যাওয়ার পর পরিষদের

বিশেষজ্ঞদের নিয়ে তিন দিন ধরে আলোচনা চলল। শেষ পর্যন্ত দাঁড়াল দুটি সম্ভাবনা—ডঃ ক্রস ও ডিয়েগো কোন হিংস্র জন্তুর আক্রমণে হত বা আহত হয়েছে, হয়তো সাপের কামড়ে, এবং ভাল করে খুঁজে দেখলে তাদের দেহাবশেষ নিশ্চয় পাওয়া যাবে। বিকল্প মত অনুসারে তারা বন্দী হয়েছে কোনও অসভ্য সম্প্রদায়ের হাতে, এরা তাদের লুকিয়ে রেখেছে গুপ্ত ঘাঁটিতে, হয়তো এরা ক্যানিবাঁল বা মানুষ-খেকো। এই সম্ভাবনার উল্লেখ করলেন নৃতত্ত্বের অধ্যাপক জেমস রাইলি, বললেন এই ধরনের জল্পনাকে রোমানটিক কল্পনা-বিলাস বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না, দক্ষিণ আমেরিকার কোনও যাযাবর জাতি ঐ অঞ্চলে হয়তো ঘুরে বেড়ায়, তারা অভিযাত্রীদের গ্রেপ্তার করে থাকতে পারে।

যাই হক, এ বিষয়ে সকলেই একমত যে সবচেয়ে আগে একটি অনুসন্ধানী দল পাঠানো দরকার তাদের খুঁজতে। দিন যত যাবে তত কমবে সাফল্যের সম্ভাবনা, বাড়বে প্রাণ সংশয়। আট জনকে নিয়ে দলটি তৈরি হল, তার মধ্যে অবশ্য আছে ফিলিপ, সে ছাড়া অধ্যাপক রাইলি একমাত্র বিজ্ঞানী। বাকিদের মধ্যে আছে দেশরক্ষা বিভাগ, সরকারী প্রশাসন দপ্তর ইত্যাদির লোক।

এ বার আয়োজন আরও ব্যাপক। সঙ্গে থাকল দুখানি কটেক্স বানাবার উপকরণ, হালকা ধাতুর অংশ জুড়ে জুড়ে বেশ প্রশস্ত বাসা তৈরি হল, ভিতরে দৈনন্দিন সুখ-স্বচ্ছন্দ্যের যাবতীয় ব্যবস্থা। এবং সবচেয়ে জরুরী বস্তু—ছোট খাটো যুদ্ধ চালাবার আধুনিকতম যন্ত্র। অনুসন্ধানের সুবিধার জন্তু থাকল একটি হেলিকপটার। রাতারাতি ওআশিংটনের সঙ্গে টেলিফোনের যোগসূত্র বসে গেল।

ফিলিপের নির্দিষ্ট দিক লক্ষ্য করে পর দিন প্রত্যুষে অনুসন্ধানীরা বেরিয়ে পড়ল গাড়ি আর হেলিকপটারে চড়ে, দিনের তাপ অতিরিক্ত বাড়বার আগে ফিরে এল কিছু না পেয়ে। সন্ধ্যায় আবার অভিযান—নিখোঁজ ব্যক্তিরা হারিয়েছে রাত্রি বেলা, আততায়ী যেই হক হয়তো তারা অন্ধকারের জীব। কিন্তু এ বারও তারা শুধু হাতে ফিরল। ডিনার খেতে খেতে চলল আলোচনা, ঠিক হল পরের দিন সব দিকেই ভাগাভাগি করে খোঁজা হবে।

দ্বিতীয় দিনও ক্রস ও ডিয়েগোর কোনও চিহ্ন পাওয়া গেল না। পাথুরে জমিতে অবশ্য পায়ের ছাপ আশা করা যায় না। হিংস্র পশু বা অসভ্য জাতি হানা দিয়ে থাকলেও তারা কোন চিহ্ন রেখে যায় নি। অনুসন্ধানের পরিধি ক্রমে দশ মাইল দূর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে—নিখোঁজ ব্যক্তিরা পায়ের ছাপে হেঁটে বেরিয়েছিল, এর বেশী দূর যায় নি ধরে নেওয়া যেতে পারে।

তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় আলোচনা পরাজয়ের বার্থতার ভারাক্রান্ত। এত আয়োজন, এত সাজ সরঞ্জাম অবিলম্বে সফল হবে, ক্রস বা ডিয়েগো জীবিত না থাকলেও তাদের দেহ—অস্তুত কোন চিহ্ন—পাওয়া যাবে এই ছিল সাধারণ প্রত্যাশা। এখন কেউ আর নতুন কিছু বলবার পাচ্ছে না। যেন মজল গ্রহের মানুষ এসে হঠাৎ দু জনকে ছেঁা মেরে তুলে নিয়ে গিয়েছে—কিন্তু তা হলেও তো তাদের মহাকাশ-রথের কিছু নজির থাকত! অধ্যাপক রাইলি একমনে পাইপ টানছেন; এই লম্বা চওড়া মানুষটি কথা কম বলেন, পাইপ মুখে নিয়ে ভাবতেই যেন ভালবাসেন, যদিও কিছু বলবার সময়ে প্রায়ই তাঁর একটি চোখ হাসে, অগ্নিটি থাকে নির্বিকার। হঠাৎ

তিনি কপাল থেকে বালি রঙের অবাধ্য চুল সরিয়ে বললেন, “সব দেখে শুনে আমার এই প্রত্যয়ই দৃঢ়তর হচ্ছে যে জেরি ও ডিয়েগো কোনও অসম্ভাব্য জাতির হাতে পড়েছে। আমরা আছি নিউ মেকসিকোতে, অদূরে মেকসিকো রাজ্য, মনে হয় সেখান থেকেই এরা এই জনবিরল অঞ্চলে হানা দেয়—কি উদ্দেশ্যে কে জানে?”

ফিলিপ বললে, “কিন্তু তেমন কোনও জাতির খবর তো আমাদের জানা নেই।”

“তা নেই,” বললেন অধ্যাপক রাইলি, “ভাগ্য সহায় হলে হয়তো আমরাই এদের আবিষ্কার করব। ফিলিপিন্সের জংলী পাহাড়ে টেসডাই জাতির অস্তিত্ব এই সেদিন পর্যন্ত জানা ছিল না। তারা চাষ বাস জানে না, এখনও আছে পুরাপ্রস্তর যুগে, অবশ্য নিতান্তই শাস্তিপ্রিয়। মেকসিকোর দক্ষিণে গুয়াটিমালা, হনডিউরাস ইত্যাদি দেশে, এমন কি মেকসিকোতেও রেড ইনডিয়ান রক্তের অজ্ঞাত বহু জাতি যে নেই এ কথা কে বলতে পারে?”

“হয়তো এরা নরভুক ক্যানিবালা,” বললে সেক্রেটারি ডেভিড রুবিনষ্টাইন।

“অধ্যাপক শুধু মুছ হেসে কয়েক চুমুক পাইপ শুষলেন, তার পর বললেন, “হয়তো এরা বন্দীদের দাস বানিয়েছে, অথবা দেবতা ভেবে পূজো করছে, অথবা অদ্ভুত বস্ত্র-হিসাবে ‘যাহুঘরে’ রেখেছে। অসম্ভাব্য সমাজে এ সবেরই নজির আছে।”

কাপটেন জুলিও অ্যান্ট্রিয়া দলের সবচেয়ে বয়ঃকনিষ্ঠ। এই অভিযান তার কাছে যুদ্ধের চেয়ে বড় অ্যাডভেনচার। ডিটেকটিভ উপগ্রাস ও ‘রহস্য রোমাঞ্চ’ গল্প তার নেশা। জ্বাল-বসানো জানলার কাছে দাঁড়িয়ে বস্তাদের আলোচনা শুনছে সে, সন্ধ্যাটা

বড় গুমোট, এক এক বার ইচ্ছা হচ্ছিল বাইরে একটু ঘুরে আসে। কিন্তু সূর্যাস্তের পর একলা বার হওয়া একেবারেই নিবিদ্ধ, দলের লোক আবার বেপাতা হয়ে যায় এটা কেউ চায় না। ডেভিড ও অধ্যাপকের মস্তব্য ঘোরাঘুরি করছে তার মনে, তবু তারই মধ্যে এক দুঃসাহসিক মন্তব্য উকি দিচ্ছে, সেটা হল স্বেচ্ছায় ক্রস ও ডিয়েগোর ভাগ্য বরণ করা, অজ্ঞাত শত্রুর হাতে ধরা দেওয়া। তাতে হয়তো এই শত্রুকে চেনা যাবে, হয়তো জব্দ করাও যাবে। বর্তমান অবস্থায় এ ছাড়া আর কোনও গতি সে দেখছে না।

কিছুটা অলস ভাবে টেবিল থেকে টর্চ তুলে নিয়ে সে বাইরে আলো ফেললে। আলোর মুখে দেখা দিল পরিচিত শুষ্ক পাথুরে জমি, কোথাও একটু ঝোপঝাড়ও নেই। হঠাৎ হাতটা স্থির হয়ে গেল—মনে হল মাটির উপর সারি সারি কি যেন চক চক করে উঠল, আবার মিলিয়ে গেল। না, বালি নয়—গাঢ় বাদামী রং, তার মধ্যে কালো, অনেকটা কুঁচের মত আয়তন, সেই রকমই দেখতে। ভাইনে বাঁয়ে আলো ফেলে দেখলে একই জিনিস, দিনের বেলায় এ রকম কিছু চোখে পড়েছে বলে মনে পড়ে না। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি মিলিয়ে যাচ্ছে যে ভাল করে বুঝবার উপায় নেই। মিনিট খানেক আলো নিভিয়ে হঠাৎ সে জ্বাললে আবার—সারি সারি কুঁচ দেখা দিয়ে দেখতে দেখতে মিলিয়ে গেল। এক এক বার যেন মনে হল আলো পড়তেই ছ এক জায়গা অল্প অল্প নড়ে উঠল।

ঘাড় ফিরিয়ে ভিতরের দিকে তাকাল সে। অধ্যাপকের মাথা হেলানো, চোখ বন্ধ, কিন্তু পাইপ থেকে অল্প অল্প ধোঁয়া বার হচ্ছে থেকে থেকে—যেন শার্লক হোমস রহস্য ভেদ করছেন। ফিলিপ নিবিষ্ট

চিত্তে বৈজ্ঞানিক পত্রিকা পড়ছে। অচরা দূরের কোণে টিভি খুলে বসেছে, কেউ সচিত্র সাপ্তাহিকের পাতা ওলটাচ্ছে, সকলের পাশে বিয়ারের টিন খোলা। সবার চোখ এড়িয়ে আস্তে আস্তে দরজাটি খুলে সে বেরিয়ে গেল। ঘরের তুলনায় বাইরেটা ঠাণ্ডা, যদিও বাতাস নেই। কিন্তু ছু পা এগিয়েই সে চিংকার করতে করতে ফিরে এল। ঘরের সবাই চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে দেখলে তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে জুলিও এক পায়ে লাফাচ্ছে আর কাতরোক্তি করছে, “আনাকে কিসে কামড়েছে।”

যে কামড়েছে সে তখনও ছাড়ে নি; সাপ বা কাঁকড়া বিছে নয়, ডান পায়ের গোড়ালির পাশটা আঁকড়ে আছে প্রায় তিনি ইঞ্চি লম্বা কি একটা যেন। সকলে নিচু হয়ে দেখলে প্রায় পিঁপড়ের মত—কিন্তু পিঁপড়ে কি করে এত প্রকাণ্ড হবে! জুলিও তখনও যন্ত্রণায় ছটফট করছে, মিলিটারি ডাক্তার অ্যালান হেইগ তাড়াতাড়ি তাকে চেয়ারে বসিয়ে টেবিলে পাঁটা তুলে দিলেন আলোর নীচে। দেখা গেল আক্রামকের দেহটা এত গাঢ় লাল যে প্রায় কালোই বলা চলে, ডিম্বাকার পেট জড়িয়ে ঘনকৃষ্ণ গোল গোল তিনটি দাগ; কুঁচের মত চোখে স্থির হিংস্র দৃষ্টি। দেহের অল্পপাতে মাথাটা প্রকাণ্ড, তার ছ পাশে দুই কঠিন চকচকে দাঁড়ার মুখগুলি মোটা মোজার মধ্যে ঢুকে গিয়েছে। যেন কাঁকড়ার দাঁড়ার ছোট সংস্করণ।

তাড়াতাড়ি তাঁর যন্ত্রপাতির বাস্স খুলে একটা লম্বা চিমটে দিয়ে ডঃ হেইগ পোকাটার সরু কোমর ধরে টান দিলেন, কিন্তু দংশন শিথিল হল না, শুধু দাঁড়ার কাছাকাছি লম্বা দুটি শুঙ্গ (antenna) কঁপে উঠল। প্রায় গোল চোখে স্থির দৃষ্টি অব্যাহত রইল, সে চোখগুলিতে অতি সূক্ষ্ম জাল কাটা।

অবশেষে ডঃ হেইগ চিমটে তুলে ধরলেন, দেখা গেল শুধু মুণ্ডহীন ষড়টি, ছিন্ন মস্তক তখনও মরণ কামড় ছাড়ে নি। এ দিকে দেখতে দেখতে জায়গাটা ফুলে উঠেছে। জুলিওর জুতো মোজা খুলে চামড়া কেটে দাঁড়া দুটি বার করা হল, অবশ্য আগেই গভীর ক্ষতে রক্তাক্ত মাংস উন্মোচিত হয়েছে, তার চার পাশটা বিধে লাল।

চিকিৎসক যা করবার করলেন, জুলিও বিছানায় শুয়ে তখন বললে নিজের কাহিনী। জানলার বাইরে সারিবদ্ধ কুঁচের মত কি দেখেছিল, আলো পড়লে কেমন তা মিলিয়ে গিয়েছিল, আর তারই অনুসন্ধান সে বাইরে গিয়েছিল। বৃহত্তর উদ্দেশ্য যে ছিল অজানা শত্রুর হাতে ধরা দেওয়া তা অবশ্য সে বললে না।

দেখতে দেখতে জানলাগুলির কাছে ভীড় জমে গেল, গোটা কয়েক টর্চের আলো পড়ল বাইরে। সকলেই দেখলে জুলিও যা দেখেছিল। ফিলিপের বিজ্ঞানী মনে প্রশ্ন, কেন ওগুলি মিলিয়ে যাচ্ছে, এই মাটিতে কি আছে এমন কোনও বস্তু যা ফসফরাসের মত অন্ধকারে জ্বলে, আলো পড়লে রাসায়নিক পরিবর্তনের ফলে যার অনুপ্রভা নিভে যায়? জোনাকির মত কোনও রকম প্রাণীও হতে পারে—জুলিও তো বলছে নড়তে দেখেছে...

হঠাৎ তার চিন্তাসূত্র ছিঁড়ে গেল, আলোর মুখে ফুটে উঠল অসংখ্য উড়ন্ত বস্তু, সঙ্গে সঙ্গে ভেঁ ভেঁ আওয়াজ, যেন এরোপ্লেন তেড়ে আসছে। তার পর দেখতে দেখতে শিলারূপির মত শব্দ—মনে হল দেয়ালে ও জানলার জালে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে পঙ্কপালের স্রোত। সবাই আচমকা ছু পা পিছিয়ে এল, ভয়-মিশ্রিত বিস্মিত উজ্জ্বলিত ঘর ভরে গেল। দলের নেতা কর্নেল টেট গলা চড়িয়ে বললেন, “উদ্ভেজনার কারণ

নেই, মরু দেশের কোনও পতঙ্গ সম্ভবত আলোর আকর্ষণে ভিতরে ঢুকতে চেষ্টা করছে। আলো কমিয়ে দাও। তা ছাড়া, ওরা তো ঢুকবার কোনও পথ পাবে না।”

তার কারণ এই যে উষ্ণ দেশের পোকা মাকড়ের সংস্পর্শ এড়াবার উপযুক্ত করেই ঘরগুলি তৈরি, দেয়ালে কোথাও ফাঁক নেই, জানলা দরজায় সূক্ষ্ম জাল। বাস্তবিকই আক্রমণ যেমন হঠাৎ শুরু হয়েছিল তেমনি হঠাৎ থেমে গেল, এক পশলা খেয়ালী রুটির মত। এত উত্তেজনার মধ্যে ডঃ হেইগ কিন্তু অগ্র কাছে ব্যস্ত, পোকাটির বিচ্ছিন্ন ছই খণ্ড আলোর কাছে ধরে ভাল করে পরীক্ষা করছেন, অবিলম্বে অধ্যাপক রাইলি ও ফিলিপ তাঁর সঙ্গে জুটলেন। মোটা লেন্সের নীচে নেড়ে চেড়ে দেখলেন তাঁরা।

দাঁড়ার আগা থেকে দেহের শেষ পর্যন্ত মাপ দাঁড়াল সাড়ে তিন ইঞ্চি। কাটা গলার কাছে এক বিন্দু ফিকে সবুজ রক্ত জমে আছে। গায়ে বড় বড় ঘন কালো লোম। খাড়ার মত দাঁড়া ছটির ভিতর দিকে তিনটি করে গৌজ বা খোঁটা উঠে আছে, কঁকড়ার যেমন থাকে—তাতে মানুষের রক্তের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। দাঁড়ার নীচে ছই চণ্ডা চোয়ালের মাঝখানে মুখগহ্বর। তার ছ পাশে লম্বা ছটি শুঙ্গ, তাদের মাঝে মাঝে আঙুলের মত গিঁট।

ডঃ হেইগ বললেন, “দেখতে তো পিপড়েরই মত, কিন্তু এত বড়? সম্ভবত এত বড় পোকাই কখনও দেখেছি বলে মনে পড়ে না। ফিলিপ, তুমি তো জীববিজ্ঞানী, তোমার কি মত?”

“খাঁটি অভিমত দিতে পারবেন কীটবিশেষজ্ঞরা। তবে এটুকু জানি যে ভারতের পতঙ্গ অ্যাটলাস মথ কোনও কোনও পাখির চেয়েও বড়, পাখার প্রাপ্ত

থেকে প্রাপ্ত এক ফুট চণ্ডা। তা ছাড়া, পুরা কালে আঙ্গারিক যুগে ড্রাগনফ্লাই জাতের দানব ফড়িং মেগানিউরা পাখা ছড়াত ত্রিশ ইঞ্চি, দেহ ছিল পনের ইঞ্চি লম্বা। এমন কি তেলাপোকাও ছিল চার ইঞ্চি মাপের।”

পর দিন সকালে প্রাতরাশের আগেই সকলে বেরিয়ে এল বাইরেটা পর্যবেক্ষণ করতে। জুলিওও এল খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে, যদিও তার পা তখনও ফুলে আছে। খুঁজতে খুঁজতে ছটি পতঙ্গ পাওয়া গেল, দরজার জাল কামড়ে আছে তারা। পরীক্ষায় দেখা গেল জুলিও যার কামড় খেয়েছিল এরাই সেই জন্তু, কিন্তু এদের পিঠের উপর গোটানো ছ জোড়া পাখা। আরও আশ্চর্য, দাঁড়াগুলির থেকে ছ ফোটা ঘন পদার্থ গড়িয়ে নামতে নামতে জমে গিয়েছে, তার রং প্রায় কালো। ডঃ হেইগ বললেন, “ওটা নিশ্চয় ওদের বিষ এবং বোধহয় বিষ বয়ে ওরা মরে গিয়েছে।” তবু সাবধানের মার নেই—দূর থেকে খুঁচিয়ে দেখা গেল দেহগুলি অনড়; এত আড়ষ্ট যে সংগ্রহ করতে শেষ পর্যন্ত তাদেরও ধড় মুড়ো আলাদা হয়ে গেল। বোঝা গেল এরা ঝাঁকে ঝাঁকে আক্রমণ চালিয়েছিল, অবরুদ্ধদের নাগাল না পেয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে গিয়েছে; শুধু এই ছটি নিজেদের মরণ কামড়ের ফাঁদে বন্দী হয়েছে।



সেই সকালেই তিনটি নমুনা বাস্কে ভরে পাঠানো হল জাতীয় বিজ্ঞান পরিষদে, সেখানে থেকে তা গেল উইস্কন্সিনে প্রবীণ কীটবিজ্ঞানী ক্র্যাংক ডেনিসের পরীক্ষাগারে। অতঃপর কি কর্তব্য? অধ্যাপক রাইলি মনে করিয়ে দিলেন যে এই অপ্রত্যাশিত আক্রমণ যতই চাঞ্চল্যকর হক, আসলে তারা এসেছে

হারানো মানুষ দুটিকে খুঁজে বার করতে, পোকা মাকড়ের চর্চা তাদের কাজ নয়। সন্ধানের কাজে প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান, বিলম্বে বিপদ বাড়বে। তবে সাবধানে চলতে হবে, আবার ঐ দস্যু পোকাকার কামড় খেতে কেউ রাজী নয়। কোথায় ওরা ফিরে গিয়েছে কে জানে, তবে অদৃশ্য ঘাঁটি থেকে আবার তেড়ে আসতে পারে। হাঁটু পর্যন্ত চামড়ার জুতো পরে, মুখ হাত যথাসম্ভব ঢেকে বাইরে যেতে হবে।

কিন্তু সারা দিনে ওদের আর কোনও চিহ্ন পাওয়া গেল না, হয়তো নিশাচর, অন্ধকার হলে আবার ঘরের চার দিক ঘিরে পাহারা বসাবে, হয়তো নতুন ফন্দি অনুযায়ী আবার আক্রমণ করবে। এখন বুঝতে বাকি নেই যে টর্চের আলোতে ওরা অদৃশ্য হয়েছিল পাথর, শুড়ি ইত্যাদির আড়ালে লুকিয়ে। সেই উদ্দেশ্যে নিজেরাই হয়তো সেগুলি সাজিয়েছে ঘরের বাইরে।

এর মধ্যে অধ্যাপক ডেনিস টেলিফোন করলেন, অনেক ক্ষণ ধরে কথা বার্তা হল। তাঁর গলার স্বর বেশ উত্তেজিত। ফিলিপ জিজ্ঞাসা করলে পোকাটা কি জাতের, উত্তরে তিনি বললেন, “আমি সন্ধ্যায় তোমাদের ওখানে পৌঁছাচ্ছি, তখন সব বলব। ইতিমধ্যে তোমরা যথাসম্ভব এড়িয়ে চলো ওদের, দূরে দূরে থেকে।”

এই বার্তা পেয়ে সে দিনের মত খোঁজাখুঁজি বন্ধ হয়ে গেল, সাগ্রহ অপেক্ষায় কাটল দিন, অধ্যাপক ডেনিস কি বলবেন সেই কৌতূহলের সঙ্গে ঈষৎ ভয়ও মেশানো সকলের মনে। তিনি এলেন ডিনারের সময়ে হেলিকপ্টারে করে। মাঝামাঝি বয়সের পাতলা মানুষ, হাত পা চোখ সব উৎসাহে চঞ্চল। ঠোঁটে ঝুলছে সিগারেট। সঙ্গে এল সেক্রেটারি জ্যানেট

নাভার। এই তরুণীকে ছাড়া তিনি কোথাও যান না, কেন তা পরে বোঝা গেল।

অবিলম্বে সকলে খাবার টেবিলে জড়ো হল। অধ্যাপক বললেন, “খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে, আগে তাকে শান্ত করে তার পর অন্য কথা।” এক চামচ কচ্ছপের সুপ গিলে বললেন, “আঃ, এই মরু দেশে এমন জিনিস পাব কে জানত।” তার পর অন্যদের নীরব প্রশ্নবোধক দৃষ্টি লক্ষ্য করে তিনি শুরু করলেন, “আপনারা যা পাঠিয়েছেন সেটা দেখতে যা আসলে তাই। কিন্তু পিঁপড়ের এমন কোনও প্রজাতি পৃথিবীতে আছে তা আমি জানতাম না, এ কথা স্বীকার করতে আমার লজ্জা নেই, যদিও পিঁপড়ে ও উইয়ের চর্চায় আমার জীবন কেটে গেল। আর তাই সাত তাড়াতাড়ি ছুটে এসেছি—জ্যাস্ত জন্তটিকে স্বচক্ষে দেখব বলে।”

সকলের মনের প্রশ্নটি উচ্চারণ করল ডেভিড, “কিন্তু সাড়ে তিন ইঞ্চি লম্বা পিঁপড়ে?”

অধ্যাপক একটু হাসলেন, তার পর সুপের থালাটা সরিয়ে দিয়ে চেয়ারে হেলান দিলেন। জ্যানেট তাড়া-তাড়ি তার থলের থেকে ছোট্ট এক টেপ রেকর্ডার বার করে কাছাকাছি রাখল।

অধ্যাপক বলতে লাগলেন, “এই বিচিত্র বিশ্বে যত রকম প্রাণী আছে তার তালিকা এখনও অসম্পূর্ণ। উদ্ভিদ শ্রেণী বাদ দিলে জন্ত জগতের বৃহত্তম গোষ্ঠী কীট পতঙ্গ, তাদের পাঁচ লক্ষ প্রজাতি আছে, তার মধ্যে শুধু পিঁপড়েরই প্রায় তিন হাজার। এই নির্জন মরু অঞ্চলে এ যাবৎ বিশেষ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান হয় নি, সুতরাং নতুন প্রজাতির আবিষ্কার আশ্চর্য নয়; তাদের হিংস্র ব্যবহারও আশ্চর্য নয়—যতটুকু আমরা

জানি তার থেকে। তবে স্বীকার করছি আপনার পাঠানো নমুনার দানবীয় আয়তন দেখে আমি একটু অবাক হয়েছি। কারণ আমাদের বৃহত্তম পিঁপড়েকে এরা অনায়াসে হার মানায়। আমেরিকারই ছুতোর-পিঁপড়ে আধ ইঞ্চির বেশী লম্বা হতে পারে, এরা কাঠের বাড়ি ঘর কুরে কুরে নিজেদের বাসা বানায় বলে ঐ নাম। প্রায় সমান বড় অস্ট্রেলিয়ার সবুজ পিঁপড়ে। এরা গাছে বাস করে আর অব্যাহত আগন্তুকদের কামড়ায়। স্থানীয় আদিবাসীরা এদের পূজা করে দেবতুল্য এক মহাপিপীলিকার বংশধর বলে, বিশ্বাস করে এদের ষাঁটালে এরা নরভুক দানবের রূপ নিয়ে পৃথিবী ধ্বংস করবে। আমাদের এই ক্যাম্পেরই অদূরে পানামা দেশে বাস করে এক হিংস্র মাংসাশী পিঁপড়ে, তারা এক ইঞ্চি লম্বা।”

বোধহয় মনে পড়ল খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, এক খণ্ড স্টেকের মাংস মুখে ভরে হাসতে হাসতে বললেন অধ্যাপক, “কিন্তু আদি কার্লের দানবদের তুলনায় এরা কিছুই নয়, পিঁপড়ে পুরাণে আরও তাজ্জব কত গল্প আছে। প্রায় ছ হাজার বছর আগে প্লিনি বিশ্বাস করতেন যে ভারতের উত্তরাঞ্চলে পাহাড় থেকে সোনা সংগ্রহ করত মিশরী নেকড়ের মত বিশাল পিঁপড়ের দল। এটা বোধহয় হেরোডোটাস বর্ণিত গল্পের প্রতি-ধ্বনি, তাঁর প্রসিদ্ধ ইতিহাসে তিনি লিখে গেছেন ভারতের মরুবাসী এক পিঁপড়ের কথা, তারা শেয়ালের চেয়েও বড়; মানুষরা সেখানে আসত উটের পিঠে চড়ে সোনাযুক্ত বালির লোভে, তখন এই পিঁপড়ের দল তাদের এমন ভাড়া করত যে কিছু উট তাদের মুখে ছেড়ে দিয়ে পালাতে হত। হেরোডোটাস যেমন ‘ইতিহাসের জনক’, তেমনি অনেকে তাঁকে ‘মিথ্যার জনক’ আখ্যাও দিয়েছে, যদিও অনেক ক্ষেত্রে তিনি

শুধু কিংবদন্তী বর্ণনা করে বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন ছেড়ে দিয়েছেন পাঠকের হাতে।”

চীস ও বিসকুট দিয়ে ডিনার শেষ হল, জ্যান্টে গরম কফি রাখল সবাই সামনে। তাতে চুমুক দিয়ে অধ্যাপক বললেন, “ও সব রূপকথা উড়িয়ে দিলেও মানতে হবে যে জীবন-সংগ্রামে কীট পতঙ্গ কতগুলি স্বাভাবিক সুবিধার অধিকারী যার জোরে এই ক্ষুদ্র প্রাণীরা অগ্নদের উপর টেকা দিচ্ছে। বড় বা উন্নত জন্তুদের মত তাদের শরীরে হাড়গোড় নেই, কঙ্কাল বা কঠিন কাঠামোটি দেহের বাইরে, স্তূতরাং তারা খুব বাড়তে পারে না। কিন্তু তা পুষিয়ে নিয়েছে তাদের প্রগলভ জননশক্তি ও দ্রুত বংশবৃদ্ধি, যদিও অধিকাংশ সম্ভানই মারা পড়ে পাখি, সরীসৃপ, ব্যাঙ ইত্যাদি শত্রুর মুখে। তা ছাড়া এদের আছে আশ্চর্য সহজ-প্রবৃত্তি এবং আত্মরক্ষা ও আক্রমণের বিচিত্র শক্তি যার কিছুটা আশ্বাদ পেয়েছে আমাদের তরুণ সঙ্গী জুলিও। তাই তারা টিকে আছে আজ পর্যন্ত। কোটি বছর ধরে পৃথিবীর সর্বত্র, উদ্ভিদের পর তারাই প্রথম স্থলের প্রাণী। ...থাক, ও সব কথা পরে হবে, এ বার চলুন দেখি বাইরে ওদের জলজলে চোখের সারি।”

খাবার টেবিল ছেড়ে সকলে আবার জানলার কাছে এল। কিন্তু টার্চের আলোতে অনেক ক্ষণ চার দিকে খোঁজাখুঁজি করেও কিছু দেখা গেল না। এক জন মন্তব্য করলে, “ওরা কি হার স্বীকার করে অথবা মানুষের সান্নিধ্য এড়াতে দূরে কোথাও পালিয়ে গেল!”

“সহজে পালাবার মত জ্ঞাত এটা নয়,” সিগারেট জ্বালতে জ্বালতে বললেন অধ্যাপক ডেনিস, “হয়তো মাটির নীচে লুকিয়ে আছে, হয়তো সেই কারণেই দিনের বেলায় এত খোঁজাখুঁজি করেও আপনারা ওদের চিহ্ন পান নি। যাক, আজ রাতের মত আর কিছু করবার

নেই। আশুন, আরাম করে বসে আড্ডা জমানো যাক।”

সকলে গোল হয়ে বসল অধ্যাপককে ঘিরে, জ্যানেট তার রেকডারে নতুন ফিতে পরাল। অধ্যাপক ডেনিস বললেন, “পিপড়েদের আত্মগোপন কিছু কঠিন নয়। কোনও কোনও জাত মাটি, শুকনো পাতা ইত্যাদি দিয়ে এক একটি বিশাল প্রাসাদ গড়ে তোলে—বিস্তৃত মানুষ এগুলিকে মহানগর আখ্যা দিয়েছে; প্রায় দশ ফুট ব্যাস তিন ফুট উঁচু এই টিবির উপর দিকের প্রণালী বা স্তূপে গ্রীষ্ম-বাসের স্থান, শীতে নীচের উষ্ণতর অলিগলি বেশী উপযুক্ত। দক্ষিণ আমেরিকার এক পিপড়ে পাঁচ ছ ফুট উঁচু এমনি ‘সাতমহলা’ প্রাসাদ বানায়। কিন্তু যারা ভূগর্ভে বাস করে চোখের আড়ালে, তাদের ঠিকানা পাওয়া কঠিন। সেখানে দীর্ঘ প্রশস্ত স্তূপ, তার আশেপাশে স্থানে স্থানে আরও বড় বড় কক্ষ। তথাকথিত কৃষি পিপড়ের প্রবেশ পথ কখনও কখনও ষোল ফুট নেমে গিয়ে যুক্ত হয় তিন ফুট লম্বা এক এক ফুট উঁচু ও চওড়া ঘরের সঙ্গে। কেউ কেউ দরজায় পাহারা বসায়। আবার এমন যাযাবর গোষ্ঠীও আছে যাদের কোনও স্থায়ী বাসা নেই।

“পিপড়ের জীবনযাত্রার রীতি ও কর্মক্ষমতা বিস্ময়কর। আমাদের ছোটবেলায় অধ্যবসায় শেখাতে পিপড়ে মৌমাছি এ সবেৰ উদাহরণ দেওয়া হয়—পিপড়েরা কেমন বুনা বিচি এবং অগ্ন্যস্ত্র খাওয়া কুড়িয়ে এনে মজুদ করে ছুঁদিনের জন্ত, এই সব গল্প। বাইবেলে আছে রাজা সোলোমনের প্রবাদ যাক্য, কুঁড়েদের তিরস্কার করে বলা হয়েছে পিপড়ের কাছে শিক্ষা নিতে। কিন্তু এই খুঁদে প্রাণী এমন সব ছত্রাক কাজও অতি সহজে উদ্ধার করে যা আমরা আর শুধু

মানুষের সমাজেই জানি—অথচ এই সব সম্পন্ন করছে স্বাভাবিক অঙ্কপ্রবৃত্তি, বুদ্ধিতে ওরা মানুষ কেন ইঁচুরের চেয়েও অনেক খাটো; ঐ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মগজে বুদ্ধি আর কতটুকু খেলবে—যদিও এক একটি কীর্তি দেখে বিশ্বাস হতে চায় না যে এর মধ্যে বুদ্ধির খেলা নেই।”

সকলে নীরব আগ্রহে শুনছে, তাদের প্রশ্নও কৌতূহল মুখে মুখে স্পষ্ট প্রতিকলিত। অধ্যাপক এত ক্ষণে হাতের সিগারেট ঠোঁটে গুঁজলেন, সেটার মাথায় বেশ খানিকটা ছাই জমেছে। শ্রোতাদের দৃষ্টি সে দিকে, জ্যানেট নিঃশব্দে ছাইদানটা এগিয়ে দিল। অধ্যাপক সেটার দিকে নজর না দিয়ে সিগারেট নামালেন মুখ থেকে, ছাইয়ের মাথা আর একটু ঝুলেও আটকে রইল। অবশেষে তিনি আবার শুরু করলেন পিপড়ে কাহিনী, তখন সকলের চোখ নিবিষ্ট হল তাঁর মুখের দিকে।

“পুরা কালে মানুষ প্রথম খাদ্য সংগ্রহ করেছে ফল মূল কুড়িয়ে এনে, তার পর তারা চায় বাস শিখল। তেমনি সংগ্রাহক পিপড়ের ছাড়িয়ে গিয়েছে কৃষিরা; তবে খান বা গম নয়, এরা গজায় আগ্নেয়গিরিক উদ্ভিদ ছত্রাক—বর্ষায় জুতোর উপর যে ছাতা গজায় সেই ধরনের জিনিস। গাছকে গাছ উঁজাড় করে এরা পাতা নিয়ে আসে, সেগুলিকে চিবিয়ে লাল দিয়ে ভিজিয়ে বানায় চাষের জমি, নিজেদের মল হয় সার, তাতে বপন করে এক বিশেষ ছত্রাকের বীজ যা এদের বাসায় ছাড়া আর কোথাও পাবে না; অগ্ন্যস্ত্র ছত্রাকের ‘আগাছা’ও এরা সরিয়ে ফেলে। অল্প দিনের মধ্যে এই সূক্ষ্ম সাদা ছত্রাকের আঁশ আর তার মধ্যে অসংখ্য গোল গোল আগ্নেয়গিরিক গুটিতে জমি ঢেকে যায়—এই হল এদের প্রধান কসল। গাছের পাতার সেলুলোস বস্তু এরা

হজম করতে পারে না, কিন্তু সেই উপাদান থেকেই এ ভাবে হজমযোগ্য খাদ্য বানায়। পিঁপড়ে রানী যখন উড়ে যায় নতুন উপনিবেশ স্থাপন করতে সেও সঙ্গে নেয় এই ছত্রাকের দানা। এই পিঁপড়ে আমেরিকা মহাদেশের উষ্ণ অঞ্চলের অধিবাসী, পাতা-বাহী বাহিনী সারি বেঁধে চলে, পথের বাধা দূর করবার জন্য থাকে পৃথক দল। এই চাষী কীটরা মানুষের চাষ বাস তছনছ করে দেয়, এক রাত্রে কয়েকটি ফলের গাছ নগ্ন করতে পারে—এদের আখ্যা দেওয়া হয়েছে ‘প্রকৃত ব্রেজিল-বিজেতা’।”

সিগারেটের ছাই ধনুকের মত বেঁকে গিয়েছে, কিন্তু ধনুর্ভঙ্গ হওয়ার আগেই অধ্যাপক সে দিকে না তাকিয়েই সবটা ছাইদানে বিসর্জন দিলেন, শ্রোতারা মনে মনে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। অধ্যাপক কি ভেবে এক বার সকলের মুখের উপর চোখ বুলিয়ে গেলেন। তাঁর পরবর্তী ভাষণ শোনাল ক্লাস ঘরে বক্তৃতার মত। “কীটদের বুঝতে হলে কতগুলি প্রাথমিক জিনিস জানা দরকার। তাদের জীবন সংক্ষিপ্ত, কিন্তু তারই মধ্যে চারটি পৃথক অবস্থা। প্রথমে ডিম; তা ফুটে বার হয় লারভা বা শূক, এরা সাংঘাতিক পেটুক, খালি খাবার খুঁজে বেড়ায়। এদের রূপান্তর হয় এক নিশ্চল স্থানু অবস্থায়, তার নাম পিউপা, ল্যাটিন ভাষায় যার অর্থ পুত্তলি, কারণ এরা কাপড়ে মোড়া পুতুলের মত দেখতে; মাছ ধরতে যে ‘পিঁপড়ের ডিম’ ব্যবহার হয় তা আসলে এই পিউপা। কীটের পরিণত ও সুপরিচিত রূপটি নির্গত হয় পিউপার খোলস মুক্ত হয়ে। পিঁপড়ে সমাজে এদের এক দল জন্মেই কাজে লেগে যায়, এদের বলা হয় কর্মী; তেমনি আর এক দলের নাম যোদ্ধা, তারা রক্ষক।

“মানুষের সঙ্গে তুলনা করে আমরা চাষী পিঁপড়ের

কথা বলেছি। চাষ বাসের সমকালে মানুষ পশু পালনও শিখেছিল, পিঁপড়ে জগতে তার বহু আগের থেকেই এই ব্যবস্থা চলছে। এক শ্রেণী পোষে অ্যাফিড নামক ছোট সবুজ মাছি; কেউ আবার রাখে শুয়োপোকা যারা ঐ পিঁপড়ের পিউপা খেয়ে বাঁচে, পক্ষান্তরে পিঁপড়েরা এদের গায়ে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে এক গ্যাণ্ড বা রক্ত থেকে সুস্বাদু রস বার করে—এ যেন গরু দোহানো। অ্যাফিডরাও রস দেয়, তাকে আমরা বলি মধু-শিশির। পিঁপড়ে-মালিকরা এই সব গৃহ-পালিতের জন্য ‘গোয়াল ঘর’ বানায়, যারা পালিয়ে যায় কামড়ে গুঁড়িয়ে তাদের আবার ধরে আনে। দেখা গিয়েছে শুয়োপোকা-পালকরা প্রতি দিন ‘গরু’ চরাতে নিয়ে যাচ্ছে খোঁয়াড়ের বাইরে, কেউ অ্যাফিডের বসিয়ে দেয় উদ্ভিদের নরম অংশে রস শুধবার জন্য, কখনও বা হুড়ঙ্গ খুঁড়ে শিকড়ের কাছে নিয়ে যায়, ‘গরু’ পাহারা দেয়, পিঁপড়ে বুলিয়ে মধু-শিশির দোহন করে তা সঙ্গীদের জন্য ঘরে নিয়ে যায়।”

হঠাৎ এক তীক্ষ্ণ খট খট খট আওয়াজ, মুহূর্তে সকলের মুগ্ধ মনোযোগ টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে গেল, অধ্যাপক ডেনিস কান খাড়া করে বলে উঠলেন, “ও কি?”

“র্যাটলেস্কেসের শব্দ,” বললে ফিলিপ, এবং সঙ্গে সঙ্গে আবার তা শোনা গেল আরও একটু দূর থেকে।

অধ্যাপক রাইলি বললেন, “এই প্রথম শুনলাম এই মারাত্মক সাপের হাড়-নাড়া ডুগডুগির বাজ।”

“রাগ্তিরে মাঝে মাঝে শুনেছি আমরা,” ফিলিপ বললে, “বোধহয় বেরিয়েছে খরগোশ কিংবা ক্যাডার-ইছরের খোঁজে।”

“মরু দেশের সেই নিরশু খেড়ে ইছর,” মন্তব্য করে অধ্যাপক ডেনিস আবার তাঁর পিঁপড়ে জগতে ফিরে

গেলেন। “কৃষি ও পশুপালন শেখার পরে ক্রমে মানুষের সমাজে দেখা দিল ক্ষমতার অধিকারী রাজা এবং পুরোহিত, এবং সেই সঙ্গে দাস শ্রেণী। পিঁপড়ে জগতেও ফরমিকা গণের স্যাংগুইনিয়া নামক প্রজাতি অল্প গোষ্ঠীর পিঁপড়ে ধরে এনে দাস বানায়, কখনও এদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে খাইয়ে দেবার জন্ত, এমন কি মুখে খাবার তুলে দিতে পর্যন্ত। ব্রিটেনের রক্তলাল পিঁপড়ে ফরমিকা স্যাংগুইনিয়া মাঝে মাঝে ফরমিকা ফুস্কা প্রজাতির কর্মীদের উপর হানা দেয় দাস সংগ্রহ করতে, তাদের পিউপা তুলে নিয়ে যায়। আর এক শ্রেণীর দাস-পালকের নাম পলিআর্গাস।

“আবার কখনও পিঁপড়েরা অতিথি পোষণ করে—ঝিঁঝিপোকা, মাছি, গুবরে পোকা, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কীট মাইট ইত্যাদি ঘরের লোকের মত থাকে তাদের বাসায়; পিঁপড়েরা এই অভ্যাগতদের খাওয়ায়, তাদের ডিমের যত্ন করে, যদিও ডিম ফুটে যে শূককীট বার হয় তা হয়তো পিঁপড়ের শূকদের ভোজন করবে। এ ছাড়া অনিমন্ত্রিত ভিন্ জাতের পিঁপড়েও ঘরে ঢোকে, তবে তারা দস্যু, হানা দিয়ে কর্মীদের মারে, বাচ্চাদের খেয়ে ফেলে অথবা আপন ঘরে নিয়ে দাস বানায়। এ রকম ডাকাত ছাড়া চোরও আছে, তারা চোরা সুড়ঙ্গ বানিয়ে বৃহত্তর পিঁপড়ে বাসায় ঢুকে চুরি করে পালায়।

“ক্ষুদ্র মানুষ অল্প বানিয়ে বিশাল হাতি বা তিমি শিকার করতে শিখেছে, শিকারী পিঁপড়ে জানে কৌশল। হাজার গুণ বড় গুবরে পোকাকে সে ঘায়েল করে; প্রথমে ছ এক জন তার পা ধরে ধামাতে চেষ্টা করবে, অন্তরা তখন দৌড়ে আসবে, পা পাখা শুষ্ক ধরে বিপর্যস্ত করবে যত ক্ষণ না মরে, তার পর

এই ভারী খাণ্ড গাছের উপর বাসায় তুলতে কেউ উপর থেকে টানবে কেউ ঠেলবে নীচ থেকে।”

পিপীলিকা কাহিনীর রোমাঞ্চ অধ্যাপক ও তাঁর শ্রোতাদের যেন নেশায় মতিয়েছে। শুধু দম নেওয়ার জন্ত নতুন সিগারেট ধরালেন তিনি, ‘পরম তৃপ্তিতে এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে আবার আরম্ভ করলেন, “সবচেয়ে ভয়ংকর উষ্ণ দেশের সৈনিক বা ডাইভার পিঁপড়ে—এখানে আপনাদের অভিজ্ঞতার থেকে এই জ্ঞাতটার কথাই আমার মনে পড়ছে। যখন কাছাকাছি খাণ্ড ফুরিয়ে যায়, হয়তো কুড়ি লক্ষ পিঁপড়ের স্তম্ভবদ্ধ সাজোয়া বাহিনী এগিয়ে চলে অল্প নতুন ঘর বানাতে, বাহিনীর ভিতর দিকে থাকে কর্মীরা আর ছ পাশে দাঁড়া উচিয়ে যোদ্ধারা। এই যাযাবর দল হয়তো তিন দিন অবিশ্রাম চলে এক মাইল পথ অতিক্রম করবে, যা মানুষের ১২৫ মাইলের সঙ্গে তুলনীয়। এদের অভিযানের খবর পেলে গ্রামবাসীরা ঘর ছেড়ে পালিয়ে যায়, ফিরে এসে দেখে তাদের ঘরের কীট পতঙ্গ, মাকড়সা, বিছে, কাঁকড়া বিছে, টিকটিকি ইত্যাদির চিহ্ন মাত্র নেই। বৃহত্তর সরীসৃপকেও এরা গ্রাস করে, বিশেষত যখন তারা এক পেট খেয়ে নিশ্চল। বিজয়ী সেনার মত এই বাহিনী জঙ্গলের মধ্য দিয়ে তেড়ে চলে, পথে যা কিছু ছুটে বা উড়ে পালাতে না পারে তাই এদের পেটে যায়।”

অধ্যাপক থামলেন। জ্যান্টে তাড়াতাড়ি এক বার দেখে নিল তার যন্ত্রের ফিতে কতটা বাকি আছে। শ্রোতার নির্বাক, অধ্যাপক রাইলির মাথা নিচু, বাদামী চুলের গোছা কপালে এসে পড়েছে, চোখ বন্ধ কি খোলা বোঝা যাচ্ছে না, নিভে-বাওয়া ঠাণ্ডা পাইপ মুখে। অধ্যাপক ডেনিস ধীরে ধীরে সিগারেট শুষছেন। কত রাত কে জানে। বাইরে প্রকৃতি

স্থির, নিঃশব্দ। আকাশ নীল নির্মেষ, বাতাস নির্মল, আধখানা চাঁদের জ্যোৎস্না ঝরে পড়ছে ধ্যানমগ্ন মরু-প্রান্তরে, শহরে পূর্ণিমার আলোও তার তুলনায় ম্লান। কিন্তু ঘরে যারা আছে তাদের স্থান কালের খেয়াল নেই কারও।

কর্নেল টেট মস্তব্য করলেন, “যারা এত রকমে মানুষের সমকক্ষ ভাগ্যিস তারা এত ছোট, নয়তো মানুষকেই হার মানাত নিশ্চয়।”

অধ্যাপক ডেনিস তাঁর সিগারেটের ঝুলন্ত ছাই নিবিষ্ট দৃষ্টিতে পরীক্ষা করতে করতে বললেন, “অথচ এদের ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে বুদ্ধির স্থান সামান্য। কীটের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করে জন্মগত প্রবৃত্তি, তারই সৃষ্টি এদের জীবনের অনড় বিধি নিয়ম, এদের সব কাজ কলাপ তারই কড়া শাসনে বাঁধা। অবশ্য এদের জীবনে বুদ্ধির স্থান একেবারেই নেই কিনা বা থাকলে কতটা আছে এ বিষয়ে বিজ্ঞানীরাও সন্দেহমুক্ত নন। তবে অস্ত্রাস্ত্র সামাজিক কীট মৌমাছি, বোলতা, উই ইত্যাদির তুলনায় পিঁপড়ের বুদ্ধি বেশী, তারা অভি-জ্ঞতার থেকে শেখে, যেমন গোলক ধাঁধার মধ্যে পথ খুঁজে নেওয়া, বাসার দরজায় বসে পাহারা অথবা খাচ্চা সংগ্রহ ইত্যাদি ব্যাপারে; হারানো সঙ্গী ফিরে এলে তারা উত্তেজিত হয়। মানুষ সমাজের সঙ্গে এদের যে মিল তার কিছু কিছু উদাহরণ তো আমরা দেখলাম। পক্ষান্তরে এরা মানুষের মত নতুন অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারে না প্রায়ই, অঙ্গপ্রবৃত্তির মধ্যে সমস্তার কোনও সমাধান খুঁজে পায় না বলে।

“কিন্তু এদের সীমিত জীবনের যাবতীয় কার্যো-দ্ধারের জ্ঞান এই প্রবৃত্তিজাত সংগঠনের চেয়ে উপযুক্ত আর কিছু হতে পারে না। বিভিন্ন শ্রেণীর কাজ ভাগ করা আছে, প্রত্যেকে তা সম্পন্ন করে চলেছে বিনা

বিশ্রামে। আপনারা নিশ্চয় জানেন পিঁপড়ে, মৌমাছি, উই সমাজের কেন্দ্রে আছে রানী, সেই উপনিবেশের পত্তন করে পুরুষের সংযোগে। তাবী রানী তার পাখায় ভর করে উড়তে থাকে দূরে দূরে যত ক্ষণ না যুক্ত হয় উড়ন্ত পুরুষের সঙ্গে—আকৃতিতে সে পত্নীর চেয়ে ছোট। এই জনক পুরুষটি ছাড়া আর সব পিঁপড়েই মূলত স্ত্রী—তাবী রানী নয়তো বক্ষ্য স্ত্রী যারা হয় কর্মী ও গৃহরক্ষী যোদ্ধা। গর্ভ সঞ্চারণের পর মৃত্যু ছাড়া পুরুষের আর কিছু কাজ থাকে না। রানী তখন নিজের পাখা বিসর্জন দিয়ে কোথাও বাসা বানিয়ে ডিম পাড়বার অপেক্ষায় বসে থাকে—কোনও জ্ঞাত হয়তো খসে-পড়া মরা ডালের গায়ে, আবার কেউ বা মাটির নীচে।

“পুত্তলি থেকে মুক্ত হয়েই প্রথম ক্ষুদ্র কর্মীর দল রানীর সেবা যত্নে লেগে যায়। তা ছাড়া ডিমগুলির যেমনটি তাপ দরকার বাসার তেমন অংশে তাদের নিয়ে রাখে, শূকরের খাওয়ায় আধা-পরিপাক করা খাচ্চা, পুত্তলিদের খোলসমুক্ত হতে সাহায্য করে, তার পর গা চেটে পরিষ্কার করে দেয়। এ হল কর্মীদের কাজের আংশিক তালিকা মাত্র। যোদ্ধা রক্ষকদের চেনা যায় তাদের মাথা দেখে, তা কর্মীদের তুলনায় বড়।”

অধ্যাপক রাইলি মুখ থেকে ঠাণ্ডা পাইপ নামিয়ে নড়ে চড়ে বসলেন। হয়তো তাঁর চোখে তন্দ্রা এসেছে কিংবা এই সুদীর্ঘ পিঁপড়ে-পাঁচালির আড়াল থেকে উকিরুকি দিয়ে হারানো মানুষ ছুটি অস্বস্তির সৃষ্টি করছে তার মনে। অধ্যাপক ডেনিস বলে চললেন, “শুধু সামাজিক সংহতি, ঐক্য, সহযোগিতা, কর্মবিভাগ, কর্মকুশলতা, নিরালস্য ইত্যাদির জোরেই যে এই প্রাণী কুল টিকে আছে তা নয়; ক্ষুদ্র বলেই কীটদের বংশ-বৃদ্ধি প্রগলভ, নয়তো শত্রুরা তাদের খেয়ে শেষ করে

দিত, নয়তো প্রাকৃতিক অবস্থা বা খাতাভাবের বিপাকে তারা নির্বংশ হত। এ ছাড়া কীটদের নানা কৌশল ও অস্ত্রও আছে। তাদের কঙ্কাল বা দেহের কঠিন কাঠামোটি বাইরে বলে বর্মের মত কাজ করে; অনেকে পরিপাকের সঙ্গে মিলে গিয়ে শত্রুর চোখ এড়ায়; কেউ বিশ্রী রস কিংবা দুর্গন্ধ ছাড়ে যা শত্রুর অসহ্য। তা ছাড়া আছে আক্রমণের উপায়—বিষাক্ত ছল এবং দংশন। এখানে যে পিঁপড়ের সম্মুখীন হয়েছি আমরা তাঁরা অস্বাভাবিক বড় বলেই আশ্চর্য্যকর এবং আক্রমণে বেশী দড়, সুতরাং এদের সঙ্গে লড়াইয়ে হয়তো অসাধারণ বা জোরদার উপায় না হলে চলবে না। পিঁপড়ে কর্মী ও উর্বর স্ত্রীদের ছলে ফর্মিক এসিড থাকে আমরা জানি, কোনও কোনও সামাজিক কীটের চোয়ালে অগ্নি বিষও থাকে। নিশ্চয়ই এ রকম কিছু জুলিওকে এত কাবু করেছে। বেশ কয়েকটিকে ধরে তাদের ছল ও দংশন রসের রাসায়নিক পরীক্ষা করতে পারলে এ প্রশ্নের মীমাংসা হবে।”

অধ্যাপক এ বার চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন, বললেন, “দূর পথ যাত্রার পর আমি ক্লান্ত, অধ্যাপক রাইলিরও ঘুম পেয়েছে মনে হয়, চলুন শুয়ে পড়া যাক। কাল আমাদের অনেক কাজ।”

সেই রাতে জুলিওর ঘুম পিপীলিকাপূর্ণ স্বপ্নে ভরে গেল; এক বার দেখল কাতারে কাতারে এই শত্রু দল আক্রমণ করেছে তাদের ক্যাম্প—কেউ পদাতিক কেউ বা জঙ্গী বিমান—তার পর ঘোর যুদ্ধ, কর্ণেল টেট তাঁর দল বলকে নির্দেশ দিচ্ছেন কখনও গুলি কখনও বোমা ছুঁড়তে, কিন্তু শত্রু ধাতুর দেয়াল কেটে অনায়াসে প্রবেশ করল, নিমেষে সকলের পাতালুনের ভিতর ঢুকে পা বেয়ে উপরে উঠছে দাঁড়া উত্তত করে... জুলিওর সর্বাঙ্গ শিহরিত হয়ে ঘাম দিয়ে ঘুম ভেঙে গেল।



অধ্যাপক ডেনিসের রাত কাটল গাঢ় নিশ্চিন্ত নিদ্রায়। পর দিন প্রাতরাশের পরে তিনি জানালেন যে অণুবীক্ষণের নীচে এই পিঁপড়ের চেহারাটা দেখতে চান। কুতূহলীরা তাঁর সঙ্গে ল্যাবরেটরিতে এল। অধ্যাপক একটি পিঁপড়ের দেহ বসালেন এক বিশেষ ধরনের অণুবীক্ষণে, তাতে পরীক্ষার বস্তুটির বর্ধিত প্রতিবিম্ব ঘবা কাঁচের পরদায় পড়ে, অনেকে এক সঙ্গে দেখতে পারে। একটু এ দিক ও দিক সরিয়ে অধ্যাপক মাথার অংশ ফোকাস করে বললেন, “কীটদের স্পর্শে প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন, কিন্তু দৃষ্টিশক্তি দুর্বল, কোনও কোনও প্রজাতির কর্মীরা প্রায় অন্ধ, চোখ থাকলেও অন্ধকারে তা অচল, কিন্তু সেই ক্ষতি পুষিয়ে নিয়েছে কীটের এই শুষ্ক ছটির অসাধারণ ক্ষমতা।” কাঁচের গায়ে পেনসিলের মুখ দিয়ে নির্দেশ করে তিনি বলে চললেন, “পিঁপড়ে জাতির এই শুষ্ক জোড়ার চঞ্চলতা আপনারা সবাই লক্ষ্য করেছেন, এগুলি সর্বদা উপরে নীচে ডাইনে বাঁয়ে হাতড়ায়—পথ চলতে দলীয় সঙ্গী মুখো-মুখী পড়লে শুষ্ক দিয়ে ছুঁয়ে তাকে চিনছে, নানা বস্তুর গা, বাতাসের দিক, খাদ্য ইত্যাদি পরীক্ষা করছে। তার পর ধরুন শ্রুতি; কীট পতঙ্গ দেহের অংশ ঘষে নানা রকম শব্দ করতে পারে, কখনও তা এক মাইল দূর থেকে শোনা যায়। পিঁপড়েরাও কখনও কখনও বিশেষ শব্দের সংকেতে দলকে খাদ্যের সন্ধান জানায়, যদিও বিস্তারিত বার্তা পাঠানো চলে না। কিন্তু এই সব ক্ষমতাই ভ্রাণশক্তির তুলনায় সীমিত।

“কোনও কোনও পুং মথ এক মাইলেরও দূরে স্ত্রী মথের গন্ধ পেয়ে সে দিকে ছোট্টে, যদিও এত দূরে এই বার্তা বয়ে আনে হয়তো গন্ধবস্তুর একটি মাত্র অণু। এই ধরনের রাসায়নিক পদার্থকে আমরা বলি ফেরোমোন।

এই দেখুন, শুষ্কের গায়ে এই যে ধাপগুলি বেরিয়ে আছে এগুলি গন্ধবস্তুরে সাড়া দেয়। ফেরোমোনের কাজ হল সহজপ্রবৃত্তিকে জাগিয়ে তোলা। যৌন আবেদন ছাড়াও নানা রকম সংকেত বয়ে আনে বিভিন্ন ফেরোমোন; পূর্ববর্তী সন্ধানীদের বিশেষ বিশেষ জ্ঞান অনুসরণ করে কর্মীরা খাদ্য বস্তুতে গিয়ে পৌঁছায়, পথে যেতে যদি ভিন্ন বংশের পিপড়ে বা শত্রু কীটের সামনে পড়ে তবে চোয়াল বা পেটের গ্ল্যাণ্ড থেকে অম্ল শ্রেণীর ফেরোমোন নিঃসৃত হয়ে বিপদের বার্তা পাঠায়, কাছাকাছি সগোত্র পিপড়ে যারা আছে তারা সব কাজ ফেলে তেড়ে আসে সাহায্য করতে, আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

“ফেরোমোন সম্বন্ধে ব্যাপক গবেষণার শুরু মাত্র ১৯৫০ দশকে, এর মধ্যেই বেশ কয়েকটি রকমারী অণু আবিষ্কার হয়েছে, কতগুলির পরিমাণ এত সামান্য যে রাসায়নিক পরীক্ষায় প্রায় ধরাই যায় না; প্রতিনিয়ত নতুন বস্তুর সন্ধান মিলছে। আমরা যদি বলি কীট নামক যন্ত্রটিকে চালায় গন্ধবস্তুর ইন্ধন, কিংবা স্নায়ুশ্রিত ব্যতীত কীট পতঙ্গের সুনিয়ন্ত্রিত জীবনধারা তখনই হয়ে মারাত্মক পরিণতি ঘটবে তবে অত্যাশ্চর্য হবে না।”

ফিলিপ বললে, “বড় বড় প্রাণী, যথা প্রায় সব রকম স্তন্যপায়ী জন্তুদের মধ্যেও ফেরোমোন কিছুটা কাজ করে থাকে। সম্প্রতি দেখা গিয়েছে স্ত্রী রিসাস বানরের যৌনশ্রিত গন্ধে পুরুষ সংগমে আকৃষ্ট হয়। এমন কি কোনও কোনও বিজ্ঞানী মনে করেন মানুষের আচরণেও হয়তো এই ধরনের দেহগন্ধের প্রভাব আছে।”

অধ্যাপক বললেন, “আমার বন্ধু হার্ভার্ডের টেডি উইলসন বলেন এমনও হতে পারে যে কোনও দূর গ্রহের সভ্যতা গড়ে উঠেছে শুধু জ্ঞান ও স্বাদের বার্তার

উপর নির্ভর করে, সেখানে মুখের কথা একেবারেই নেই।” তার পর তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে, “আচ্ছা, আজ আমার অনেক কাজ—এসে অবধি তো শুধু কথাই বলেছি। এক জন সহকর্মী চাই, আমরা যাচ্ছি পিপড়ে শিকারে। সে কাজটা আমি জানি, আপনারা খোঁজ কখন আমাদের বেপান্তা বন্ধুদের—সেটাই এ অভিযানের প্রাথমিক উদ্দেশ্য তা ভুললে চলবে না।”

এদের অনুসন্ধান যথারীতি চলল, কিন্তু সকলের মন পড়ে থাকল অধ্যাপক ডেনিস কি ধরে আনবেন সেই দিকে। তিনি সঙ্গে এনেছেন নানা রকম সাজ সরঞ্জাম, যথা মাটি ফুটো করে পিপড়ের বাসা আবিষ্কারের এবং তাদের বন্দী করবার যন্ত্র। কিন্তু তিনিও শেষ পর্যন্ত ফিরে এলেন খালি হাতে। অবশ্য অধ্যাপক তখনও হাল ছাড়েন নি, শেষ কোণালটি বাকি আছে; সেই উদ্দেশ্যে পর দিন সকালে তিনি কিছুটা দূরে মাটিতে কতগুলি গভীর গর্ত করলেন, তার পর তার মধ্যে গুঁজে দিলেন বোমার মত বিস্ফোরক; উদ্দেশ্য হল এই পিপড়েরা যদি ভূগর্ভবাসী হয় তবে বিস্ফোরণে তাদের বাসা উদ্ঘাটিত হবে, তারাও বেরিয়ে আসবে।

এই কাজে দিনের প্রথমার্ধ কেটে গেল। বিকালের দিকে দূর থেকে একে একে বোমাগুলি ফাটানো হল, সেই সব জায়গায় কোয়ারার মত উঠল কিছু পাথুরে মাটি। অধ্যাপকের সঙ্গে আর সকলেও গিয়ে পরীক্ষায় যোগ দিল। যারা ভেবেছিল পিপড়ের দল মাটির উপর উঠে তেড়ে আসবে অথবা পালাতে ব্যস্ত হয়ে পড়বে তাদের অনুমান ব্যর্থ হল। তবু অধ্যাপক পুঙ্খানুপুঙ্খ বৈজ্ঞানিক অনুসন্धानে মগ্ন হয়ে পড়লেন—এক গর্ত থেকে আর এক গর্তে যাচ্ছেন, হাতে লেন্স নিয়ে প্রায় মাটির উপর শুয়ে নিবিষ্ট মনে

পরীক্ষা করছেন শালক হোমসের মত, হয়তো খুঁজছেন পিপীলিকার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। মিনিট কুড়ি পরে যাচ্ছেন পরবর্তী গহ্বরের দিকে।

এমন সময়ে এক আতঁনাদে সকলে মুখ তুলে দেখলে এক ভয়ংকর দৃশ্য। প্রায় ছ শো গজ দূরে ছুটি মূর্তি হাত তুলে প্রাণপণে ছুটে আসছে তাদের দিকে। পিছনে অন্তমুখী সূর্য রাস্তায় দিয়েছে মরু প্রান্তর, তাদের মুখ ভাল করে দেখা যাচ্ছে না। কয়েক মুহূর্ত সকলে হতভম্ব হয়ে রইল, তার পর ফিলিপ চিৎকার করে উঠল, “জেরি, ডিয়েগো!” সঙ্গে সঙ্গে সে ছুটল তাদের দিকে, কিন্তু কয়েক পা এগিয়েই হঠাৎ থেমে যেতে হল। সকলের বিহ্বল বিমূঢ় দৃষ্টির সামনে ধোঁয়ার মত কি একটা মাটি ফুঁড়ে উঠে দেখতে দেখতে বিরাট কালো মেঘের আকার ধারণ করল, যেন আলাদিনের দৈত্য, তার পর বোমারু বিমানের মত গর্জন করতে করতে ছুটন্ত মানুষ ছটিকে ঘিরে ফেললে।

বুঝতে দেরি হল না যে পিপড়ের পাল ছেঁকে ধরেছে তাদের, তাদের পাখার ভন ভন আওয়াজে গোধুলির আকাশ ভারাক্রান্ত। আক্রান্ত ব্যক্তিরা প্রাণপণে হাত পা ছুড়ছে আর তারই মধ্যে এগিয়ে আসতে চেষ্টা করছে, ছ এক বার মাটিতে লুটিয়ে পড়ে দাপাদাপি করল। এ দিকে দর্শকরা কি করবে ভেবে পাচ্ছে না—এই আতঁতায়ীর বিরুদ্ধে কোন অস্ত্র খাটবে? অথচ অবিলম্বে ওদের উদ্ধার করা দরকার, ওদের কাতর চিৎকার ও সাহায্য ভিক্ষা অসহ্য। অবশেষে দেখা গেল ক্রস খোঁড়াতে খোঁড়াতে অনেকটা এগিয়ে এসেছে, ডিয়েগো তখনও তার কয়েক পা পিছনে... ক্রসকে ঘিরে-ধরা পতঙ্গের পাল ক্রমশ হালকা হতে হতে ফিরে গেল তার সঙ্গীর দিকে।

অভিযাত্রীরা দৌড়ে গিয়ে ধরল ক্রসকে; তার সারা অঙ্গে গুঁড়ো গুঁড়ো মাটি, অবশ দেহ এলিয়ে পড়ল তাদের হাতে, তা মাটিতে শুইয়ে দিয়ে ডঃ হেইগ বুকে পড়লেন তার উপর।

এ দিকে ডিয়েগোও বেছঁশের মত ধরাশায়ী। মোটা কব্বলের মত পিপড়ের আবরণের নীচে অদৃশ্য দেহটি থেকে থেকে কেঁপে উঠছে। হঠাৎ বেপরোয়া হয়ে কর্নেল টেট ছুটলেন সে দিকে বেল্ট থেকে রিভলভার খুলে; কিন্তু কাছাকাছি যেতেই তাড়া করে এল এক দল শত্রু; যদিও গায়ে বর্ম পরা ছিল, ছ চারটে গুলি ছুড়ে কর্নেল বুঝলেন এই অস্ত্র ওদের বিরুদ্ধে নিষ্ফল। পালিয়ে এলেন তাড়াতাড়ি। ফিলিপের মনে পড়ল ধোঁয়া-বোমারু কথা, তা ছুড়ে মারলে গ্যাসের গন্ধ বা বিষে পোকা পালায়। কিন্তু তা আছে ঘরে, তাড়াতাড়ি সে গাড়িতে চড়ে বসল, ডঃ হেইগও ক্রসকে নিয়ে গাড়িতে উঠলেন, তার সারা গা লাল হয়ে ফুলে উঠেছে, চোখ ছুটি প্রায় বুঁজে এসেছে, অবিলম্বে চিকিৎসা দরকার।

ফিলিপ ধোঁয়া-বোমা নিয়ে ফিরে আসবার আগেই প্রত্যক্ষদর্শীদের চোখের সামনে ডিয়েগোর কাতরোক্তি বন্ধ হয়ে গিয়েছে, দেহ নিশ্চল। পর পর ছুটি বোমা ছোড়ার পর ধোঁয়ার ফাঁকে ফাঁকে দেখা গেল পলাতক ঝাঁক, সকলে ছুটল সে দিকে। পেঁপে দেখলে এক বীভৎস দৃশ্য—দেহ নয়তো কঙ্কাল, শুধু হাড়ের গায়ে ইতস্তত খাবলা খাবলা রক্তাক্ত মাংস লেগে আছে, তার মধ্যে জায়গায় জায়গায় এই নরখাদকরা কিছু কিছু ধোঁয়ার বিষে মরে আটকে আছে। মাত্র মিনিট পনের মধ্য জোয়ান তরুণটির এই পরিণতি।

সমস্তে এই দেহাবশেষ তুলে নিয়ে এল তারা। আধঘণ্টার মধ্যে ক্যাম্পের অদূরে তা সমাধিস্থ হল।

তখন শেষ সিঁড়রে মেঘটুকু অন্ধকারে ঢাকা পড়েছে, চকচকে নীল আকাশে উজ্জ্বল তারার কুচি ছড়ানো, মাথা নিচু করে কবর ঘিরে দাঁড়িয়েছে মানুষগুলি, মনে তাদের নানা নীরব প্রশ্ন, নানা আশঙ্কা। কোথায় লুকিয়ে ছিল এই শত্রুর দল, কোথায়ই বা পালিয়ে গেল? মানুষ ছুটিই বা কোথা থেকে হঠাৎ আবির্ভূত হল। এমন অবস্থায় তো বাইরে বার হওয়াই দায়, ঐ শত্রু তেড়ে এলে কি অস্ত্র দিয়ে লড়বে তারা? একটু আগে চোখের সামনে যে দৃশ্য দেখেছে তা কেউ কোনও দিন ভুলতে পারবে না, ঐ দ্রুত-বাড়ন্ত কালো মেঘ যেন ক্ষুদ্র কীটের ঝাঁক মাত্র নয়, বরং এক উন্নত দানব হঠাৎ বেরিয়ে এসে আকাশ-জোড়া বিশাল মূর্তি ধারণ করল। কিন্তু শেষ কালে কি পিপড়ের ভয়ে ঘরে অবরুদ্ধ হয়ে থাকবে এতগুলি সশস্ত্র মানুষ, অথবা ক্রসকে পাওয়া গিয়েছে বলেই কি সামান্য কীটের কাছে পরাজয় স্বীকার করে তলপি গোটাতে হবে? ফিরে গিয়ে লোকের কাছে মুখ দেখাবে কি করে তারা?

হয়তো ক্রস এই রহস্যের কিছুটা কিনারা করতে পারবে, তার কাহিনী শুনে সকলে উদগ্রীব। সে অবশ্য তখন শয্যাশায়ী, সারা গায়ে মলম মাখিয়ে ইনজেকশন দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সবল, স্বাস্থ্যবান মানুষ সে, ঘণ্টা বারো ঘুমিয়ে পর দিন অনেকটা সুস্থ হল। প্রাতরাশের পর যে গল্প সে বললে কোথায় লাগে তার কাছে দৈত্য দানবের রূপকথা, ঠিক এই অবস্থায় এই পরিমণ্ডলে না হলে কেউ তার এক বর্ণও বিশ্বাস করত না।

“অশ্রু দিনের মত সে দিন বিকালেও আমি বেরিয়েছিলাম ডিয়োগোকে নিয়ে,” সে আরম্ভ করলে, “একটু দূরে একটা জায়গায় কিছু নতুন জাতের ক্যাকটাস সে দেখেছে। কিন্তু যেতে যেতে হঠাৎ

চোখে পড়ল একটি জন্তু যা আমরা তখন পর্যন্ত একটিও পাই নি—ক্যাডার-ইঁহর; এই মরুবাসীরা বড় সমুদ্র প্রাণী, জীবনে এরা জল খায় না, যেটুকু জলের প্রয়োজন তা খাত থেকে সংগ্রহ করে। যাই হক, তাড়া করতে সে লাফিয়ে লাফিয়ে পালাচ্ছে, আমরাও জাল বাগিয়ে ছুটছি—হঠাৎ মাতা বহুদুরা আমাদের টেনে নিল তার গর্ভে; আগে আমি তার পর ডিয়োগো ছড়মুড় করে টুকে পড়লাম এক গহবরে, একটু পরে অন্ধকারের মধ্যে চোখে পড়ল শুধু অসংখ্য জোড়া জোড়া পলকহীন চোখ। এই অবস্থায় মাটির উপর আধশোয়া হয়ে আছি বেশ কিছু ক্ষণ, ব্যাপারটাকে বুঝতে চেষ্টা করছি, হঠাৎ পায়ে এক কামড়, তার পর কল্পইর কাছে। বুঝলাম এই দংশন ঐ চোখের মালিকদের, কিন্তু তারা কি তা তখনও জানি না। লাফিয়ে উঠতে গিয়ে মাথায় লাগল ধাক্কা, সুড়ঙ্গটা সোজা হয়ে দাঁড়াবার মত নয়; একটু বসেছি, সঙ্গে সঙ্গে পিছনে আবার কামড়। অগত্যা প্রায় হামাগুড়ি এগিয়ে চললাম ছ জনে।”

ক্রস একটু থামতেই ফিলিপ বলে উঠল, “তা হলে তোমরা গর্তে পড়বার সময়ে যে চিৎকার করেছিলে সে রাত্রে তাই শুনে আমি চমকে উঠেছিলাম।”

“চিৎকার? কই মনে পড়েছে না তো? তুমি কিছু শুনেছিলে বুঝি? তার পর বোধহয় আমাদের আর পান্তা পাও নি। যাই হক, অবশেষে অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত গোল মতন একটা জায়গায় এসে পৌঁছলাম, এখানে ছাতটাও একটু উঁচু। বোধহয় তাতে সরু সরু ফুটো ছিল, কিছুটা আলো হাওয়া আসছিল, গরমেও খুব কষ্ট হচ্ছিল না। দেখলাম আরও কয়েকটা সুড়ঙ্গ সেখানে এসে মিলেছে, চার দিকে কারা সব [শেষাংশ ৩৪১ পৃষ্ঠায়]

জীবনের আনন্দ

অমদামোহন বাগচী

একটা রুগী দেখে ফিরবার সময়—পথে দাঁড়িয়ে
পাঞ্জির জন্তু অপেক্ষা করছি, হঠাৎ ওদিকের
টপাতে তারাদাসকে দেখতে পেলাম। একটা
ভীর সামনে দাঁড়িয়ে ঘাড় উঁচু করে গেটের মাথায়
ভানো বিখ্যাত এক জ্যোতির্বিজ্ঞাবিশারদের সাইন
বোর্ডটা পড়বার চেষ্টা করছে। রাস্তা পার হয়ে ওর
পছনে দাঁড়িয়ে পিঠে হাত রাখতেই তারাদাস চমকে
ঠে ঘাড় ফেরালো। তারপর আমাকে দেখে
হাসিত কণ্ঠে বলে উঠল : আরে, ডাক্তার যে!
তদিন পরে দেখা হল-বলুতো ?

: প্রায় এক যুগ।

: অত না হলেও—প্রায় কাছাকাছি।
কলকাতাতেই প্র্যাকটিশ করছিস—তা জানি। কিন্তু
তদিন যে দেখা সাক্ষাৎ হয়নি।

: হবে কী করে? থাকিস তো বাঙলার
হাটের। সেই পাটনা মুলুকে।

: এখন আর থাকি না ভাই। মাস তিনেক
ল—অনেক চেষ্টা চরিত্র করে কলকাতায় বদলি
য়ে এসেছি।

: ভাল করেছিস। বাসা করেছিস কোথায়?

: শ্রামবাজারের ওদিকে। ছুথানা ঘর-আর

ভাঙ্গ ৬৩—১০

একচিলুতে টালির রান্নাঘর। ঘর না বলে তাকে
বারান্দা বলাই ভাল। আর—কমোন ল্যাট্রিন আর
বাথরুম। তারই ভাড়া—মাসে দুশো দশ।

: তাও তো পেয়েছিস। কতজনে তা-ও
পাচ্ছে না। এখানে সব ফ্রাইসিসের টপ ফ্রাইসিস
—বাড়ী।

: তাই তো দেখছি।...তুই থাকিস কোথায়?

: ঢাকুরিয়াতে।

: ভাড়া বাড়ী?

: ছোটখাটো একটা মাথাপুঁজবার আস্তানা
নিজেই করেছি কোনমতে। ষ্টেশনের কাছেই মিনিট
পাঁচেকের পথ। আয় একদিন দুপুরের দিকে।
বৌকে সঙ্গে আনিস্ কিন্তু।

কেমন যেন বিমর্ষ কণ্ঠে তারাদাস বলল : তা
বোধহয় আর হয়ে উঠবে না ভাই। ও ভারী
অসুস্থ।

চমকে উঠে বললাম : কী হয়েছে?

: সেইটেই তো বুঝতে পারছিনে। মনটন
ভেঙে গেলে যা হয়—তাই আর কী! তোদের
ডাক্তারীতে কী বলে জানিনে।

আমি বলি—ড্যামেজড্ হার্ট।

: অত ভনিভা না করে—আসল ব্যাপারটা কী—তাই বলুন। কে দেখেছেন?

: কেউ না। ‘হ্যা হুযীকেশ হুদি স্থিতেন’—তার উপরেই সব ছেড়ে ছুঁড়ে দিয়ে বসে আছি।

ওর-মুখের দিকে তাকিয়ে বড় মায়া হল। হাত চেপে ধরে বললাম : আমাকে নিয়ে চল। আমি যাব তোর সাথে। আলতোভাবে হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে তারাদাস বলল : আজ থাক্। একদিন যাব তোর কাছে। আগে হিষ্টিটা সব শোন। তারপর দেখিস ওকে। বলবার অনেক কথা আছে ভাই, শুনলেই বুঝবি।

কেমন যেন সংকুচিত দৃষ্টি মেলে তারাদাস তাকাল আমার মুখের দিকে। মনে হল—কী যেন বলতে গিয়েও—বলতে পারছে না। অথচ এমনটি হবার কথা নয়। ও আমার ছেলেবেলার বন্ধু। একসাথে পড়েছি—সেই নীচু ক্লাশ থেকে একটানা ম্যাট্রিক পর্যন্ত। তারপর থেকেই অবস্থা জীবনের মোড়টা ঝিমুখী হয়েছে কিন্তু হারিয়ে যায়নি। আমি যখন ডাক্তারী পড়ছি, তারাদাস ততদিনে বি, এ, পাশ করে রীতিমত চাকরি করতে শুরু করেছে। তখনও যোগাযোগ ছিল। ওর বিয়েতে গিয়ে কয়েকদিন হৈ চৈ করে এসেছি। আমার বিয়েতে ও সজ্ঞীক এসেছিল। পরে যখন ও পাটনায় চাকরি করতে গেল, তখনও বেশ কিছুদিন চিঠিপত্রে আদান প্রদান ছিল। তারপর সেটা কমতে কমতে প্রায় বন্ধই হয়ে যায়। বছর তিনেক আগে আমি তখন

জলপাইগুড়ির চা বাগানের ডাক্তার হয়ে,—এবাগান সে বাগান ঘুরে বেড়াচ্ছি, সেই সময় ওর একখানা চিঠি বছ-ঠিকানা ঘুরে অবশেষে আমার হাতে এসে পড়ল। তাতে ও লিখেছে : ভাই ডাক্তার, মেয়ে বিয়ের যোগ্য হয়ে উঠল। ভাল বরের খোঁজ থাকলে জানান। এ মূলুকে পাওয়া কঠিন।

আমি আমার জানাচেনা তিনটি উপযুক্ত পাত্রের নাম ঠিকানা ওকে পাঠাই। ও কী করল কিছুই জানতে পারিনি। এই তিনটি বছরের মধ্যে ওর আর কোন খবরই পাইনি।...এতদিন পরে আজ হঠাৎ এই দেখা।

জিজ্ঞাসা করলাম : এখানে দাঁড়িয়ে কী করছিস? হাত দেখাবি নাকি?

প্রশ্নটার সরাসরি উত্তর না দিয়ে তারাদাস বলল : এ ভদ্রলোক কেমন জ্যোতিষী—জানিস কিছু?

: নামের শেষে তো একগাদা ফরেন-ডিগ্রি-দেখছি। ভালই হবেন হয় তো। কী করবি—হাত দেখাবি নাকি?

: হ্যা-ভাই, একবার হাতটা দেখাব। ভাই ভাল একজন জ্যোতিষী খুঁজছি। আছে—তেমন কেউ—তোর খোঁজে?

: আছে। আমার নিজের পেশেন্টই আছে। ভদ্রলোক খুব ভাল জ্যোতিষী। আমার হাত দেখে রলেছিল—নির্ঘাত লটারির টাকা পাবেন। সত্যি পেয়েছি।....

খুশীতে ঝলমল করে উঠল তারাদাস : কত :
পেলি—এক লাখ ?

: না, পঞ্চাশ টাকা। তবুও তো পেয়েছি।
কিছুটা ফলেছে গণনা।

: ভদ্রলোক সত্যি সত্যি গুণী লোক মনে
হচ্ছে ! থাকেন কোথায় ?

: বালিগাঞ্জ—গোলপার্কের কাছে, বয়স কিন্তু
বেশী না, হার্ডলি থার্টী। জীটিও খুব ভাল। ওরা
হুজনেই যেমন ভদ্র—তেমন বিনয়ী। ছোট্ট সংসার।
ছেলেপুলে হয় নি। ভদ্রলোক সারাদিন পড়াশুনা
নিয়েই আছেন। অসম্ভব ষ্টাডি করেন। মাদ্রাজ
থেকে কী যেন একটা এ্যাড্বেলজির ম্যাগাজিন
বেরোয় মাসে মাসে। খুব বিক্রী। তাতে প্রায়ই
ওঁর লেখা থাকে।...

তারাদাস খপ করে আমার হাত চেপে ধরে
মিনতির কণ্ঠে বলল : আমাকে তুই নিয়ে চল ভাই
তার কাছে।

: এখনই যাবি? কিন্তু আজ তো হাত দেখানো
যাবে না। সকাল ছটা থেকে সাতটা। আর বিকেলে
চারটে থেকে পাঁচটা, রোজ এই দুঘণ্টা শুধু হাত
দেখেন।

: তা হলে আজ তো আর হবে না—ছটা
বেজে গেছে। কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ থেকে কী যেন
ভাবল তারাদাস। তারপর মুখ তুলে কেমন
যেন ক্লিষ্ট কণ্ঠে বলল : চল না—ও ফুটের ঐ
কাফেটেরিয়াতে গিয়ে একটু বসি। রাস্তায় দাঁড়িয়ে
কথা হয় না।

রাস্তা পার হয়ে—ও পাশের রেইরেটে ঢুকে
পড়লাম। বেশী ভিড় নেই। একটা খালি কেবিন
পাওয়া গেল। হুজনে বসলাম মুখোমুখি। চায়ের
পেরালায় পর পর কয়েকটা চুমুক দিয়ে তারাদাস
মুখ তুলে তাকাল আমার দিকে। সোজা আমার
চোখে চোখ রেখে খুব আস্তে আস্তে বলল : তোকে
কয়টা কথা বলব ভাই ডাক্তার। তুই নিজের লোক।
বাইরের কাউকে এ কথা বলা যায় না।...

কথা ধামিয়ে কয়েক মুহূর্ত ইতস্ততঃ করল
তারাদাস। তারপর মুখ নীচু করে এক চুমুক চা
খেয়ে গলা ভিজিয়ে নিয়ে বলল : বছর তিনেক
আগের ঘটনা এটা। আমার পাটনা আফিসের
এক কলিগ ভদ্রলোক হঠাৎ বোম্বেতে ট্রান্সফারের
অর্ডার পেয়ে, আমাদের বেজায় ধরে বসলেন—তার
ভাইপোটাকে আমার বাড়ীতে মাস কয়েকের জন্ত
পেয়িং গেস্ট হিসাবে রাখতে হবে। ছেলেটির আর
মাত্র কয়েক মাস পরে এম, এ, পরীক্ষা। সুন্দর
স্বাস্থ্যবান ছেলে। পড়াশুনায় খুব ভাল। স্কুল
ফাইনাল আর আর ডিগ্রীকোর্স—দুটোতেই স্কলার-
শিপ পেয়েছিল। ওর সাথে কথা বলে খুবই ভাল
লাগল। ভারী মিষ্টভাষী। রাজী হয়ে গেলাম।
রাজী হবার পিছনে আরও একটা কারণ ছিল।
আমার মেয়ে নন্দিতা সেবারে স্কুল ফাইনাল দেবে।
ভাবলাম—ওকে বাড়ীতে রাখলে—মেয়েটাকে একটু
আধটু দেখিয়ে শুনিয়ে দিয়ে সাহায্য করতে পারবে।
আমার জ্বরও খুবই মনে ধরল—ছেলেটাকে। ওর
এম, এ, পরীক্ষা হয়ে গেল। নন্দিতার পরীক্ষার

আর মাসখানেক বাকি, হঠাৎ একদিন সকালে উঠে ওদের হুজনের কাউকে বাড়ীতে খুঁজে পেলাম না। আমার মাথায় যেন বাজ ভেঙে পড়ল। কাউকে মুখফুটে কিছু বলতে পারিনি। লজ্জায়, ঘৃণায় বার বার কেবলই মনে হতে লাগল—এ জীবন আর রাখবনা। এদিকে আশে-পাশে চারদিকে কানাকানি শুরু হয়ে গেল। আমার জ্বী কঁাদতে কঁাদতে শয্যা নিল। তারপর তিনটি বছর পার হয়ে গেল, বিছানা ছেড়ে সে আর উঠল না।...ছেলেটি আমার বাড়ীতে থাকবার সময় দেখেছি—জ্যোতিষ শাস্ত্র চর্চা করত। এ্যাস্ট্রোলজির উপরে লেখা অনেক বই ছিল তার,—রীতিমত পড়াশুনা করত। আমাদের সবার হাত দেখত। কত রকম কথা বলত। এমন অনেক পুরানো কথা বলত—যা সের্ট প্যারসেট সত্যি। আমার হাত দেখে একদিন বলল—: মেসোমশাই, একটা কথা বলব?

: বল।

: মাথাটা সব সময়ে ঠাণ্ডা রাখবেন কিন্তু। আপনার কর রেখায় জোড়াধুনের চিহ্ন আছে!

আমি শুনে হাসতাম। কিন্তু আমার জ্বী ভয় পেয়ে দোষ কাটাবার জন্য গ্রহপূজা আর শাস্তি স্বস্তায়ন করল।

ওরা চলে যাবার পরে লজ্জা, ঘৃণা আর সামাজিক অসম্মানের চাপে পড়ে—আমার বুকটার মধ্যে অনবরত জ্বলে পুড়ে থাকে হয়ে যেতে লাগল। তার উপরে জ্বীর ঐ অবস্থা। আমি যেন পাগলের মত হয়ে পেলাম। এখানে আর বেশীদিন থাকলে

—সত্যি সত্যি পাগল হয়ে যাব, আর জ্বীকেও বাঁচাতে পারব না। বদলি হবার জন্য উঠে পড়ে লাগলাম। অনেক তব্বির তদারক আর কাঠখড় পুড়িয়ে, অবশেষে আজ মাস তিনেক হল এখানে বদলি হয়ে এসেছি। এসে অবধি একজন সত্যিকারের ভাল জ্যোতিষের খোঁজ করছি—ওদের খোজ খবরটা যদি সে গুণে বলতে পারে। একটু ইতস্ততঃ করে বলেই ফেললাম : যদি খোঁজ পাস—কী করবি?

একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলে তারাদাস বলল : আমাদের সম্ভান বলতে ঐ একটাই। আর হয়নি। মেয়ের শোকে—বৌ মরতে বসেছে। যা হবার—তাভো হয়েই গেছে। অসম্মানের বিষ খেয়ে হুজম করে ফেলেছি! সন্ধান পেলে—সম্মানে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাব। মানুষ যেমন করে—মেয়ে জামাইকে নেয়,—তেমনি করে নেব। মান যাক—বিবেক যাক—তবুও তো বৌটা বাঁচবে। আমার হয়েছে ভাই ডাক্তার,—সেই সাপের ছুঁচো গেলার মত অবস্থা! না পারছি গিলতে, না পারছি ফেলতে।...

আমার মুখের দিকে কেমন যেন অদ্ভুত মুখ করে তাকাল তারাদাস। হাঁসছে কী কঁাদছে বোঝা গেল না। কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ থেকে ধরা গলায় বলল : তোর ঐ জ্যোতিষীর ঠিকানাটা আমাকে দে' ভাই। দেখি একবার কথা বলে।

একটা কাপড়ে বাড়ীর ঠিকানাটা লিখে ওর

হাতে দিলাম। বললাম : আমার বাড়িতে কবে আসছিস বল ?

: জ্যোতিষী আগে কী বলে শুনি। তারপরে যাব তোর সাথে পরামর্শ করতে।

রেইক্রেট থেকে বেরিয়ে ওকে শ্রামবাজারের ট্রামে উঠিয়ে দিয়ে, আমি একটা ট্যাক্সি ধরে বাড়ী ফিরে এলাম।

এর কয়েকদিন পরে এক রবিবারের বিকালে কেবল চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে বসেছি, এমন সময় ফোন বেজে উঠল। উঠতে যাচ্ছি, আমার জ্বী ছুটে ফোনটা ধরল। কী কথা হল জানি না, একটু পরেই ফোনটা নামিয়ে রেখে এসে সে উত্তেজিত কণ্ঠে বলল : তোমাকে এখনই গোলপার্কে যেতে হবে। তেইশের বি পঞ্চানন তলা রোডের সাধন ভট্টাচার্য আর তাঁর জ্বী দুজনেই গুরুতর জখম হয়েছেন।

: কী-ভাবে জখম হয়েছে? মোটর অ্যাকসিডেন্টে?

: তা বলল না। তোমাকে এখনই যেতে বলল। আচ্ছা, এ তোমার সেই জ্যোতিষী পেশেন্ট না?

ডিসে টেলে তাড়াতাড়ি চাটুকু নিঃশেষ করে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম : হ্যাঁ-সেই। যে লটারীর টাকা পাব বলেছিল। জামা কাপড় বদলে মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই ব্যাগ হাতে বেরিয়ে পড়লাম। কিন্তু সেখানে গিয়ে যা দেখলাম আর শুনলাম— তা যেমন রোমহর্ষক, তেমনি নাটকীয়।

তারাদাস আমার দেওয়া ঠিকানা অনুযায়ী জ্যোতিষার্ণব সাধন ভট্টাচার্যের চেম্বারে গিয়ে হাজির হয়—ঠিক চারটের সময়। অল্পক্ষণ পরেই সাধন ভট্টাচার্য ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে ঘরে ঢোকেন। সাধন অশ্রুমনস্ক ভাবে এসে চেয়ারে বসলেন। পরণে গরদের ধূতি। গায়ে একটা ফতুয়া। তার উপরে মটকার চাদর। কপালে একটা বড় চন্দনের টিপ। রীতিমত সাস্থিক বেশ। হাতে একটা মোটা বই—‘ভৃগুশাস্ত্র সমুদ্র’। বইখানা টেবিলের উপরে রেখে সাধন মুখতুলে তাকালেন সামনে নতমুখে বসে থাকা তারাদাসের দিকে। বিনীত যুৎ-কণ্ঠে বললেন : বলুন, আপনার কী দরকার?

: দরকার তোর মুণ্ডপাত করা, ওরে বেইমান শয়তান। বজ্র কণ্ঠে এক হুঙ্কার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে তারাদাস সামনে রাখা মোটা বইখানা ক্ষিপ্ৰহস্তে তুলে নিয়েই ছুঁড়ে মারল সাধনকে লক্ষ্য করে। বইখানা মাথায় না লেগে—লাগল সাধনের ডান কাঁধে। সাধন ঐ অবস্থাতেই উঠে দাঁড়িয়ে মারমুখী তারাদাসকে নিরস্ত করতে এগিয়ে এলেন : আহা-হা : এসব কী পাগলামি করছেন।....

: তোর গুপ্তির মুণ্ডপাত করব আজ। তোর রক্তে আজ স্নান করব রে হারামজাদা।

ততক্ষণে সাধন চিনতে পেরেছে তারাদাসকে। সে সসব্যস্তে করজোড়ে তারাদাসকে মিনতি করে : আগে আমার সব কথা দয়া করে শুনুন—

কিন্তু কে কার কথা শোনে? কিন্তু তারাদাস হিংস্র হুঙ্কার ছেড়ে ছুটে গিয়ে সাধনের গলা চেপে

ধরে, ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে ধাক্কা দিয়ে তাকে ফেল দিল মেঝের ওপরে। প্রকৃতপক্ষে স্বাস্থ্যবান সাধন বিগত যৌবন ভগ্নস্বাস্থ্য তারাদাসের আক্রমণ প্রতিহত করবার কোন প্রত্যক্ষ চেষ্টা না করে, পুনঃ পুনঃ তাকে আত্মসংবরণ করতেই অমরোধ করতে থাকে, এবং নিজে অপ্রস্তুত থাকায় তারাদাসের পার্শ্বিক আক্রমণের ফলে মেঝেতে পড়ে গিয়ে মাথায় আঘাত লেগে অজ্ঞান হয়ে যায়—এবং ক্ষত-স্থান থেকে প্রচুর রক্তপাত হতে থাকে।

: বাইরে তর্জন গর্জন আর ধবস্তাধবস্তির শব্দ শুনে বাড়ীর ভেতর থেকে নন্দিতা ছুটে এসে দেখতে পায়—তারাদাস মেঝের উপরে বসে পড়ে রক্তাঙ্গুত সাধনকে পুনরায় আক্রমণ করার ক্ষম প্রস্তুত হচ্ছে। সে অলুখালু বেশে ছুটে গিয়ে তারাদাসকে বাধা দেবার ক্ষম তার পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ে ডুकरে কঁদে উঠে : বাবা ! এ তুমি করছ কী ? ও যে তোমার জামাই। ও আমাকে বিয়ে করেছে বাবা ! সত্যি বলছি,—তোমার পা ছুঁয়ে বলছি।

: খবরদার বলছি, আমাকে ছুঁসনে তুই। তুই বেশী ! তুই নরকের কীট ! বলতে বলতে তারাদাস লাফিয়ে উঠে ছুটে টেবিলের কাছে গিয়ে, হাতের কাছে আর কিছু না পেয়ে মোটা ম্যাগ্নিফাইং গ্লাসটা তুলে নিয়েই ছুঁড়ে মারল নন্দিতাকে লক্ষ্য করে। তীব্র বেগে সেটা গিয়ে লাগল নন্দিতার নাকে, আর মুহূর্তের মধ্যে সেখান থেকে দরদর ধারে রক্ত

পড়তে লাগল। অসহ্য যন্ত্রণায় নাক চেপে ধরে নন্দিতা সংজ্ঞাহীন সাধনের দেহের উপরে লুটিয়ে পড়ল। তারাদাস পাগলের মত আবারও এগিয়ে যাচ্ছিল—ওদের আক্রমণ করতে। কিন্তু ইতিমধ্যে আশে পাশে থেকে লোকজন ছুটে এসে, তারাদাসকে চেপে ধরে পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলেছে। ওদের মধ্য থেকে একজন টেবিল থেকে ফোন তুলে নিয়ে ধানাকে ডাকতে যাচ্ছে, নন্দিতা কোনমতে মাথা তুলে তাকে নিষেধ করে, আমাকে ফোন করতে বলে।

আমি যখন গিয়ে ঘরে ঢুকলাম—দেখলাম কয়েক জন সাধনের মাথায় জল ঢালছে, আর নন্দিতা তার সব যন্ত্রণা তুলে গিয়ে উঠে বসে—সাড়ির আঁচল দিয়ে সাধনের মুখের রক্ত মুছিয়ে দিচ্ছে। আর ওদের থেকে একটু দূরে মেঝেতে বসে—তুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে তারাদাস ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কঁদছে। সাধনের ক্ষতস্থান ব্যাণ্ডেজ করে দিয়ে, ওকে পর পর দুটো ইন্জেকশন করলাম। অল্পক্ষণ পরেই চোখ মেলে তাকাল সাধন।... নন্দিতার নাকে ওষুধ লাগিয়ে লিউকোপ্লাস্ট এন্টে দিলাম।... সে উঠে গিয়ে ভিতর থেকে এক বাটি গরম দুধ এনে সাধনের মুখের সামনে ধরল। সাধন ব্যস্তভাবে বলে উঠল : আমাকে পরে দিও। এ-বাটি বাবাকে দাও। উনি বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন।....

শনির দশা

নিজনকুমার ঘোষ

রেডিওটা বেশ কিছু দিন ধরেই ট্রাবল দিচ্ছে। বার কয়েক দোকানেও পাঠাতে হয়েছে। আর একবার দোকানে পাঠানো মানে নিদেন পক্ষে চল্লিশ পঞ্চাশ টাকার খাঙ্কা। আমি একেবারে বিরক্ত হয়ে উঠেছি। অল্প রেডিও হলে আমি দোকান থেকে কেরং আনতাম না। দোকানদারকে বলতাম, যা দাম হয় দিয়ে আপনি ওটা নিয়ে নিন। দরকার নেই আমার গান শুনে। কিন্তু তা হবার উপায় নেই। খুঁজর বাড়ি থেকে দেওয়া। ভেঙ্গে বুঝিয়ে নিয়ে গেলেও ওটা টেবিলের ওপর সাজিয়ে রেখে দিতে হবে। হা কপাল!

জীকে বলি, তোমাকে চিরকাল ঘরে রাখব সেটা না হয় বুঝি। কিন্তু তাই বলে খুঁজর বাড়ি থেকে পাওয়া একটা আলপিনকেও এই ভাবে সাজিয়ে রাখতে হবে, এটা কেমন কথা!

বাপের বাড়ির কথায় জীওর বিলম্ব রাগ হয়। বলে, রেডিওটা যখন ভাল ছিল তখন তো অফিস থেকে ফিরে হাত মুখ ধোয়ারও টাইম পেতে না। গান, খেলা, বক্তৃতা, মজার মণ্ডলী, সাহিত্য বাসর—সব শোনা চাই। এখন একটু খারাপ হয়েছে

অমনি দূর করে দেবার ফিকির। আসলে তোমরা পুরুষরা বড় বেইমান!

—ওই দেখ, কি কথায় কি কথা এসে গেল।

—চুপ কর। বুঝতেই পারছি আমার অবস্থাও হবে ওই রেডিওটার মত। এখন শরীরে শক্তি আছে, খাটছি পিটছি, কিন্তু সে কতক্ষণ?

আমি একটু খোঁচা দিলাম, আচ্ছা, গ্যারান্টি দিচ্ছি ষত দিন বাঁচব—

—থাক, আর উদারতা দেখাতে হবে না। পুরুষের গ্যারান্টির কোন মূল্য নেই। কাজ করলেই—

ঠিক এই সময়ে কড়া নড়ে উঠল। দরজা খুলে দেখি কান্ন সলজ্জ ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে। ওর হাতে কিছু যন্ত্রপাতি।

—কি ব্যাপার কান্ন?

কান্ন বলল, বাবা পাঠিয়ে দিলেন। আপনার রেডিওটা নাকি খারাপ হয়েছে। যদি আপনি না থাকে—

আমি অবাক হয়ে বললাম, তুমি রেডিও মেরামতি জ্ঞান নাকি? কবে শিখলে?

কান্নু সেই রকম লজ্জিত হয়ে হাসে, এই একটু শিখেছি। তেমন ভাল জানি না।

—এর আগে কখনো রেডিও সারাই করেছ?

—হ্যাঁ।—মাথা কাৎ করল কান্নু : আমাদের বাড়ির, দিদির বাড়ির, সন্তোষবাবুর রেডিও, প্রায় বাবুর—। আপনি জিজ্ঞাসা করতে পারেন।

আমি বললাম, আরে সেজ্ঞে নয়। ঠিক আছে, রেডিওটা আমি খরচের খাতায় ফেলে রেখেছি, এখন তুমি যদি ঠিক করে দিতে পার।

কান্নু জিজ্ঞাসা করল, প্রবলেমটা কি?

—প্রবলেম হচ্ছে দিন দিন আওয়াজ কমে যাওয়া। আগে চাবিটা একটু ঘোরালেই সারা ঘর পম পম করত। এখন কি রকম পিনপিন আওয়াজ বের হয়, কিছু শোনাই যায় না।

কান্নু পস্তীর মুখে রেডিওটা নিয়ে ঠুকঠাক করতে লাগল আর আমিও খবরের কাগজে মুখ ঢাকলাম। আজ রবিবার। কান্নু ভাল দিনেই এসেছে। চাও এসে গেল একটু পরে। বাজার থেকে আজ কাঁঠাল এনেছি। জ্বীকে বললাম, কান্নুকে খানকয়েক কোয়া ছাড়িয়ে দাও।

কান্নুর বাবা জগজ্জলম্বাবু আমার বন্ধু। মাঝে মাঝে নিছক আড্ডা দিতে তাঁর বাড়িতে যাই। বয়সে তিনি আমার চাইতে ঢের বড়, তবু বন্ধু হতে আটকায়নি। একটি প্রাইমারি স্কুলে মাষ্টারী করেন। সংসার বড়। সেজ্ঞেস্তে বাড়তি আয়ের ব্যবস্থা রাখতে সকাল সন্ধ্যা টিউশনি করতে হয়। আর আছে কয়েক ঘর যজ্ঞমান। দেব দ্বিজে ভজ্ঞিশ্রজ্ঞা

বাড়লে তাঁর লাভ বই লোকসান নেই, যদিও এসবে তাঁর বিশ্বাস নেই বলেই মনে হয়। হয়ত কখনো কথায় কথায় হতভাগা রেডিওটার কথা বলে ফেলেছি অমনি ছেলেকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

কান্নু হঠাৎ চৌচিয়ে উঠল, কাকা দেখে যান।

দৌড়ে গেলাম। দেখি রেডিওটার মধ্যে গোটা ছয়েক লাল টুকটুকে কেঁপের জীব।

—কি করে এল এখানে?—আমি অবাক।

কান্নু চোখ বড় বড় করে বলল, আজ পর্যন্ত কম করেও একশো রেডিও সেরেছি কাকা, কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখেছি ইঁহুরেরা এর মধ্যে বাসা বাঁধে। এর মানেটা কি?

—কি জানি? ইঁহুরেরা হয়ত গান ভালবাসে।

ইতিমধ্যে আমার জ্বী হৈ-চৈ শুনে বাইরের ঘরে চলে এসেছে। কিন্তু ইঁহুরের বাচ্চাগুলি দেখে কোন রকম ভাবান্তর হল না। হঠাৎ বলে উঠল, আচ্ছা কান্নু, রেডিওটা কেমন বল তো?

—খুব ভাল রেডিও কাকীমা। আজকাল এ জিনিস পাবেন না বাজারে।

জ্বী আমার দিকে কটাক্ষ করল। আমি প্রমাদ গুণলাম। দিন কয়েক আগে আমি ছোট একটা খোঁচা দিয়েছিলাম, তোমার বাবা বোধহয় দোকানে এর চাইতে সস্তা রেডিও পাননি। জ্বী এবার শোধ নিল, কেমন; নিজ কানেই শুনলে তো? তোমাদের জ্ঞে কিছু করতে হয় না। আসলে অকৃতজ্ঞ তোমরা।

বলতে যাচ্ছিলাম, খবুর মশাই আর সবাই ভাল

দিয়েছেন কেবল আসল জিনিসটি ছাড়া। কিন্তু তার আগেই দ্বিতীয় দফায় কড়া নড়ে উঠল এবং তার সঙ্গে সঙ্গেই ভিতরে প্রবেশ করলেন খোকাদা। খোকাদা পাড়ার একজন উঠতি কনট্রাক্টার। ইট, চূণ, সুরিক, সিমেন্ট ইত্যাদি সাপ্লাই দেন। বললাম, আশুন খোকাদা, তারপর কি খবর।

—আর বলবেন না, শনিঠাকুরের ঝামেলায় একেবারে জেরবার হয়ে গেলাম।—খোকাদা মূলধনাকে হাড়ি করে একটা সিগারেট ধরালেন।

—কেন, শনিঠাকুর আবার আপনার কি করল ?

—শনিঠাকুর মাথায় থাক, তার চেলাচামুণ্ডদের নিয়েই তো পণ্ডপোল। কোন রকমে টুকটাক ব্যবসা করে যাচ্ছিলাম এবার তা ডকে উঠবে।—খোকাদা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন।

আমি ব্যাপারটা বুঝতে পারছিলাম না। কান্না কিন্তু টেঁচিয়ে উঠল, দেখেছেন কাকা আজকাল হু' হাতি পরপর রাস্তায় শনিঠাকুর পজিয়ে উঠেছে। এর মানে কি বলুন তো ?

আমি বললাম, মানে আবার কি, দেশে ভক্তিশ্রদ্ধা আবার ফিরে আসছে।

—ঘটা ফিরে আসছে।—খোকাদা রয়াল বেঙ্গল টাইগারের মত মুখ ব্যাদন করলেন : এ সব হল অ্যান্ডি সোসাল এলিমেন্ট। এই তো দিন কয়েক আগে মোড়ের মাথায় একটা শনিঠাকুরের মন্দির বানিয়ে দিলাম। আবার উণ্টো দিকে আর একটা বানাতে হবে। বুকে দেখুন।

—বেশ তো, তৈরী করে বিল দিয়ে দেবেন। আপনারই লাভ !

—হু, বিল দেব। আমার ঘাড়ে ক'টা মাথা ?

কান্না আবার চেষ্টাল, একটা পয়সা দেয় না কাকা। আমার বাবাকে কি সপ্তাহে দুটো শনিঠাকুর পূজো করতে হয়। নো দক্ষিণা, শুধু খানকয়েক বাতাসা আর কলা।

আমি বললাম, কিন্তু পরসা তো বেশ পড়ে। ওসব কি জন্তো তাহলে ?

খোকাদা ঘর কাঁপিয়ে হেসে উঠলে, আপনি একেবারে ছেলে মানুষ ! ওসব পয়সা হল স্ত্রীভাতদের মধ্যে ভাগাভাগির জন্তো। অর্থাৎ বিনা মূলধনের ব্যবসা, কোন বুঁকি নেই। অথচ লাভ যোল আনার জায়গায় আঠারো আনা। আমি ভাবছি—

খোকাদার কথা আর শোনা গেল না। রেডিও ইতিমধ্যে পমপম করে বেজে উঠেছে। কান্নার স্তম্ভের মুখে এক সঙ্গে গর্ভ ও বিজয়ের হাসি। স্ত্রী দৌড়ে এল, ছেলেমেয়েরা হৈ-হৈ করে উঠল বিবিধ ভারতীয় গান শুনে। আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

যন্ত্রপাতি শুছিয়ে কান্না যাবার জন্তো প্রস্তুত হল।

আমি একটু ইতস্তত করে দুটো দশ টাকার নোট দিতে গেলাম। কান্না ভীষণ লজ্জা পেল, না না, আমি টাকা নিই না কাকা। এটা আমার সখের ব্যাপার।

—না না, তা কি হয় !—আমি ওর একটা হাত ধরলাম। আমার স্ত্রীও অমুরোধ করল, তুমি ছেলেমানুষ, তোমার তো একটা হাত খরচ আছে।

কান্না কিছুতেই নেবে না, ওর ওই এক পো। বলে, এই রকম মডেলের রেডিও নাকি এর আগে কখনো সারেনি। ওর বরফ অভিজ্ঞতাই বাড়ল এতে।

—কিন্তু ভবিষ্যতে রেডিও খারাপ হলে আর কখনো যে ভাবতে পারব না ভাই।

কান্না এক মুহূর্ত চিন্তা করল। তারপর বলল, ঠিক আছে, আপনি আমার একটা চাকরী জোগাড় করে দিন। আপনার রেডিওর ভার আমার ওপর—।

শ্রী বলল, সেই ভাল। দাও না কান্নাকে একটা চাকরী, তুমি তো আজ্ঞেবাজে কত ছেলেকে চাকরী দিয়েছ।

মাসের শেষে মোট ছু'খানা বেঁচে যাওয়ায় আমি খুশি। জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি তো কলেজে পড়তে, পাশ করেছ ?

—বি. কম. পাশ করেছি কাকা। টাইপ জানি, স্পীড চল্লিশ। তাছাড়া রেডিও সারাই, ইলেকট্রিকের কাজ—সব জানি। আমার কোন ইয়ে নেই কাকা, দরকার হলে বেয়ারার কাজও করতে পারি।

—বাঃ, চমৎকার কথা। শুনলেও আনন্দ।

ছপুরে খেতে বসে বললাম, কান্নার জন্তে এবার একটু উঠেপড়ে লাগতে হবে। চমৎকার ছেলেটা। মুখে সব সময় একটা হাসি লেগে রয়েছে। দেখো, এই সব ছেলেরা জীবনে উন্নতি করবেই।

শ্রী আর এক হাতা ভাত দিয়ে বলল, রায়াবরের

সুইচটা কত দিন ধরে খারাপ হয়ে আছে। একটু দেখে দিতে বললে পারতে।

—আহা, এক কাপ চা আর কয়েক রোয়া কাঠালে কত খাটাব ছেলেটাকে! পরে ধীরে স্নুশে বললেই চলবে।

আমি ভাবছিলাম সময়, অর্থ ও বামেলা থেকে মুক্তির কথা। হাতের কাছে এই রকম সবজাত্তা ও বিনয়ী ছেলে পাওয়া ভাপোর কথা। জগজ্জলভদা অবস্থা আগেই বলেছিল, দেখো ভাই, তোমার অফিসে যদি একটা হিল্লো করে দিতে পার। সে কথা এত দিন গায়ে মাখিনি। এ সব তো আজকাল পথেঘাটে হামেশাই শোনা যায়। এক কান দিয়ে শুনে পরক্ষণেই আর এক কান দিয়ে তা বের করে দিতে হয়। না হলে টেকা দায়। অবস্থা এখন কান্নার কথা স্বতন্ত্র।

দিন কয়েক পর কান্না আবার অতি প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ল। ইলেকট্রিকের কি একটা গুণগোলে পাড়ার সমস্ত বাল্ব, টিউব লাইট জ্বলে গেল। চোক, টিউব লাইট ফের নতুন করে কিনতে হল একজন্তে। এখন ফিট করা-দরকার। এত দিন বাদল মিজ্রী এসব কাজে সহায় ছিল। কিন্তু ওকে ডাকা মানেই তো তিনটে টাকা গচ্চা; হাতের কাছে যখন কান্না আছে। আমি তো ওর চাকরীর জন্তে চেষ্টা করছি-ই।

কান্না নিজে থেকেই এল এক দিন রেডিওটা ঠিক মত কাজ দিচ্ছে কি না জানতে। আমি বললাম,

রেডিওটা চমৎকার চলছে, ও নিয়ে আর ভাবনা নেই। তুমি টিউব লাইটটা ফিট করে দাও দেখি—।

পনের মিনিটের মধ্যে কান্নুর কাজ ফিনিশ। জী এই অযোগে রান্নাঘরের সুইচটাও মেরামত করে নিল। আমি ওকে খুব ভাড়াভাড়ি আমাদের অফিসের জেনারেল ম্যানেজারের নামে একটা এ্যাপ্লিকেশন দিয়ে যেতে বললাম। অন্তত কান্নুর কেসটা এক কান দিয়ে শুনে আর এক কান দিয়ে বের করে দেওয়া চলে না।

অফিসে আমার চাকরী প্রায় পনের বছর হয়ে গেল। এ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজারের সঙ্গে কিছু খাতির থাকায় আমি প্রথম দিকে এক জনকে কেরানী ও ছ'জনকে বেয়ারার পদে ঢোকাতে পেরেছিলাম। এর ফলে আমার জী আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব, পাড়ায়—সর্বত্র বলে বেড়াতে লাগল অফিসে আমার দারুণ পজিসন। অন্তত ছুশো ছেলেকে চাকরী দিয়েছি। এ সবে যে খুশি হইনি তা নয়। কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলেছি, ওর কপালে চাকরী ছিল, তাই হয়েছে, আমি তো নিমিত্ত মাত্র।—এই সব কথায় লোকের ভক্তিশ্রদ্ধা আরও বেড়ে যায় দেখেছি। বলে, আহা কি বিনয়ী, এত ছেলেকে উদ্ধার করেছেন, তবু এতটুকু অহঙ্কার নেই শরীরে। দেবতা ?

কিন্তু পনের বছর পর কান্নুর জন্মে তিস্য সত্যি চেষ্টা করতে গিয়ে অকূল পাথরে পড়লাম।

সে দিন নেই, সেই এ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজারও নেই। অফিসের কাজ কর্ম কমে গেছে। সব জায়গায় ব্যয় সঙ্কোচ চলছে। এর মাঝখানে কান্নুরা মূর্তিমান বিড়ম্বনা ছাড়া আর কি! তার ওপর কালে ভজ্রে যদি বা লোক নেওয়া হয়। সে জন্মে আছে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা। ছোটো কেরানীর পদের জন্মে দশ হাজার দরখাস্ত পড়ে। ফলত আমি ও কান্নু ছ'জনেই হাবুডুবু খেতে লাগলাম।

কান্নু তবু আশা ছাড়ে না। আমার বাড়িতে আসে, তবে কম। এলেই এক কাপ চা ও আশ্বাসের বিনিময়ে টেবিল ল্যাম্প, ইলেকট্রিক ইন্ড্রী ও টুকটাকি অনেক কিছু সেরে দিয়ে যায়। মুখে যেন আগের মত আলগা হাসি লেগে থাকে না। তা কি করেই বা থাকবে।

রাস্তায় খোকাদার সঙ্গে দেখা হয়। গভীর মুখে হয়ত নবতম কোন শনি ঠাকুরের আস্তানা বানাচ্ছেন। বলি, খোকাদা, আপনার তো বাড়ি বানানোর সুজ্ঞে হাই কানেকসন আছে, তা দিন না কান্নুকে একটা চাকরী!

—আমাকে একটা চাকরী দিন না। আজ চাকরী পেলে আজই এই ছাতার ব্যবসা ছেড়ে দেব। মশাই জেরবার হয়ে যাচ্ছি শনিভক্তদের ছালায়।

খোকাদা মিথ্যে বলেননি। হিসেব করে দেখলাম আমার বাসা থেকে বাসস্ট্যাণ্ড পর্যন্ত অন্তত এগারোটি শনিঠাকুর পজিয়ে গেছে। করপোরেশনের জমি, খোকাদার ফ্রি ইট, চূণ, সিমেন্ট, শ্রমিক আর ভক্তদের প্রাণ ঢালা প্রণামী—ব্যবসা তো জাকিয়ে

উঠবেই। কান্নুর কথাই ঠিক, উইদাউট ক্যাপিটেলের বিজনেস!

ধীরে ধীরে দিন, মাস, বছর—সব কিছুই গড়াতে থাকে। কান্নুর সঙ্গে আমার কমই দেখা হয়। আমিও চাই না আশ্বাসের একঘেয়ে রেকর্ডটা ওর সামনে আবার রাজ্যই। কান্নুরও হয়ত ওসব গুনতে আর ভাল লাগে না। জগদ্বলভদার বাড়ি যাওয়া ছেড়েই দিয়েছি। জ্বর প্রতি কড়া হুকুম, খবরদার কান্নু এলেও ওকে কোন কাজের ভার দেবে না। জানই তো, দেশে বেগার খাটা এখন বেআইনী। জ্বর বলে, কান্নু আজকাল আসেই না। এলে অবশ্য আমি টেবল ল্যাম্পটা সেরে নেব। আহা, সখের জিনিসটা খাটের নিচে শুধু শুধু পড়ে আছে।

এরও বেশ কিছু দিন পর সন্ধ্যার সময় পকাননভলা দিয়ে আসতে গিয়ে আমি যেন ভুত দেখে চমকে উঠলাম। স্পষ্ট দেখলাম একটা উঁচু মঞ্চের ওপর শনিঠাকুর আর একটা ছেড়া নামাবলী পায়ের দিয়ে কান্নু নেচে নেচে আরতি করছে তার সামনে। প্রথম দিনের কথা মনে পড়ল। রেডিও সারাতে এসে কান্নু বলেছিল, ওর বাবাকে নাকি বিনা দক্ষিণায় ফি শনিবার ছুটো পূজো সেরে দিতে

হয়। বাবার কি ভাহলে অনুখ করেছে? কিন্তু কান্নু তো প্রকসি দেবার ছেলে নয়। ব্যাপারটা আমার কাছে খুব পোলমেনেলে বলে মনে হল। চোখাচোখি হতেই কান্নু হাত নেড়ে আমাকে ইসারা করল। আমি এক পাশে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানতে লাগলাম। শোনাই যাক ব্যাপারটা কি। একটু পরে পূজো শেষ হলে কান্নু আমার কাছে এসে দাঁড়াল।

—খুব অবাক হয়ে যাচ্ছেন কাকা, তাই না?—কান্নু জোরালো একটা হাসি দিয়ে বত্রিশটা দাঁতই বের করে ফেলল: আমরা ছুই বেকার বন্ধু মিলে এ-পথ ধরেছি। এই শনিবারের সব ইনকাম আমার, আমার বন্ধু শুধু কঁাসি বাজাবে। সামনের শনিবারে আবার আমি কঁাসি বাজাব। আর এটা হচ্ছে পোর্টেবল শনিঠাকুর। যেখানে ভিড় সেখানে কাঠের স্ট্যাণ্ড বগলে করে নিয়ে শনিঠাকুর পেতে পূজো লাগিয়ে দি। বেশ পয়সা পড়ে কাকা। হাত ধরচা চলে যায়।—কান্নু ফের দাঁত বের করার উপক্রম করল।

আমি কিছু বলতে পারলাম না। মাথা নিচু করে চলে এলাম।

ভারত-চেতনার প্রসারে ভারত-সভা

ড. শিবদাস চক্রবর্তী

উনবিংশ শতাব্দীতে ভারত-চেতনার প্রসারে ভারত-সভার (Indian Association) অবদান যেমন অপরিসীম, তেমনি ভারত-সভার প্রসঙ্গের সঙ্গে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। আধুনিক যুগের ভারত-ইতিহাসের সেই বিস্তৃত-প্রায় অধ্যায় নিঃসন্দেহে বাঙালীর কাছে চিরকালের পৌরবের বিষয়। কিন্তু ইতিহাসেরও ইতিহাস থাকে। সুতরাং ভারত-সভার প্রতিষ্ঠার আগে কী ভাবে শিক্ষিত বাঙালীর মনে ধীরে ধীরে ভারত-চেতনার উদ্বেগ ঘটে থাকে তা' মূল প্রসঙ্গের ভূমিকারূপে আলোচনার দাবি রাখে।

এ দেশের প্রথম 'ভারত-পথিক' রাজা রামমোহন রায়। রাজার যা কিছু সাধ, যা কিছু সাধ্য ও সাধনা সবই সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতাকে অতিক্রম করে ভারত ভূমি তথা ভারতবাসীর কল্যাণে উৎসর্গীকৃত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ তাই রাজার অবিস্মরণীয় নামটিকে 'ভারত-পথিক' অভিধার দ্বারা চিহ্নিত করেছেন। 'ভারত-পথিক' তো বটেই, তাঁকে 'বিশ্ব-পথিক' বললেও বোধহয় অত্যাঙ্গি হয় না। কারণ,

তাঁর সমসাময়িককালে সম্ভবত, আর কোন ব্যক্তি জাতিবৈর পরিহার করে বিশ্ব মৈত্রীর বাণী এবং তা কার্যকর করবার বাস্তব প্রণালী ঘোষণা করতে পারেন নি। লণ্ডনে বসে ক্রান্ত ভ্রমণের ছাড়পত্র চেয়ে রামমোহন ফরাসী পররাষ্ট্রবিষয়ক মন্ত্রীর কাছে যে ঐতিহাসিক পত্র লেখেন, সেখানি তাঁর 'বিশ্বপথিক'-মনের পরিচয়বাহী অমূল্য দলিল।

কিন্তু রাজার স্বাদেশিকতা, রাজার ভারত-চেতনা, রাজার বিশ্বমানবতা ছিল তখন একান্তভাবে তাঁরই নিজস্ব ভাব-সম্পদ। তাঁর জীবৎকাল পর্যন্ত তাঁর দেশবাসীর মনে ঐক্যবোধ বা জাতি-চেতনার কোন অস্তিত্ব ছিল না। জনমত বলে কোন বস্তু ছিলনা বলে তা' প্রকাশের উপযোগী কোন সংস্থারও তখনও উদ্ভব ঘটেনি। দেশবাসী এই অনৈক্য ও অসাড়তার স্রোতগেই ইংরেজ বণিকেরা মুষ্টিমেয় শ্বেতকায় সৈন্য নিয়ে পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভ করেছিল এবং তারপর কোথাও প্রায় বিনা প্রতিরোধে, কোথাও বা সামান্য প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়ে তা' দমন করে ধীরে ধীরে বিশাল ভারতবর্ষের নিজেদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল। সমুদ্রপারের

বিদেশী আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে সমগ্র দেশ সমবেত ভাবে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনি। এই জঙ্কই দেখা যায়, ভারত বৃটিশ রাজত্ব পতনের অনেকদিন পরেও ভারতবাসীর মন থেকে বিচ্ছিন্নতাবোধ দূরীভূত হয় নি। বৃটিশ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষেরা নিজেকে 'ভারতবাসী' বলে পরিচায়িত না করে হিন্দুস্তানী, পাঞ্জাবী, মারাঠী, গুজরাতি, বাঙালী, ওড়িয়া প্রভৃতি নামে পরিচিত হতে চেয়েছে।

ভারত-চেতনার উৎস-জাতীয়তাবোধ, জাতীয়তাবোধ প্রকৃতপক্ষে পাশ্চাত্য প্রভাব প্রসূত। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান, পাশ্চাত্য সাহিত্য ও ইতিহাস, পাশ্চাত্য রাষ্ট্রতত্ত্ব ও দর্শনের সঙ্গে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে সুপরিচয়ের ফলেই এদেশবাসীর মনে প্রকৃত আদেশিকতা ও জাতীয়তাবোধের উদ্ভব ঘটে। ভারতে ইংরেজ রাজত্বের সূচনা হয়েছিল যেমন তখনকার বাংলাদেশে, ইংরেজী ভাষা এবং পাশ্চাত্য শিক্ষাকেও প্রথম আগত জানিয়েছিল তেমনি তখনকার বাংলাদেশ। ফলে উনিশ শতকীয় বঙ্গীয় নব জাগরণের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে জাতীয়তাবোধ এবং ভারত-চেতনা ও ইতিহাস-দেবতার অমোঘ বিধান বাংলাদেশে ভাগীরথী গর্ভ থেকে উদগত হয়ে ভারত-সমুদ্রের অভিমুখে যাত্রা করেছিল।

একক প্রচেষ্টা পথপ্রদর্শক হতে পারে কিন্তু পথ-পরিক্রমায় বহুর সমবেত প্রয়াসের প্রয়োজন অপরিহার্য। জাতীয়তাবাদ এবং ভারত-চেতনার পথ-পরিক্রমায় প্রাথমিক স্তরে বহুর সমবেত

প্রয়াসের নিদর্শন রূপে তিনটি সংস্থার নাম উল্লেখযোগ্য: Land holders' Society (১৮৩৭), Bengal British India Society (২০ এপ্রিল, ১৮৪৩) এবং British Indian Association (৩১ ডিসেম্বর, ১৮৫১)। তিনটি সংস্থাই বাঙালীর উত্তোগে বাংলাদেশে স্থাপিত হয়। Land holders Society ছিল জমিদারদের সংস্থা, এর নামের মধ্যেও India শব্দ অনুপস্থিত। তা' হলেও এই সমিতি জমিদারদের স্বার্থের পাশাপাশি রায়তদের স্বার্থের প্রতি যেমন দৃষ্টি রেখে চলেছে, তেমনি ভারতবর্ষের সর্বত্র শাখাসমিতি স্থাপন করে বহির্বঙ্গীয় জনসমাজের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে সাধারণ স্বার্থঘটিত সমস্যাবলীর সমাধানের উদ্যোগী হয়েছে। Bengal British India Societyর বিঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল—"the Collection and dissemination of information, relating to the actual condition of the people of British India,... and to employ such other means of a peaceable and lawful character, as may appear calculated to secure the the welfare, extend the just rights and advance the interests of all classes of our fellow subjects." লক্ষণীয় এই যে এই সংস্থার নাম এবং বিঘোষিত উদ্দেশ্যের মধ্যেই প্রথম বৃটিশ ভারতের জনসমাজের মধ্যে ঐক্যবোধের উন্মেষ আন্ধানিত হয়। এই ঐক্যবোধই জাতীয়তাবোধের

সারবস্ত এবং ভারত-চেতনার নেপথ্য প্রেরণাস্বরূপ। এই সংস্থার সদস্যপদ সকলের জন্মই উন্মুক্ত ছিল। তবে উচ্চ শ্রেণীর ভারতীয় এবং ভারতীয়দের স্বার্থের প্রতি সহানুভূতিশীল ইংরেজ ভদ্রলোক ছিলেন এর সদস্য।

স্বাদেশিকতা তথা রাজনৈতিক চেতনার প্রসারে বাংলা সাময়িক পত্র-পত্রিকার ভূমিকা সূচনা-কাল থেকেই প্রশংসনীয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকের বিশেষভাবে তত্ত্বাবধিনি পত্রিকা এবং অক্ষয় কুমার দত্তর ওজস্বিনী লেখনী প্রসূত চিন্তাগর্ভ প্রবন্ধাবলী নব্য শিক্ষিত বাঙালী মানসে নব্য চেতনা, বৃহত্তর আশা-আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক করতে থাকে। ফলে সমকালীন বাঙালীর ক্রমবর্ধমান আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে পূর্বোক্ত সংস্থা দু'টি যথোপযুক্ত নয় বলে বিবেচিত হয়। এই জন্ম যুগোপযোগী একটি নতুন সংস্থা গঠনের প্রয়োজন দেখা দেয়। এইভাবে পূর্বোক্ত দু'টি সংস্থা সংযুক্ত হয়ে British Indian Association নামে একটি নতুন সংস্থার জন্ম হয় (২৯ অক্টোবর, ১৮৫১)।

British Indian Association প্রথম থেকেই সর্বভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করতে শুরু করে। এই সংস্থার উদ্যোগে ব্রিটিশ ভারতের সমস্ত প্রদেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হয়। ফলে মাদ্রাজে এর একটি শাখা স্থাপিত হয় এবং বোম্বাইতে অনুরূপ একটি সংস্থা গড়ে ওঠে। এই ভাবে ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাসে সর্বজনগ্রাহ্য রাজনৈতিক কর্মসূচীর ভিত্তিতে সংযুক্ত

ভারতের আদর্শ সর্বপ্রথম একটি নিদ আকার ধারণ করে। তবে তখনও স্বাধীনতালাভের স্বপ্ন ভারতবাসীর মনে উদ্ভিত হয় নি। ইংরাজ রাজের প্রতি আনুগত্য অক্ষুণ্ণ রেখে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে আরও সুযোগসুবিধা আদায় করাই ছিল ভারতবাসীর একমাত্র লক্ষ্য। এই ব্যাপারে British Indian Association নিঃসন্দেহে উল্লেখ্য ভূমিকা পালন করেছিল।

সিপাহী বিদ্রোহোত্তরকালে রাজনৈতিক চেতনা এবং জাতীয়তার ভাবাবেগ ক্রমশঃ নবতর বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রসারিত হতে শুরু করে। তখনকার বাংলাদেশে রাজনারায়ণ বসু ছিলেন জাতীয়তাবাদের আদি প্রবক্তা। নিজের রক্ষণশীল ব্রাহ্ম হয়েও তিনি হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করে পাশ্চাত্য-মনোভাবাপন্ন ইংরেজী শিক্ষিত ভ্রূণ সমাজের দৃষ্টি দেশের প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি আকৃষ্ট করেন। তাঁরই উদ্যোগে ইতিপূর্বে মেদিনীপুরে 'জাতীয় গৌরব সম্পাদিনী সভা' (১৮৬১ মতান্তরে ১৮৬৬) স্থাপিত হয়। ঐ বছরেই তিনি 'Society for the Promotion of National Feeling among the Educated Natives of Bengal' নামে একটি সমিতির জন্ম একখানি অনুষ্ঠান-পত্র রচনা করেন। জাতীয় ভাবধারার উদ্বোধনের জন্ম এই অনুষ্ঠান পত্রে যে সমস্ত কর্মপ্রয়াসের কথা উল্লিখিত থাকে, তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই তাঁর একজন শিষ্য নবগোপাল মিত্র National Paper নামে একখানি সাময়িক পত্র প্রকাশ করেন এবং

‘হিন্দু মেলা’ নামে (১৮৬৭) একটি বার্ষিক সভার আয়োজন করেন। ‘হিন্দু মেলা’র লক্ষ্য ছিল ‘to promote the national feeling, sense of patriotism and a spirit of self help among the Hindus.’ হিন্দু মেলার দৃষ্টিভঙ্গী ছিল এই ভারতীয়। এই মেলায় যে শিল্প প্রদর্শনী হয়, তাতে বারাণসী, জয়পুর, পাটনা, কাশ্মীর প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের শিল্প দ্রব্য আমদানী করা হয়েছিল। কিন্তু রাজনারায়ণ বসু, নবপোপাল মিত্র প্রমুখ প্রচারিত জাতীয়তাবাদ, হিন্দুত্ব-ধ্বা ছিল। তা’ খাঁটি ভারতীয় জাতীয়তাবাদের স্তরে উন্নীত হতে পারে নি। তা’ হলেও একথা অস্বীকার্য যে যেহেতু তখনকার জনসমষ্টির শতকরা প্রায় আশী ভাগ ছিল হিন্দু, সেই হেতু হিন্দু জাতীয়তাবাদের মাধ্যমেও এঁদের প্রচেষ্টা ভারত-চেতনার প্রসারে অনেকদূর অগ্রসর হয়েছিল।

উনিশ শতকের মধ্য ও সপ্তম দশকের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে জাতীয়তাবাদ তথা ভারত-চেতনার প্রসারে বাংলা সাহিত্যের অবদানও কম নয়। এই কালসীমার মধ্যে রচিত অনেক কবিতা, নাটক ও গানে ভারত-চেতনাস্পন্দ স্বাদেশিকতার পরিচয় মেলে। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নবীনচন্দ্র সেনের কবিতা, কিশোরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, হরলাল রায় ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটক এবং ভিজ়েন্দ্র নাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আগ্রা প্রবাসী গোবিন্দ চন্দ্র রায়, মনোমোহন বসু প্রমুখ কবিদের রচিত গান এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মর্তব্য।

প্রায় সমসাময়িক কালে ভারতের রাষ্ট্রীয় সাধনার ক্ষেত্রে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপ্রত্যাশিত আবির্ভাব এবং মুখ্যতঃ তাঁরই উদ্বোধনে Indian Association বা ভারত-সভার প্রতিষ্ঠা (২৬ জুলাই, ১৮৭৬) ভারতীয় জাতীয়তাবাদ তথা ভারত-চেতনার প্রসারের ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। এই জন্ত সুরেন্দ্রনাথের জীবন-কথার প্রাসঙ্গিক অংশ সংক্ষেপে উল্লেখের দাবি রাখে। কারণ প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে : ‘If Rajnarain Bose may be called the father of Bengal Nationalism. Surendra Nath may be justly regarded as the father of Indian Nationalism.’

মিডিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে (১৮৬৯) সুরেন্দ্রনাথ উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীরূপে ইংরেজ সরকারের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন। তিনি যখন ক্রীহর্টে র‍্যাশিস্ট্যান্ট ম্যাজিস্ট্রেট রূপে কর্মরত, তখন একটি নগণ্য ক্রটির জন্ত কর্মচ্যুত হন (১৮৭৪)। সুরেন্দ্রনাথ এই অজ্ঞায় দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল করবার জন্ত বিলাতে যান কিন্তু ব্যর্থকাম হয়ে ১৮৭৫-এর জুন মাসে দেশে ফিরে আসেন। দেশবাসী জানতে পারলো একটি সম্ভাবনাপূর্ণ তরুণ জীবন অকালে ব্যর্থতার বালুচরে পড়ে নষ্ট হয়ে গেল। কিন্তু ভাগ্যদেবতার আশীর্বাদও যে কখনো কখনো অভিশাপরূপে দেখা দেয়, মহাহুঁচুপের জঠর থেকেও যে সুযোগের আবির্ভাব ঘটে সুরেন্দ্রনাথের আপাত ব্যর্থ জীবন তার একটি বড়ো প্রমাণ। দেশমাতৃকার

শাসনের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে তিনি নিজেকে দেশমাতৃকার সেবায় উৎসর্গ করলেন। অসামান্য বাগ্মিতাশক্তির জন্য অচিরেই যুব সমাজে তাঁর নেতৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। তখন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন ছিলেন যুবসমাজের অবিসম্বাদিত নেতা। কিন্তু তাঁর বিচরণক্ষেত্র ছিল নব্য ধর্মীয় আন্দোলন। শুরেন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব বাংলার যুবসমাজকে ধর্ম ও সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রে থেকে স্বাদেশিকতা ও ভারতের জাতীয় পুনরুজ্জীবনের প্রশস্ততর ক্ষেত্রে আকর্ষণ করলো।

দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করেই শুরেন্দ্রনাথ একটি নতুন সংস্থা গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। British Indian Association সর্ব-ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই এই কাজ করে চলেছিল কিন্তু তার কর্মপ্রয়াসের গতিতে এমন একটা সীমাবদ্ধতা ছিল কালোপযোগী রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণের ক্ষমতা তার ছিল না। সেইজন্য শুরেন্দ্রনাথের প্রায় বছরখানেকের চেষ্টায় এবং দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী, British Indian Association এর বিশিষ্ট সদস্য মহারাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ, বাবু কৃষ্ণদাস পাণ্ডা প্রমুখ ব্যক্তির সহযোগিতায় ১৮৭৬-এর ২৬-এর জুলাই Indian Association (ভারত-সভা) স্থাপিত হলো। এই সংস্থার স্থাপন সম্পর্কে শুরেন্দ্রনাথ বলেছেন : The idea was working in our minds was that the Association was to be the centre of all India movement. For even then, the

conception of a United India, derived from the inspiration of Mazzini... had taken possession of the minds of the Indian leaders in Bengal. We accordingly resolved to call the new political body the Indian Association.'

শুরেন্দ্রনাথের নিজের বক্তব্য অনুসরণ করে বলা যায়, ভারত-সভার উদ্দেশ্য ছিল : ১) দেশে জনমত গঠনের জন্য একটি শক্তিশালী সংস্থা স্থাপন, ২) সাধারণ রাজনৈতিক স্বার্থ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার ভিত্তিতে ভারতীয় জাতিসমূহের মধ্যে ঐক্যবোধের উদ্বোধন, ৩) হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতির ভাবের উন্নতিবিধান এবং ৪) সমসাময়িক বৃহৎ জন-আন্দোলনে জনসাধারণের অন্তর্ভুক্তি। এই ভাবেই সর্বভারতীয় পর্যায়ে প্রথম জাতীয় সংস্থার জন্ম হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, যে ২৬-এ জুলাই ভারত-সভার জন্ম হলো, সেদিন সকালবেলা এগারোটায়ে তাঁর পুত্র মারা যান। এই ব্যক্তিগত শোকের মর্মান্তিক বেদনা নীরবে সহ্য করে সহধর্মিণীর সম্মতি নিয়ে তিনি সেদিনকার উদ্বোধনী অধুষ্ঠানে যোগদান করেন। তা' ছাড়া তিনি ভারত-সভার একজন একান্ত সক্রিয় সদস্যরূপে কাজ করা ছাড়া এর কোন কর্মকর্তার পদ অধিকার করেন নি। কারণ, ইংরেজ সরকারের চোখে তিনি ছিলেন একজন পদচ্যুত কর্মচারী। সুতরাং নতুন সংস্থার পুরোভাগে তাঁর নাম থাকলে পাছে সংস্থার কোন ক্ষতি হয়, সেজন্য নিজেকে তিনি নেপথ্যেই রেখে দিয়েছিলেন।



এই সময় ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ আই-সি-এস পরীক্ষার্থীদের বয়স কমিয়ে ২১ থেকে ১৯ বছর করেন। ভারতীয় ছাত্রদের পক্ষে ঐ বয়সে ঐ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া খুবই কঠিন ছিল। ভারত-সভা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশবাসীর সমর্থন নিয়ে এই সরকারী আদেশের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করলো। সুরেন্দ্রনাথের ভাষায় এই আন্দোলনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল—‘The awakening of a spirit of unity and solidarity among the people of India.’ সারা ভারতের জাতীয়তাবাদীদের সংগঠিত করবার উদ্দেশ্যে বিশেষ প্রতিনিধিরূপে সুরেন্দ্রনাথ ১৮৭৭-৭৮ সালে বারাণসী এলাহাবাদ, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, আলিগড়, দিল্লী, আগ্রা, মীরট, অমৃতসর, লাহোর, মাদ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন স্থানে জনাকীর্ণ সভায় ভাষণের পর ভাষণ দান করে পূর্বোক্ত সরকারী আদেশের বিরুদ্ধে শিক্ষিত জনমত গঠন করলেন। ভাষা, দেশাচার, সামাজিক প্রথার পার্থক্য সত্ত্বেও আঞ্চলিক বা প্রাদেশিক চেতনা পরিহার করে ভারত-চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে একটি সাধারণ আপত্তিকর বিষয়ের বিরুদ্ধে শিক্ষিত ভারতবাসীর সম্মিলিতভাবে প্রতিবাদ উচ্চারণ ভারতের ইতিহাসে এই প্রথম ঘটনা। বলা বাহুল্য, এই অসামান্য কৃতিত্বের গৌরব ‘ভারত-সভা’ এবং তার প্রাণ পুরুষ সুরেন্দ্রনাথের প্রাপ্য। ১৮৭৮ সালের ১৬ই মার্চ কলকাতায় Medical College Theatre-এ অনুষ্ঠিত Students’ Association-এর সভায় ‘ভারতীয় ঐক্য’ বিষয়ক

ঐতিহাসিক বক্তৃতায় যুবসমাবেশকে লক্ষ্য করে সুরেন্দ্রনাথ বলেছিলেন—‘There is a common country, Let us all Hindus, Musalmans, Christians, Parsees, members of the great Indian Community, throw the pall of oblivion over jealousies and dissensions of by-gone times and embracing one another in fraternal love and affection, live and work for the benefit of a beloved Fatherland.’ আচার্য রমেশচন্দ্র মজুমদারের মন্তব্য অনুসরণ করে বলা যায় যে, সম্ভবতঃ সুরেন্দ্রনাথের আগে অল্প কেউ জাতি-ধর্ম-সম্প্রদায়-নির্বিশেষে ভারতীয় জাতি গঠনের জন্য এমন ভাবাবেগপূর্ণ আহ্বান জানান নি।

জারমান জাতীয়তাবাদকে বৃহত্তর রাজনৈতিক সংস্কার মাধ্যমে বাস্তবায়িত করবার উদ্দেশ্যে ভারত-সভার উদ্যোগে ১৮৮০ সালে কলকাতায় একটি জাতীয় সভা (National Conference) আহ্বান করা হয়। ২০-এ, ২১-এ এবং ৩০-এ ডিসেম্বর—এই তিনদিনে অনুষ্ঠিত সভায় ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে হিন্দু মুসলমান নিবিশেষে শতাধিক প্রতিনিধি যোগদান করেন। এই সভার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সুরেন্দ্রনাথ বলেছেন—‘Our idea is to bring the national forces, as to speak, on a focus; and if possible, to concentrate them upon some common object

calculated to advance the public good. Such I conceive to be the prevailing idea of the Conference.'

সম্ভবতঃ ভারত-সভার অনুপ্রেরণাতেই ভারতের অন্ত্র প্রদেশেও অনুরূপ আভাস দেখা দেয়। মাদ্রাজের মহাজন সভা (১৮৮৪), বোম্বাইয়ের Pressidency Association (১৮৮৫) এর দৃষ্টান্ত স্থল।

National Conference-এর দ্বিতীয় অধিবেশন বসে কলকাতায়—১৮৮৫ সালের ২৫ ২৬ এবং ২৭ ডিসেম্বর। এই অধিবেশনে ভারতের প্রায় ত্রিশটি রাজনৈতিক সংস্থা তাদের প্রতিনিধি পাঠায়। এই অধিবেশনে স্থির হয় যে, প্রতি বছর ভারতের বিভিন্ন বিখ্যাত নগরীতে জাতীয় সভার অধিবেশন বসবে। কিন্তু এই প্রস্তাব আর কার্যকর হবার অবকাশ পায়নি। জাতীয় সভার দ্বিতীয়

অধিবেশন শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে বোম্বাই শহরে প্রায় একই প্রকার চিন্তাধার ও কর্মসূচী ভিত্তি করে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ফলে এরপর জাতীয় সভার উদ্যোগী কর্মীরা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করেন এবং এই সময় থেকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসই একমাত্র সর্বভারতীয় রাজনৈতিক সংস্থারূপে পরিগণিত হয়। জাতীয় কংগ্রেস এবং তার পূর্ববর্তী জাতীয় সভা ও ভারত-সভার ভিতরকার আত্মিক সম্পর্কটি বিশ্লেষণ করে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আচার্য মজুমদার মন্তব্য করেছেন—'...but from its (the Congress) second session in Calcutta it fully adopted the developed political ideas preached by the Indian Association and National Conference.'

জয়ন্তী প্রকাশনের অমূল্য গ্রন্থ

১ম খণ্ড ৯.০০

সুভাষচন্দ্র

২য় খণ্ড ১২.০০

পবিত্রকুমার ঘোষ

৩য় খণ্ড ১৩.৫০

সুভাষের জীবনী সম্বন্ধে অনেক তথ্য বেশ সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

রমেশচন্দ্র মজুমদার

আমার মতে প্রতিটি সরকারী ও সাধারণ গ্রন্থাগারে এই বই থাকা উচিত।

নেতাজী-অগ্রজ সুরেশচন্দ্র বসু

শ্রীপবিত্রকুমার ঘোষ নেতাজীর জীবন-ইতিহাস রচনা করিয়া সমগ্র বাঙালী-সমাজের শ্রদ্ধাভাজন হইবেন সন্দেহ নাই। এই জীবনের গুরুত্ব ও মহত্ব সম্বন্ধে তিনি সচেতন।

সত্যরঞ্জন বস্তু

গ্রন্থকার পবিত্রকুমার ঘোষ নিছক জীবনী লিখতে বলেন নি, সুভাষচন্দ্রের যুগান্তকারী জীবনকে পাঠ্যে করে ইতিহাসের পথ-পরিভ্রমণ করতে বেরিয়েছিলেন, এ-বিষয়ে তাঁর পরিশ্রম যেমন অকুণ্ঠ, সফলতাও তেমনি উল্লেখনীয়।

অধ্যাপক ভূদেব চৌধুরী

পরিকল্পনা অমুযায়ী সুভাষচন্দ্রের বিরাট জীবনী সম্পূর্ণ হলে বাংলা সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি হবে।

চিন্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে লেখকের মূল্যায়নেও আজ আর কেউ আপত্তি করবে বলে মনে হয় না।

আনন্দবাজার পত্রিকা

এ শুধু সুভাষচন্দ্রের জীবনচরিত নয়, এর মধ্যে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলন প্রতিফলন ঘটেছে।

যুগান্তর

সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে অনেক বই বেরিয়েছে। এই মহান জীবনীকারদের মধ্যে শ্রীপবিত্র কুমার ঘোষ অন্ততম।

দেশ।

প্রাপ্তিস্থান : জয়ন্তী প্রকাশন। ২০ এ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড, কলিকাতা-২৬

জাতীয় সাহিত্য প্রকাশন। ১৮-এ টেমার লেন, কলিকাতা-৯

ডানেকী থেকে

ক.

ছেলেবেলায় আমি একটা চন্দনা পুষেছিলাম। বেশ বড় সড়। কঁচি আমপাতার মত স্নিগ্ধ ঠোঁট। গলায়, ঘেন ঘন করে তুলির টানে আঁকা, খয়েরি দাপ। চোখের তারা হালকা লাল। কিন্তু গভীর। ভারি সুন্দর দেখতে পাখিটা।

চন্দনাটা আমাকে দিয়েছিল নিতাই শিকদার। সে ছিল আমাদের বাড়ির মুনিষ। কোথায় কোন জঙ্গলে কাঠ কাটতে গিয়ে গাছের কোটর থেকে ধরে এনেছিল পাখিটাকে।

বনের প্রাণী। সহজে কি পোষ মানে। অনেক মেহনত করে ওকে বাগে এনেছিলাম। খুব যত্ন করতাম। ভেজা ছোলা কাঁচা লংকা এঁটেল কলা—এসব খেতে দিতাম। কখনো বা খালপাড়ের ঘাসজমি থেকে ফড়িং ধরে এনে ওর মুখের কাছে ধরতাম। পুকুর ঘাটে গিয়ে রোজ স্নান করাতাম।

মাস দুইয়ের মধ্যেই পাখিটার মুখে বোল ফুটল। অবিকল মার মত গলা করে আমাকে দেখলেই ডেকে উঠত : পিঁটু, ও পিঁটু ঘরে আয়। আমার সাড়া পেলেই মিহি করে শিস দিয়ে উঠত। পাখনা

প্রলম্ব সেন

ফুলিয়ে ওম্ ছড়াত। তারপর শুরু হয়ে যেত নাচন-কোদন।

বছর খানেক পরের কথা। গ্রীষ্মের ছপূর। অসহ্য গরম। ঘরে ভিঠোতে না পেরে পাখিগুচ্ছ খাঁচাটিকে নিয়ে আমি বাড়ির পেছন দিককার বাগানে চলে গেলাম। একটা আমগাছের ছায়ায় গিয়ে বসলাম। চমৎকার হাওয়া দিচ্ছিল। কাঁকায় এসে পাখিটার সে কি আনন্দ! দাঁড়ে পায়ের নখগুলো গোঁথে চরকির মত ডিগবাজি খেতে লাগল। আর সেই সঙ্গে শুরু হয়ে পেল মিষ্টি শিস। সেদিন আমার যে কি ছবুজ্জি হয়েছিল। বসন্ত ছপূরের গাছ-পাছালিতে পাগলা হাওয়ার মাতামাতি। পাখিটাকে খাঁচার ভেতরে দেখে হঠাৎ আমার মনটা কাদামাটির মত নরম হয়ে এল। সমবেদনায় ছুচোখ জলে ভরে উঠল। ভাবলাম—একবার ছেড়ে দিই না ওকে। পাখিটা যখন আমায় ভালবাসে, তখন, ছেড়ে দিলে নিশ্চয়ই ও পাগিয়ে যাবে না। যেই ভাবা অম্লি কাজ। ঝট করে খাঁচার দরজা খুলে দিলাম। ইসারা করে ওকে বাইরে আসতে বললাম। পাখিটা সঙ্গে সঙ্গে আমার ডাকে সাড়া দিল। খাঁচা থেকে বেরিয়ে প্রথমে আমার কাঁধে

উঠে এল। আমার কঠার হাড়ে বারকয়েক ঠোঁট ঘসল। তারপর এক সময় পত্‌পত্‌ শব্দে হাওয়া কেটে আমার কাঁধ থেকে উড়ে কাছের একটা জামরুল পাছের ডালে গিয়ে বসল। আমি মজা পেয়ে আনন্দে হাততালি দিতে লাগলাম। পাখিটা কিন্তু আমার দিকে ফিরেও তাকাল না। একসময় হঠাৎ ডানা মেলে শূন্যে বাঁপ দিয়ে খানিকটা নিচে নেমে আবার উঠে গিয়ে ঘন সবুজের জাঁকরির ভেতর অদৃশ্য হয়ে পেল। আমি চিৎকার করে ডাকলাম : ‘চন্দনা, চন্দনা—’ পাখিটা আর ফিরে এল না। আমি এক সময় নতজানু হয়ে গাছ-গাছালির দিকে তাকিয়ে কাঁদতে লাগলাম। কেননা, পাখিটাকে যে আমি ভালবেসেছিলাম।

খ.

বাবা থাকতেন মহকুমা সদরে। আমরা গ্রামে। আমাদের বাড়ী থেকে নদীপথে সদরে যেতে পুরো একদিন সময় লাগত। ছুটিছাটা পেলেই বাবা বাড়িতে আসতেন। সেবার বড়দিনের বন্ধে বাবা বাড়িতে এসে বললেন : ‘পিন্টু, কাল যাবি নাকি আমার সঙ্গে, বাদামতলির মেলায়?’—আমি তো এক পায়ে খাড়া। দূরে থাকতেন, খুব ছোট বয়স থেকেই, বাবাকে কখনই নিবিড় করে কাছে পাইনি, পরদিন ছপুয়ে ছুজনে রওনা হলাম। বড় বড় কয়েকটা মাঠ, ছোট ছোট নালা, চাষীদের গ্রাম পেরিয়ে আমরা বাদামতলিতে পৌঁছলাম। দেখি—নদীর ধার বেঁধে খোলা আকাশের নিচে মস্ত মেলা

বসেছে। আমি নাপর দোলায় চড়লাম। দোকানে ঢুকে মণ্ডামিঠাই খেলাম। ছোটবোন রুকির জন্ত কতগুলো রঙচঙে কাঠপুতুল কিনলাম। বাবা কিনলেন দা-বটি যেতের খামা পাটালি শুড়—আরো সব টুকিটাকি সাংসারিক জিনিসপত্র। নিতাইদা বাবার কথামত আগেই মেলায় এসে হাজির হয়েছিল। ওর মাখায় জিনিসপত্র চাপিয়ে ফিরে আসার সময় এক অশ্বথ পাছতলায় এসে আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম। দেখি—একটি গের্যো ছেলে, আতুল গা, পরণে ইজের, বুকের হাড়গুলো কাঠি কাঠি, লম্বাটে মুখ, শ্রামলা, কোমরের ঘুনগিতে একটা ফুটো পয়সা ঝুলছে—বুককাটা চেঁচিয়ে যাচ্ছে : ‘বাপজান, হেই বাপজান, কোথায় গেলি’—আমি বাবাকে শুধালাম : ‘ছেলেটা কাকে ডাকছে বাবা?’—দিনের আলো তখন নিভুনিভু। ব্যস্ত সমস্ত বাবা তখন দায়সারা উত্তর করলেন, ‘কাকে আবার, ওর বাবাকে।—’আমি বললাম, কেন?’—বাবা জবাব দিল, ‘যা ভিড়। বোধহয় ছেলেটা ওর বাবাকে খুঁজ পাচ্ছে না, তাই।’ ‘তাহলে এখন ও কি করবে?’—আমার বুক কেঁপে উঠল। ‘কি আর করবে,’ বাবা আমার হাত ধরে সজোরে টেনে ধমকের জুরে বললেন, ‘নে, এখন চলতো। অন্ধকার নামছে। বাড়ি পৌঁছুতে অনেক রাত হয়ে যাবে যে।’

বড়দিনের ছুটির শেষে বাবা সদরে চলে গেলেন। সেই যাওয়াই বাবার শেষ যাওয়া। আর ফিরলেন না। সেবার গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়ি ফেরার সময়

ডু তুফানে পড়ে বড় নদীতে নৌকাডুবি হওয়ায়
বা মারা যান।

আমি একবার একটি মেয়েকে ভালবেসেছিলাম।
সমঞ্জু। আমি তখন সব কলেজে ঢুকেছি। মঞ্জু
ছিল আমার সহপাঠিনী। বেশ দেখতে মেয়েটিকে।
পান পাত্তির মত মুখ। চোখ দুটো—যেন কেউ
ারালো ছুরি দিয়ে আলতো করে পাত্তা কেটে বের
রে দিয়েছে। তার হাসিটুকু ছিল শরতের মেঘ-
গাঙা রোদ্দুরের মত ঝকঝক।

মঞ্জুর ভেতর দিয়ে আমি নতুন করে নিজেকে
চিনতে শিখেছিলাম। জেনেছিলাম—সারাদিন
যামার বুকের ভেতর শনশন করে কেমন খুশির
ওয়া বয়ে যায়। শরীরের মধ্যে বেজে ওঠে
বিবিরাম এক জলতরঙ্গের সুর।

মনে পড়ে, কতদিন আমরা দুজনে কলেজ
পালিয়ে চৌরঙ্গী পাড়ায় গেছি। সিনেমাহলে ঢুকে
পোলি পর্দায় মানুষের হাসিকান্না দেখতে দেখতে
একসময় বিরক্ত হয়ে বলেছি নিচু গলায় : ‘চলো
জু, উঠি। আর ভাল লাগছে না। বড়ো
ক্ষমকার।’—মঞ্জু সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেছে।
হিরের আলোয় এসে দুজনে হাত ধরাধরি করে
ধারের রাজকীয় বাড়ির স্থাপত্য আর লোকজনের
ভড়ের মধ্য দিয়ে উদাসীন হেঁটে চলে গেছি
য়দানে। পায়ের নিচে সবুজ মখমলের নরম নরম
াস। মাথার ওপরে আকাশ যেন স্বর্ণাভ গম্বুজ।
কের সার, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের মাথায় উড়ন্ত
রী—এই সব দেখতে দেখতে চলে গেছি গঙ্গার

পাড়ে। বসেছি বাধানো বেঞ্চে। মঞ্জু একসময়
ছহাত দিয়ে আমায় কাছে টেনে নিয়ে আমার ঠোঁট
থেকে মুন তুলে নিতে নিতে বলেছে : ‘তুমি একটা
আস্ত বোকচন্দর, কিছুই জানো না।’

সেই মঞ্জুই, এক পৌষের সন্ধ্যায়, আলোরলমল
চৌরাস্তার মোড়ে আমাকে দাঁড় করিয়ে
বলে গিয়েছিল : ‘দাঁড়াও একটু, আমি এখুনি
আসছি—’

মঞ্জু আর ফিরে আসেনি। রূপোলি পর্দার
নায়িকাদের মত সে আমাকে ‘অকাতরে উপেক্ষা’
করে আরেক উজ্জলতর যুবকের হাত ধরে
চিরদিনের মত শহরের ভিড়ে ছড়িয়ে গিয়েছিল।

পুনশ্চ.

এখন আমিও এই শহরেরই একজন। এক
কানাগলিতে আমার বাসাবাড়ি। বউ ভারতী আর
অপুতপু দুই ছেলে নিয়ে আমার সংসার। সময়
এখন আমার কজিতে বাঁধা। খুব ভোরে ঘুম ভেঙে
যায়। উঠে মুখ ধুই, বাজারে যাই, ফিরে এসে
ছেলেদের পড়াতে বসি, স্নান করি, ট্রামবাসের ভিড়
ঠেলে অফিসে যাই। বড়বাবুর ধমক খাই। ক্লাস্ট
হয়ে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরি, সাংসারিক হিসেবের খাতা
নিয়ে বসি। আয়ব্যয়ের হিসেব মেলাতে পলদধর্ম
হই।

কোন কোনদিন কেমন বেভুল হয়ে যাই। বাড়ি
ফেরার সময় নির্দিষ্ট স্টপ ছাড়িয়ে যাবার অনেক
পরে খেয়াল হয়, তখন বাস থেকে লাফিয়ে

নামি। কোনদিন সিগারেট কিনে খুচরো পয়সা নিতে ভুলে যাই। হঠাৎ আবিষ্কার করি—পথ চলতে চলতে আমি এতক্ষণ কি সব যেন বিড়বিড় করে বলছিলাম। কিন্তু কি যে বলছিলাম—মনে করে উঠতে পারি না। কোনদিন বা পাড়ায় ঢুকে বাড়িতে পৌঁছবার গলিটা খুঁজে পাই না। তখন কেবলই লাটখাই। একসময় কেউ যেন কোথেকে বলে ওঠে : ‘পিট, ও পিট, ঘরে আয়।’

ছোট অপরিচয় একখানা ঘর আমার। দিনের বেলাতেও আলো ঢোকে না। ছুটির দিনে আমি ঘরে থাকতে পারি না। বিকেল পড়ে আমার আগেই আমি বেরিয়ে পড়ি। তাড়া খাওয়া জন্তুর মত এদিক সেদিকে ঘুরি। পার্শ্বচারীর ধমকে আমার ঘোর কাটে : কানা নাকি! পথ চলতে জানে না! —অসতর্ক হাটতে গিয়ে একদিন ঢাকনা খোলা মানে হোলে আমার পা পড়ে গিয়েছিল। আরেকটু হলেই আমি পাতালে নেমে যেতাম আর কি। কখনো সশব্দে ব্রেক কষে পেছন থেকে ট্যাক্সিওয়ালা আমার উদ্দেশ্যে অশ্লীল গালগালি দিয়ে ওঠে। মাহুঘের ভিড়ে ক্লোনাক্ত রাজপথ, ট্রামের তারে বিকৃত আকাশ, যানবাহনের কর্কশধাতব শব্দ। জল-ছিটানো দোকানের ডাই করা পানের মত ভাপসা শহর আমাকে দিশেহারা করে তোলে। আমি তখন ল্যাম্পপোষ্টের আড়াল খুঁজি। আধো অন্ধকারে ঘন ঘন শ্বাস নিতে থাকি। আমার

তখন টেঁচিয়ে বলতে ইচ্ছে করে : ‘বাপজান, হেই বাপজান, কোথায় গেলি।’

কোন কোনদিন মাঝরাতে আমার ঘুম ভেঙে যায়। দূরে তখন বড় রাস্তায় ঢং ঢং শব্দে দমকল ছুটে যাচ্ছে। আমার গলার ভাঁজে ঘাম জমে ওঠে। পাশ ফিরতে দেখি—অপু তপুর ওধারে ভারতী, মিসাড়ে ঘুমুচ্ছে। রোগা শরীর। শুকনো ছুটি স্তন। মলিন মুখ ছবি। জানালা দিয়ে চুইয়ে পড়া মরা জ্যোৎস্নায় ওকে মৃত বলে মনে হয়। আমি তখন ওকে জানাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ি। বলতে চাই : ‘ভারতী, এই ভারতী, স্তনছ!—আমার গলা থেকে শব্দ বেরোয় না। আমার শরীর ধনুকের মত বঁকে ওঠে। শ্বাসকষ্টে অস্থির হয়ে উঠি। আমি ওপরের দিকে চোখ তুলি। দেখি, অবাক কাণ্ড, মাথার ওপরে ছাদ নেই। শুধু দূরে খোলা আকাশ পশুজের মত গভীর শূন্য পটভূমি। আর তার মাঝখানে জেপে উঠছে নিঃশব্দে—ছায়াছবির মত, শীতের নদী-গাছ-পাহাড়ের সবুজ, এক উড়ন্ত পরী। তখন কেউ যেন ফিসফিস করে আমার কানে মুখ নামিয়ে বলতে থাকে : ‘দাঁড়াও একটু, এখুনি আসছি আমি।’

কেউ ফিরে আসে না। কেউ আর ডাকে না মমতা মাখানো সুরে। শুধুই তখন বুকের ভিতর এক উথালপাথাল নদী কলকল শব্দে বয়ে যায়।

ফেরোমোন

[৩১৬ পৃষ্ঠার পর]

কিলবিল করে ঘুরে বেড়াচ্ছে—দেখতে পিঁপড়ের মত, কিন্তু প্রকাণ্ড বড়; কারও পাখা আছে, কারও নেই। কেউ আর আমাদের কামড়াচ্ছে না, নবাগতরা থমকে দাঁড়িয়ে দেখছে আমাদের। কেউ শুঙ্গের শুড়শুড়ি দিয়ে অল্পভব করেছে, তার পর যে যার কাজে চলে যাচ্ছে।

“হঠাৎ চোখে পড়ল দেয়ালের কাছে একটা ভীড়, লক্ষ্য করে দেখি তা প্রকাণ্ড গোলাকার কি একটা বস্তুকে ঘিরে। ক্রমে বুঝলাম সেটা পিঁপড়ে রানীর ক্ষীত উদর যার তুলনায় অশ্রুশ্রু অঙ্গ প্রায় দেখাই যায় না। সেবিকারা এই মাতব্বর মাতার তোয়াজ্ঞ করছে। অন্তত এরা শূকদের সেবা যত্নে ব্যস্ত, কেউ বা খাওয়াচ্ছে তাদের। কিন্তু মোটা মোটা মাথাওলা জন কয়েক সর্বদা দেয়াল ঘিরে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল আমাদের মুখোমুখি।”

অধ্যাপক ডেনিস হেসে বললেন, “আমার মনে হয় আপনারা গয়লা-পিঁপড়ের হাতে পড়েছিলেন। তারা আপনাদের গরু বানিয়েছিল। অবশ্য গর্তের বাইরে এদের আক্রমণ এবং হিংসা প্রবৃত্তি দেখে দস্যুর দলেও ফেলা যায়।”

ক্রস বলে চলল, “কিন্তু বন্দী হওয়ার পর আমরা হিংসার কোনও লক্ষণ দেখি নি, বরং ওরা অনেক তদবির তদারক করেছে। মাঝে মাঝে দেখতাম ওরা রসালো শিকড় থেকে রস সংগ্রহ করেছে, কিন্তু তা খেয়ে বঁচে থাকা যায় না। শেষ কালে আমরা মুঠো মুঠো পিঁপড়ের ডিম, শূক ও পিউপা খেতাম—আপনাদের সুপারিশ করব না ঐ সব খাদ্য, কিন্তু অন্তত কিছু প্রোটিন পেতাম ওর থেকে। প্রথমে ভয় ছিল ওরা বাধা দেবে, কিন্তু তা করে নি। অথচ ঐ সব

আত্মীয়দের নিজেরাই কত তোয়াজ্ঞ করত সারা দিন।”

অধ্যাপক ডেনিস বললেন, “সেটা পারিবারিক স্নেহ ভালবাসা নয়, সহজাত অঙ্গপ্রবৃত্তি।”

ফিলিপ বললে, “পিঁপড়ের ডিম খেয়েই ঐ চোহারা হয়েছে তোমার! কিন্তু তোমরা পালাতে চেষ্টা করলে না কেন?”

ক্রস তার ক্ষতবিক্ষত কপাল চুলকে বললে, “তা কি আর করি নি, কিন্তু সে আর এক অবিশ্বাস্য গল্প। খাতের অভাবে যত না কষ্ট হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশী অসহ্য ছিল ঐ খুপরিয় মধ্যে বন্দী দশা। জানি তোমরা আমাদের খুঁজছ, কিন্তু হুড়ঙ্গের মুখ ওরা শুঁড়ো মাটি দিয়ে ঢেকে রাখত, তা সহজে ধরা পড়বে না। ডিয়েগো আর আমি মাঝে মাঝে আলোচনা করতাম আমাদের বাঁচবার সম্ভাবনা কতটুকু, ওদের উদ্দেশ্য কি, বাকি সময়টা মনমরা হয়ে পড়ে থাকতাম। এক দিন এমনি অবস্থায় হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠলাম ঐ ভেবে যে সামান্য পিঁপড়ের কাছে আমি এত বড় জোয়ান মরদ হয়ে পড়েছি অসহায় বন্দী, ডিয়েগো আশঙ্কিত দৃষ্টিতে অবুঝের মত চেয়ে রইল, বোধহয় ভাবল মস্তিষ্ক বিকৃতির সূচনা। অবশেষে বুঝলাম পলায়নের চেষ্টা ছাড়া উপায় নেই, যদিও জানতাম ওরা সহজে আমাদের ছাড়বে না। ছ জনে পরামর্শ করে ঠিক করলাম যে সে দিন রাত্রেই পালাব।

“কিন্তু এক সঙ্গে অগুনতি কামড় ও ছেলের যে কি জ্বালা তার ধারণা ছিল না। হুড়ঙ্গের মুখে পৌছাবার আগেই বাপরে মারে বলে ফিরে যেতে হল, আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে এক উদ্ভট গন্ধ নাকে ঢুকল, তাতে নাড়ি উলটে আসে। ভয় হল এ বার বুঝি ওরা

আমাদের মেরেই ফেলবে, কিন্তু এর পরেও কোনও শত্রুতা করে নি ওরা, এমন কি মনে হয় পালাবার সময়ে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কামড় খাই নি। পুনর্মুখিক হয়ে পড়ে রইলাম, ডিয়েগো স্ত্রিয়মান, মাঝে মাঝে নিঃশব্দে চোখের জল ঝরত। এই সময়ে একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি—এক দল পাখাহীন পিঁপড়ে আসা যাওয়া করছে, তাদের গায়ে লোমের সঙ্গে জড়িয়ে আছে মাটির গুঁড়ো, মনে হয় কোথাও যেন স্ফুটন তৈরি হচ্ছে।”

কর্নেল টেট বললেন, “হয়তো মাটির তলা দিয়ে তারা আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছে, সামনাসামনি আক্রমণে সুবিধা হবে না বলে; হয়তো যে কোনও মুহূর্তে মেঝে ফুঁড়ে উঠে আসতে পারে তাদের অসংখ্য পদাতিক ও বিমান বাহিনী।”

শুনে অনেকে অস্বস্তির ভাবে নড়ে চড়ে বসল। ক্রস বললে, “যাই হক, আগে আমার গল্প শেষ করি। কয়েদখানার থেকে উদ্ধারের আর কোনও উপায় দেখছি না, এ দিকে টের পাচ্ছি দেহের শক্তি কমে আসছে, এমন সময়ে কাল বিকালে পর পর কয়েকটি গুড়ুম গুড়ুম আওয়াজ শুনলাম, মাটিও যেন অল্প অল্প কঁপে উঠল। আবার আশার রেখা জাগল মনে, ভাবলাম নিশ্চয় মানুষ জন এসেছে আমাদের কাছাকাছি, হয়তো আমাদেরই খুঁজছে, সংকেত জানাতে গোলাগুলি ছুঁড়ে। বুঝলাম এ সুযোগ ছাড়লে চলবে না, যে করেই হক জানাতে হবে আমরা এখানেই আছি, নয়তো ওরা আবার দূরে চলে যাবে। ইতিমধ্যে ডিয়েগো একেবারে হাল ছেড়ে দিয়েছিল, কেবলই নিজেদের ঠাকুর দেবতার নাম করে চোখের জল ফেলছে; এখন দেখি আবার প্রাণের আশায় তার বিস্ফারিত চোখ জ্বল জ্বল করছে। তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা তাকে বুঝিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে দিলাম ছুট।

রক্ষীরা তেড়ে এল, আমাদের সারা অঙ্গে তাদের বিষের জ্বালা পদে পদে বাড়ছে, কিন্তু আমরা প্রাণ পণ করেছি। অবশেষে পেলাম মুক্তি—প্রথমে উন্মুক্ত আকাশের সোনালি আলো বারে পড়ল গায়ে, মৃত-সঞ্জীবনীর কাজ করল তা, তার পর দেখলাম আপনাদের, ছুটলাম সে দিকে। বাকি ঘটনার তো প্রত্যক্ষদর্শী আপনারা।”

শ্রোতারা অবাক বিষয়ে মুগ্ধ হয়ে শুনছিল, এই আশ্চর্য কাহিনীর শেষের কিছু ক্ষণ কারও মুখে কথা ফুটল না। তার পর ডঃ হেইগ অধ্যাপক ডেনিসের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, “আপনি যে এত খোঁড়া-খুঁড়ি করলেন তাতে পিঁপড়ের গর্ত ধরা পড়ল না কেন? আর পিঁপড়ের বাসায় এত বড় কামরা যে ছোটো মানুষের জায়গা হয়?”

অধ্যাপক বললেন, “আপনার দুই প্রশ্নের একই জবাব। আমার মনে হয় এরা এত বড় বলেই স্ফুটন ও কামরা এত প্রশস্ত, এবং তাই এদের বাসাও এতগভীর যে আমাদের ফুটোগুলি অত নীচ পর্যন্ত পৌঁছায় নি।”

ফিলিপ বললে, “কিন্তু এ রকম পিঁপড়ে কোথাও আছে বলে কি আপনি জানেন?”

অধ্যাপক ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন, “না, কিন্তু জগতে কত রকম প্রাণী আছে, তবু এখনও প্রায়ই নতুন প্রজাতি আবিষ্কার হচ্ছে, সে কথা তো আগেই বলেছি।”

এই বার ক্রস ফিলিপের দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হেসে বললে, “জান টম, কয়েদখানায় বসে আমি এ সম্বন্ধে ভাববার অনেক সময় পেয়েছি। সন্দেহ হয়েছে আমরা যা খুঁজতে এসেছি এরা হয়তো তারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ।”

ফিলিপ সহজে উত্তেজিত হয় না, কিন্তু এ কথা শুনে তারও চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললে,

“তেজ্জিয়ার মিউটান্ট! তাই তো, এটা আমি আগে ভাবি নি কেন! অধ্যাপক ডেনিস, এই কারণেই আপনাদের বইয়ে এই পি’পড়ের নাম নেই—বহু যুগ আগে প্রকৃতির সৃষ্টি এরা নয়, এরা মানুষের আণবিক বিস্ফোরণের সন্তান।”

নতুন সিগারেট ধরিয়ে অধ্যাপক বললেন, “অর্থাৎ তেজ্জিয়ার প্রভাবে কোনও স্বাভাবিক প্রজাতি বদলে সৃষ্টি হয়েছে এই দানব কুল? কিন্তু এর প্রমাণ কি?”

“তা হলো সম্ভবত ক্রোমোসোমের সংখ্যা বেড়েছে”, বললে ক্রস, “সেটা পরীক্ষা করা কিছু কঠিন না। দেহের প্রতিটি কোষেই তার নজির থাকবে।”

ফিলিপ নীরবে উঠে গেল তার ল্যাবরেটরিতে, জোরালো অণুবীক্ষণের সামনে বসল সাজ সরঞ্জাম ও পি’পড়ের মৃতদেহ নিয়ে। কাজটা সময়সাপেক্ষ, কিন্তু এতে তার হাত পাকা। দেহ থেকে অতি পাতলা সেক্সন কেটে কোষ-কেন্দ্রে ক্রোমোসোমের ক্ষুদ্রাতি-ক্ষুদ্র স্তূতোগুলি রাঙাতে হবে, উপযুক্ত আলোতে তা মাইক্রোসকোপের নীচে রেখে গুনতে হবে সংখ্যা।

এ দিকে সভা ঘরে ক্রস তখন শ্রোতা, সে নিখোঁজ হওয়ার পর দলের অগ্রদূতের অভিজ্ঞতার কথা শুনছে—পি’পড়ের প্রথম হামলা, অধ্যাপক ডেনিসের আগমন ও ব্যর্থ প্রচেষ্টা, ইত্যাদি। এ যাবৎ বিজ্ঞানীরাই প্রধানত কথাবার্তা বলেছে, এখন কর্নেল টেট তাদের উদ্দেশ্য করে বললেন, “এই কীট প্রাকৃতিক না কৃত্রিম এই প্রশ্ন আপনাদের কাছে যতই উত্তেজনার বিষয় হক, আসল কথা এদের সঙ্গে লড়াইতে হবে। তার শ্রেষ্ঠ উপায় কি এখন সেটাই বিবেচনার বিষয়।”

অধ্যাপক বললেন, “তার কি দরকার? পাততাড়ি গুটিয়ে ঘরে ফিরে গেলেই তো হয়। নিজের গবেষণা-গারে নিশ্চিত্তে বসে আমি এই পি’পড়ের নানা রকম

পরীক্ষা করতে চাই, টম ও জেরিও মরুর প্রাণী অনেক সংগ্রহ করেছে।”

বিস্ময়ে কিছু ক্ষণ নির্বাক থেকে কর্নেল টেট বললেন, “আপনারা নিজের গবেষণার বাইরে আর কিছু ভাবতে পারেন না, কিন্তু আমাদের হাতে দেশ রক্ষার দায়িত্ব। জেরি দেখে এসেছে পি’পড়েরা অবিরাম নতুন স্তূড় খুঁড়ে চলেছে—কি তাদের লক্ষ্য, কোথায় গিয়ে তা শেষ হবে? তা কি শুধু আমাদের এই মুষ্টিমেয় ক’ জনের উপর হামলা করবার জন্তই? কিন্তু লক্ষ্য যদি হয় উত্তর মুখে আলামোগোডো, তার পর আলবুর্কাক, সানটা ফে; অথবা পূর্ব দিকে ধরুন ওকলাহোমা শহর, গ্র্যাশভিল ইত্যাদি পেরিয়ে শেষ পর্যন্ত অদৃশ্য শত্রু যদি এক দিন হানা দেয় ওয়াশিংটনে? তা ছাড়া, সামান্য কীটের কাছে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করতে আমি অন্তত লজ্জায় মরে যাব।”

শুনতে শুনতে অধ্যাপকের ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠেছিল, এ বার তিনি গলা ছেড়ে হাসলেন, বললেন, “মাপ করবেন কর্নেল, আপনি অসামরিক বিজ্ঞানীদের খোঁচা দিলেন, আমি বলব লড়াইর শিক্ষা পেয়ে আপনারা সর্বত্র জুজু দেখেন। কিন্তু আমার শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা বলছে যতই ভয়ংকর হক, শেষ পর্যন্ত এরা নির্বোধ, এত বড় মার্কিন জাতক হারিয়ে এরা এ দেশে রাজত্ব করবে? তা ছাড়া, আপনি নিজের কথায় নিজেকে জড়িয়ে পড়ছেন—এ দিকে বলছেন “সামান্য কীট”, আবার এদের সঙ্গে এখনই যুদ্ধ না করলে পরিণতি ভয়াবহ।”

কর্নেল বলবার কিছু পেলেন না, আরক্ত মুখে চূপ করে রইলেন। তাঁর কথা শুনতে শুনতে জুলিওরও চোখ জ্বল জ্বল করে উঠেছিল, এখন তাতে-যেন হতাশার ছায়া পড়ল।

কর্নেল তা বলে পলায়ন নীতি মেনে নিলেন না, পরে ওয়াশিংটনে টেলিফোন করে পেন্‌টাগনের বড় কর্তাদের সঙ্গে আলাপ করলেন। ফলে ঘটনা স্থল স্বচক্ষে পরিদর্শন করতে জেনারল ডগলাসের আবির্ভাব। দোহারা গড়নের মানুষ, দাঁতের বুরশের মত গৌফ সম্বন্ধে, সুসমান করে হাঁটা, কাঁচা পাকা চুল পাতলা হয়ে এসেছে মাথায়, কিন্তু যেটুকু আছে তা এক চুলও স্থানচ্যুত নয়। বাঁ কানের নীচে পুরনো এক গভীর ক্ষত কালো হয়ে আছে। হেলিকপটার থেকে নামলেন মুখের স্বাম মুহুর্তে মুহুর্তে, তার পর অবিলম্বে সামরিক সাজ ছেড়ে ফুলকাটা হাওয়াই শার্ট পরলেন।

তাঁর সঙ্গে এল বেশ কয়েক জন সাংবাদিক, অদূরে তাঁবু খাটানো হল তাদের জন্য, এবং অবিলম্বে রেডিও, টিভি ও সংবাদপত্রের মারফত দেশময় সাড়া পড়ে গেল। কেউ ঢাললে প্রচুর পরিমাণ রক্তরস (“এত কাল পরে বাস্তবিক যুদ্ধে হাইড্রোজেন বোমা ব্যবহার হতে পারে”), কেউ ভান করলে আতঙ্কের (“পিপীলিকা জাতির গোপন চক্রান্ত—পৃথিবী বিজয়”)। বলা বাহুল্য, সেই সব অতিরঞ্জিত বর্ণনার নীচে প্রকৃত সত্য চাপা পড়ে গেল।

ইতিমধ্যে ফিলিপ তার পরীক্ষা সম্পূর্ণ করেছে; ক্রোমোসোমের সংখ্যা যা পাওয়া গেল, অধ্যাপক ডেনিস জানালেন কাছাকাছি জাতের সাধারণ পিঁপড়ের সংখ্যা তার চেয়ে অনেক কম। সুতরাং মনে হয় এই দৈহিক বৃদ্ধি ও অগাধ পরিবর্তনের জন্য দায়ী তেজস্ক্রিয়া, তারই ফলে কোনও স্বাভাবিক প্রজাতি দানবে রূপান্তরিত হয়েছে, পেয়েছে আশ্চর্য্যকর ক্ষমতা।

জেনারল ডগলাসের আগমনের পর অধ্যাপক রাইলি তাঁরই হেলিকপটারে ফিরে গেলেন, উত্তর মুখে কিছু দূর গিয়ে প্লেন ধরবেন। নৃতত্ত্বের আর কোনও

প্রয়োজন নেই, মানুষখেকো বা মানুষধরা জাতের ধারণাটা অমূলক বোঝা গিয়েছে। কিছু দিন হল তিনি অনেকটা আড়ালে পড়ে গিয়েছেন, এখন আসর জমিয়ে রেখেছেন অধ্যাপক ডেনিস। এসেছিলেন স্থির বিশ্বাস নিয়ে যে এ অঞ্চলে অজ্ঞাত অসভ্য সম্প্রদায় আবিষ্কার হবে, তা হলে তাঁর খ্যাতি আরও বাড়বে। এখন বিদ্যায় ক্ষণে যেন তাঁর ভাবে সেই ব্যর্থতা লক্ষ্য করে অগুরাও বিষয় হয়ে পড়ল, যদিও তাদের দিকে হাত নাড়তে নাড়তে তিনি যখন হেলিকপটারে চড়লেন তখন তাঁর এক চোখ হাসছে।

তাঁর সঙ্গে গেল ক্রস, তার গায়ে জায়গায় জায়গায় ফোড়ার মত বেরিয়েছে, ডঃ হেইগের মতে হাসপাতালে ভাল চিকিৎসা দরকার। কিন্তু ফিলিপ ও অধ্যাপক ডেনিসকে জেনারল ছাড়লেন না, পিঁপড়ের বিরুদ্ধে তিনি বৈজ্ঞানিক লড়াই চালাতে চান।

কাঁজের লোক তিনি, সন্ধ্যা হতে না হতে এঁদের নিয়ে বৈঠকে বসলেন। আরও অনেকে এল, তারা প্রধানত শ্রোতা। জেনারল বললেন; “অধ্যাপক, আপনি কীট-বিশেষজ্ঞ, অল্প কথায় আমাকে বুঝিয়ে বলুন কি কি উপায়ে এদের ধ্বংস করা যায়।” জুইস্কির গ্লাসে প্রথম চুমুক দিয়ে তিনি মনোযোগের দৃষ্টিতে তাকালেন অধ্যাপকের দিকে। জেনারল ধূমপান করেন না, তবে প্রতি সন্ধ্যায় স্কটল্যান্ডের আমদানি একটি বোতল তাঁর পাশে পাশে থাকে। অগুরা কেউ কেউ বিয়ারের টিন খুলে বসেছে। জ্যানেট তার রেকর্ডারে নতুন ক্যাসেট পরিয়ে প্রস্তুত। কয়েক জন সাংবাদিকও টেপ রেকর্ডার চালাল।

যেন কলেজে নবাগত ছাত্রদের বক্তৃতা দিচ্ছেন এমন সুরে অধ্যাপক বলে চললেন, “ডিডিটি, গ্যামেক্সেন ইত্যাদির নাম সবাই জানে, সুতরাং সবচেয়ে আগে

আমাদের মনে হবে রাসায়নিক কীটনাশকের কথা। কিন্তু এগুলি মানুষ বা পশু পাখির ক্ষতি করতে পারে বলে এখন জীববিজ্ঞানের ভিত্তিতে বিকল্প অস্ত্রের ব্যবহার বাড়ছে। পোকা মারা হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস এমন কি অণু জাতের পোকা দিয়েও ; এরা কেউ খেয়ে খবস করে, কেউ রোগ ছড়িয়ে মারে, কিন্তু অণুজাত নির্দোষ প্রয়োজনীয় পোকা বা জীবনের ক্ষতি করে না। আর এক সাম্প্রতিক কৌশলে প্রথমে বহুসংখ্যক পুং কীট সৃষ্টি করা হয় যারা প্রজননে অক্ষম ; তা সম্ভব রঞ্জন রশ্মি, অতিবেগনি রশ্মি বা অণুজাত বিকিরণের প্রভাবে, অথবা জ্বাতি-সম্পর্কিত ভিন্ন প্রজাতির সংগমে— অনেকটা যেমন ঘোড়া গাধার সংকর খচ্চর। দলে দলে এই বন্ধ্যা পুরুষ কীটদের ছাড়া হয়, তারা জ্ঞী কীটের সঙ্গে যুক্ত হলে তা হয় নিষ্ফল, এ ভাবে ক্রমে সেই কীট নির্বংশ হয়। তা ছাড়া আছে হরমোনের ব্যবহার, কীটের নাবালক অবস্থায় উপযুক্ত হরমোন প্রয়োগ করলে তারা আর বয়স্ক হয় না, স্তত্রাং বংশ বৃদ্ধিও করতে পারে না।”

জেনারল বোধহয় সব কথা ভাল করে বুঝলেন না, গ্রাসটা ঘোরাতে ঘোরাতে খাবমান বরফ থণ্ডগুলির দিকে চেয়ে বললেন, “প্রোফেসার, আমার তো মনে হচ্ছে আপনি একেবারে প্রথমে যে পদ্ধতিটি বললেন—অর্থাৎ রাসায়নিক কীটনাশক—সেটাই সবচেয়ে সহজ এবং কম সময়সাক্ষেপ। এতে আমরা সঙ্গে সঙ্গে ফল পাব।”

অধ্যাপক দ্বিধার ভাবে কিছু ক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, “তা হতে পারে, কিন্তু এরা ভূগর্ভে এমন অলিগলির জাল বুনেছে, তার সর্বত্র কীটনাশক মসলা পৌঁছাবে কি? হয়তো আনাচে কানাচে লুকিয়ে থাকবে, বাতাসটা পরিষ্কার হয়ে গেলে আবার বেরিয়ে আসবে।”

জেনারল বললেন, “মসলাকে সূক্ষ্ম ভাবে হাওয়া বা কোনও জাবকের সঙ্গে মিশিয়ে আমরা এরোসল স্প্রে বানাব, তার পর বাষ্প জোরে চাপ দিয়ে আমরা ঢোকাব অনেকগুলি জায়গায় মাটি ফুটো করে। এমন কীটনাশক চাই যার সামান্য পরিমাণ পোকাকার নিশ্বাসের সঙ্গে গেলেই অথবা তা গায়ে লাগলেই কাজ হয়। ফল পাই আর না পাই, উপায়টা আমি চেষ্টা করে দেখতে চাই। কি বস্তু ব্যবহার করব, ঠিক কি ভাবে কাজটা হাতে কলমে সম্পন্ন করতে হবে এখন সে বিষয়ে আপনারা পরামর্শ দিন।”

অধ্যাপক বললেন, “কীটনাশকের রাসায়নিক দিকটা সম্বন্ধে আমি খুব অবহিত নই, আমার নিজের গবেষণা কীট পতঙ্গের শ্রেণীবিভাগ ইত্যাদি নিয়ে। তবে আমি কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের নাম বলতে পারি যারা আপনাকে সবচেয়ে সাম্প্রতিক খবর দিতে পারবে।”

তখনই এদের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা শুরু হয়ে গেল। ছ দিন পরে এল বিশেষজ্ঞ রুডল্ফ কুবেলিক, তার সঙ্গে এল নব-আবিষ্কৃত মসলা হেক্সালুড্রিন এবং তার প্রয়োগের ব্যবতীয় উপকরণ ; তা ছাড়া কিছু বোমা, তা মাটির নীচে ঢুকিয়ে দিলে সেখানে ফেটে মসলা চার দিকে ছড়িয়ে দেবে।

পর দিন সকালে তোড়জোড় আরম্ভ হয়ে গেল। ভূগর্ভের প্রতিধ্বনি মাপার যন্ত্র দিয়ে ধরা পড়ল কোন পাথ ফাঁপা স্ফুড় চল গিয়েছে, তৈরি হল তার মানচিত্র। তার পর জায়গায় জায়গায় খোঁড়া হল গর্ত, কোনওটার ভিতর দিয়ে ঢুকবে বাষ্পীভূত মসলার নল, কোনওটায় বোমা। বিকালের দিকে সব প্রস্তুত, জেনারল ডগলাস বাঁশী বাজালেন, সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্র একযোগে শুরু হল রাসায়নিক সংগ্রাম।

সকলেরই অমুমান ছিল অবিলম্বে এই গর্তগুলি দিয়েই শত্রু বার হবে, পালাতে চেষ্টা করবে, তাদের ক্ষিপ্ত দংশন ও হুল এড়াবার জ্ঞাত তারা আপাদমস্তক, ঢাকা পোশাক পরেছে, মুখে স্বচ্ছ মুখোস আঁটা। অধ্যাপক গর্তের মুখে সরু জালের ফাঁদ পেতে রেখেছিলেন জ্যাস্ত পিঁপড়ে ধরবেন বলে। কিন্তু মিনিট কয়েক কিছুই ঘটল না। তার পর কোথাও কোথাও মাটি ফুঁটা হতে দেখা গেল, সেখান থেকে একের পর এক পাখাওয়া পিঁপড়ে বেরিয়ে দেখতে দেখতে উধাও হয়ে গেল। অধ্যাপক এবং তার সহকর্মীরা তাড়াতাড়ি ফাঁদ সরিয়ে সে সব জায়গায় আনলেন, দেখতে দেখতে কয়েকটি ধরা পড়ল। সে দিকে চেয়ে অধ্যাপকের মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত, আর ব্যর্থ রাগে পিঁপড়েরা জালের দেয়ালে মাথা ঠুকছে। খাঁচাগুলির থেকে একটা দুর্গন্ধও লক্ষ্য করা গেল।

অধ্যাপক বললেন, “আপনাদের মনে আছে জেরি বলেছিল পালাবার সময়ে এক তীব্র গন্ধে তাদের নাড়ি উলটে আসছিল? এটা সেই গন্ধ, এখানে পলাতক কীটের সংখ্যা অনেক কম, তা ছাড়া খোলা হাওয়ায় গন্ধ অত ঘন হতে পারছে না। এই গন্ধও নিশ্চয় ওদের এক অস্ত্র—আত্মরক্ষা ও আক্রমণের।”

জ্যানেটের গলায় অধ্যাপকের ক্যামেরা ঝুলছিল, রাসায়নিক যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার আগে সে কয়েকটি ছবি তুলেছে, এ বার অধ্যাপক খাঁচা হাতে করে দাঁড়ালেন, তারও ছবি তোলা হল। বলা বাহুল্য, সাংবাদিকরাও কাজে লেগে গেল।

জেনারল গালের পাশে পুরনো ক্ষতে আঙুল বোলাতে বোলাতে প্রশ্ন করলেন, “কিন্তু পাখাহীনরা কি করছে, তারা কোথায় গেল?”

“হয়তো আনাচে কানাচে কিংবা মাটি খুঁড়ে তার

মধ্যে লুকিয়ে আছে—যা আমি ভয় করেছিলাম,” বললেন অধ্যাপক। “হয়তো কীটনাশকের ঘনতা কমে গেলে ওরাও বেরিয়ে এসে পালাবে।”

কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টা কড়া নজর রেখেও আর পিঁপড়ের দেখা মিলল না। তখন সকলেরই মনে আশা জাগল রাসায়নিক লড়াই অধিকাংশে সফল হয়েছে, ভিতরের শত্রু মরেছে। পরামর্শ করে ঠিক হল অধ্যাপক, জেনারল এবং ফিলিপ প্রত্যক্ষ পরিদর্শন করবেন সন্ধ্যা চুকে।

গায়ে উপযুক্ত বর্ম, হাতে টর্চ, হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে চললেন তাঁরা। ইতস্তত ছড়ানো প্রচুর ডিম আর শূক; আর দেখা গেল ছাতের জায়গায় জায়গায় সরু সরু গর্ত, যে পথে পাখাওয়ারা পালিয়েছে। কিন্তু কোথাও মরা পিঁপড়ে চোখে পড়ল না।

এ দিকে তাঁদের দরদর করে ঘাম ঝরছে, বন্ধ আবহাওয়ায় দম আটকে আসছে। তবু এগিয়ে চললেন তাঁরা, বেশ কিছুটা পথ পেরিয়ে মুখোমুখি পড়লেন এক আশ্চর্য দৃশ্যের—সামনে দেয়াল বেঁধে বলের মত কি একটা যেন পড়ে আছে, ধূসর রঙের সুক্ষ্ম রৌয়ায় ঢাকা।

মুখোসের মুখটা ফাঁক করে অধ্যাপক চিৎকার করে উঠলেন, “আ, ঐ যে আমাদের পিঁপড়ে রানী! এত ক্ষণে আমাদের সব পরিশ্রম সার্থক।”

টর্চের আলোয় বিক্ষারিত চোখ মেলে সকলে দেখলে আসলে ঐ গোল বস্তুটি রানীর পেট, প্রায় একটি টেনিস বলের সমান তা; বাকি দেহ তার তুলনায় হাস্তকর রকম ছোট, শুধু স্থির চোখ জোড়া ছাড়া, জালিকাটা ইষৎ লম্বাটে সেই চোখ আলো পড়ে চক চক করে জ্বলছে।

হঠাৎ ঐ মূর্তি লক্ষ্য করে ফিলিপ যেন আত্মরক্ষার

ভঙ্গিতে ছুঁ পা পিছিয়ে গিয়েছিল, অধ্যাপক বললেন, “ভয়ের কারণ নেই। রানী কখনও যোদ্ধা হয় না, তার এক মাত্র কাজ ডিম পাড়া, সে জ্বয়েই পেট এত বড় এবং ফলে সে অধর্ব, তার সব কাজ করে দেয় পরিচারিকা ‘কর্মীরা’।”

জেনারল বললেন, “ও কেন পালাল না?”

অধ্যাপক এ দিক ও দিক তাকিয়ে একটু ভেবে বললেন, “আমার মনে হয় পলাতকরা ওকে তুলে নিয়ে যেতে চেষ্টা করে এ পর্যন্ত এসে ফেলে দিয়েছে, তাই বোধহয় একটু কাত হয়ে পড়ে আছে; প্রবৃত্তির আদেশে সর্বাত্মে রানীকে বাঁচানোর চেষ্টাই স্বাভাবিক। আরও লক্ষ্য করুন রানী কোথায় পড়ে আছে—সেখানে প্রশস্ত সুড়ঙ্গ শেষ হয়ে সামনে অনেক সরু সরু গর্ত তৈরি হয়েছে। যারা উপরের দিকে খোঁড়ে নি তারা নিশ্চয় এই পথে পালিয়েছে, তা এতই সরু যে রানীর দেহ ঢোকে নি; চণ্ডা রাস্তা বানাবার সময় ছিল না, সুতরাং তাকে ফেলে যেতে হয়েছে। এবং আমরাও ঢুকব না, সুতরাং চলুন বাইরে গিয়ে ঘাড়টা সোজা করি, খোলা হাওয়ায় নিশ্বাস নিয়ে বাঁচি।”

জেনারল নড়লেন না, “আমি রানীকে বন্দী করব।”

অধ্যাপক হেসে ফেললেন, তার পর বললেন, “ও এখনও বেঁচে আছে কিনা সন্দেহ, সেবিকারা যখন নেই। দেখি আপনার ছড়িটা একটু দিন তো।”

জেনারল সাহেবের বেটনটি এগিয়ে অধ্যাপক আস্তে আস্তে ছোঁয়ালেন রানীর মাথায়। সঙ্গে সঙ্গে শুঙ্গ ছুটি অল্প অল্প নড়ে উঠল, কিন্তু দেহ যেমন ছিল তেমনই পড়ে রইল। অধ্যাপক পকেট থেকে এক জ্বালের থলে বার করলেন, তার পর রানীকে লাঠি দিয়ে ঠেলে তার মধ্যে ভরে ফেললেন। “থলেটা এনেছিলাম মামুলি যোদ্ধা ও কর্মীদের ধরব বলে, বিশেষ করে

পাখাহীনদের,” বললেন তিনি; “এখন বুঝতে পারছি তারা সামনের দিকে এগিয়ে গিয়েছে ঐ সরু সরু পথ খুঁড়ে—দেখতে পাচ্ছেন গর্তগুলি? হয়তো এখনও মাটির তলায় এগিয়ে চলেছে এই অদৃশ্য দল। যাক, চলুন এ বার আমরা ফিরি, ঘাড়ের ব্যথা অসহ্য হয়ে উঠেছে।”

এত ক্ষণ তিন জনে কোনও গতিকে মাথা নিচু করে বসে ছিলেন, আবার হামাগুড়ি ফিরে এলেন। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে তখনই সভা বসল অগ্ন্যদের নিয়ে। অধ্যাপক রানীকে বার করে সযত্নে টেবিলে রাখলেন সকলের সম্মোহিত দৃষ্টির সামনে, বললেন, “দেখে মনে হচ্ছে রানী মৃতপ্রায়। লক্ষ্য করুন এর পাখা নেই, গর্ত সঞ্চারের অল্প পরেই তা বিসর্জন দিয়েছে।”

জেনারল তাঁর ক্ষতে তর্জনী বুলিয়ে বললেন, “এটা কি ধরে নেওয়া যেতে পারে যে রানীকে যখন বন্দী করতে পেরেছি তখন আমরা যুদ্ধে জিতে গিয়েছি?”

অধ্যাপক মৃদু-হাসলেন, সিগারেটের লম্বা ছাইয়ের দিকে কিছু ক্ষণ নিবিষ্ট মনে তাকিয়ে বললেন, “এ প্রশ্নের জবাব পেতে হলে পিপড়েদের অভিনব জীবন-তিহাস বিবেচনা করা দরকার। অগ্ন্যা সামাজিক কীটের মত এদেরও বংশ সূচনা করে একটি ভাবী-রানী, উড়তে উড়তে বেশ দূরে গিয়ে সে এক বা একাধিক উদ্ভস্ত পুরুষের সঙ্গে মেলে। তার পর সে ঘর বাঁধে—কোনও জাত হয়তো মাটিতে পড়া মরা ডালের গায়ে, কেউ বা মাটির নীচে সুড়ঙ্গ খুঁড়ে, কেউ অন্য উপায়ে। ইনি ভূগর্ভে এক ছোট প্রকোষ্ঠ বানিয়ে নিশ্চল হয়ে বসে ছিলেন ডিম পাড়বার অপেক্ষায়। যথাকালে ডিম পেড়েছে; তার পর ডিম-নির্গত শূকদের পুষ্ট করেছে নিজের চোয়াল-নিঃসৃত এক রসে (যদিও তাতে

নিজের দুর্বল হয়ে পড়েছে) যেমন স্ত্রীপায়ীরা বাচ্চাদের হুখ খাওয়ায়।

“সুতরাং রানীকে আমরা বলতে পারি ডিম তৈরির ফ্যাকটরি—দিনে তিন হাজারের বেশী ডিম পাড়তে পারে সে। প্রায় পনের বছরের জীবনে ঐ একটিই তার কাজ। মাঝে মাঝে সে একটি অনিষিক্ত (un-fertilized) অণু প্রসব করে, তার থেকে বার হয় এক পুং পিঁপড়ে। কয়েকটি নিষিক্ত ডিম থেকে আবার নতুন করে ভাবী-রানী জন্মায়, তারা যথাকালে ঘর ছেড়ে উড়ে যায় স্বামীর খোঁজে, নতুন সংসার পাতবে বলে।”

“যারা আমাদের আক্রমণ করেছিল তারা তা হলে কোন দলের?” প্রশ্ন করলেন কর্নেল টেট।

“তারা সৈনিক, কাজ গৃহ রক্ষা, কখনও বা হিংস্র আক্রমণও করে। আয়ু বড়জোর সাত বছর—অবশ্য সাধারণ পিঁপড়ের কথা বলছি। তারা পুরুষ না—বক্ষা স্ত্রী বা ক্লীব বলা চলে। এ সব কথা আগে কিছু বলেছি।”

জেনারল বললে, “আমার প্রশ্নের এখনও জবাব পাই নি।”

এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে অধ্যাপক কিছু ক্ষণ ভাবলেন, তার পর ধীরে ধীরে বলে চললেন, “এক কথায় আপনি জানতে চাইছেন এই ডাকাতে পিঁপড়াদের থেকে আমরা সম্পূর্ণ মুক্তি পেয়েছি কিনা, আমাদের কাজ শেষ হয়েছে কিনা। কিন্তু আমার মনে হয় পুরোপুরি সফল হয়েছে এ কথা জোর করে বলা যায় না। ওদের বাসায় ইতস্তত ছড়ানো ছিল ডিম ও ডিমপ্রসূত শূক, হয়তো কর্মীরা সেগুলি নিয়ে পালাতে চেষ্টা করেছে, যেমন চেষ্টা করেছে রানীকে বাঁচাতে; রানীর বিশাল দেহ ক্ষুদ্র পথে ঢুকতে পারে নি,

কিন্তু সম্ভবত কিছু ডিম ও শূক তারা উদ্ধার করেছে। সেগুলি ফুটে যদি আরও যোদ্ধা জন্মায়? তা ছাড়া, কত সৈনিক মাটির নীচে পথ বানিয়ে পালিয়েছে তা কে জানে? এরা কোথাও গিয়ে আবার হয়তো সংঘবদ্ধ হবে, তৈরি হবে আর এক পর্ব যুদ্ধের জগৎ।”

জুলিওকে একটু উশখুশ করতে দেখে অধ্যাপকের দৃষ্টি পড়ল তার উপর। তখন অপ্রতিভ স্বরে সে বলে ফেললে, “ওরা যখন মাটি খুঁড়ে রাস্তা বানাতে এত ওস্তাদ, এ বার হয়তো আর উড়ন্ত বাহিনী আক্রমণ করবে না, চোখের আড়ালে নিঃশব্দে এগিয়ে এসে হঠাৎ এক দিন সদল বলে আমাদের মেঝে ফুটো করে উঠে আসবে। হয়তো...”

কয়েকজন সঙ্গীর হাসি শুনে সে থেমে গেল; তবে সেই হাসি হয়তো একেবারে অনাবিল নয়, অবিশ্বাসের নীচে নীচে একটু যেন আভ্যন্তরীণ ইশারা।

অধ্যাপকের চেহারা কিন্তু গম্ভীর, অশ্রুমনস্ক স্বরে তিনি বললেন, “তা হতে পারে জুলিও, হতে পারে।”

জেনারল বললেন, “কোনও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সাহায্যে আমরা কি ওদের স্বড়ঙ্গের মানচিত্র বানাতে পারি না? তা হলে ওদের অনুসরণ করে স্ত্রীযোগ মত ধ্বংস করা যায়।”

অধ্যাপক বললেন, “ঐ অসংখ্য সংকীর্ণ গর্তের হৃদিশ পাওয়া অত সহজ নয়। যাই হক, আমি আর এক বিপদের কথা ভাবছি যা জুলিওর কল্পিত সম্ভাবনার মত আকর্ষণীয় মনে হবে না কারও।”

ফিলিপ এ যাবৎ চুপ করে ছিল, এখন বললে, “আপনি অন্যান্য কলোনির কথা ভাবছেন?”

“তুমি আমার মনের কথাটাই বলেছ ফিলিপ। যদিই বা আমরা ধরে নিই যে এ ঘাঁটির সব পিঁপড়ে ধ্বংস করেছে—এবং কথাটা সত্য নয়—ত বিবৃপদ

থেকে যায়। কারণ এই যে রানীটিকে দেখছেন তার ক্ষণেকের স্বামীটি এসেছে অশ্রু জায়গা, অশ্রু বাসার থেকে; তাই প্রকৃতির নিয়ম, কারণ একই ঘরের স্ত্রী পুরুষের সংগমে রংশের ধারা ক্রমশ বৈচিত্র্যহীন ও দুর্বল হয়ে পড়ে, তাই মানুষও ভিন্ন পরিবারে বিয়ে করে। সুতরাং আমরা ধরেই নিতে পারি যে এ জাতের পিঁপড়েরা অশ্রুও বাসা বেঁধেছে।”

“তারা কোথা থেকে সৃষ্টি হল,” জেনারল প্রশ্ন করলেন।

“ঐ আণবিক বিস্ফোরণ থেকেই বিভিন্ন স্থানে তাদের জন্ম। অথবা এও ভাবা যায় যে একই কলোনির কিছু পিঁপড়ে মাঝে মাঝে দলছাড়া হয়ে অশ্রু বাসা বেঁধেছে—যদিও আমি প্রথম সম্ভাবনারই পক্ষপাতী। যাই হক, আসল কথা হল এ রকম কত বাসা আছে, তারা কোথায়, কত দূরে তার কিছুই আমরা জানি না। এই অলঙ্কিত অস্ত্রাত শত্রুদের সঙ্গে লড়াই করে জেনারল?”

জেনারল ডগলাস মস্তব্য করলেন, “এবং এ সব দল যে কোনও দিন আবার আক্রমণ করতে পারে।”

“এবং কীটরা এত দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে যে এই যুদ্ধে তাদের যে সামান্য ক্ষতি হয়েছে তার পূরণ অতি সামান্য ব্যাপার,” বললেন অধ্যাপক।

ঘরের দেয়ালে যুক্তরাষ্ট্রের মানচিত্র ঝুলছিল, জেনারল উঠে গিয়ে সেটা নামিয়ে আনলেন, টেবিলে পেতে বললেন, “এবং ওরা যে শুধু আমাদের উপর যুদ্ধ চালাতে পারে তা নয়।” তার পর আঙুল দিয়ে দেখাতে দেখাতে, “এই যে আমরা ঠিক এইখানে আছি, হয়তো উত্তর দিকে ছড়িয়ে পড়বে পদাতিক ও আকাশ-সেনার দল—কোলোরাডো, ওয়াইওমিং, মন্টানা রাষ্ট্র, তার পর ক্যানাডার সীমান্ত ছাড়িয়ে;

ভাঙ্গ '৮৩-১৪

নয়তো পূবে ওকলাহোমা, মেমফিস, রিচমন্ড ইত্যাদি শহর পেরিয়ে নিউ ইয়র্ক মহানগর, কিংবা রাজধানী ওয়াশিংটন।”

অধ্যাপক বললেন, “আপনাদের কল্পনা দেখছি একই খাতে চলে, ইতিপূর্বে কর্নেল টেটও ঠিক এই রকম একটা ছক আঁকেছিলেন। কিন্তু কিছু মনে করবেন না, আমি কৌতুক করে বলছি না—ওদের যে আপনাদের মত সেনাপতি নেই সেটা আমাদের পক্ষে মস্ত ভাগ্যের কথা।”

টেবিল ঘিরে হাসির তরঙ্গ বয়ে গেল, তার মধ্যে জ্যানেন্ট এসে জানাল লাঞ্চ জুড়িয়ে যাচ্ছে।



বিকালের দিকে তখন বিশেষ কোনও সাড়া শব্দ নেই। হঠাৎ ফিলিপের উত্তেজিত গলা শুনে সবাই চমকে উঠল। এই স্থির মানুষটির উত্তেজনার কারণ নিশ্চয় সংঘাতিক একটা কিছু হবে, এবং বলা বাহুল্য, সকালের আলোচনার পর প্রথমেই সকলে আশঙ্কা করল পিঁপড়ে বাহিনীর নতুন আক্রমণ।

ফিলিপ ডাকছিল অধ্যাপক ডেনিসের নাম করে, তিনি বেরিয়ে এসে দেখলেন সে তাঁর ঘরের দিকে ছুটে আসছে। দু'জনের পিছনে পিছনে সকলে দৌড়ে গিয়ে উপস্থিত হল ল্যাবরেটরিতে। দু'কেই যা চোখে পড়ল তাতে কারও সন্দেহ রইল না যে যা ভাবা গিয়েছিল বিপদটা তাই; দেয়াল-জোড়া চণ্ডা জানলার ও পারে জালের গায়ে ঝাঁকে ঝাঁকে পিঁপড়ে এসে ছমড়ি খেয়ে পড়ছে, পাগলের মত চেষ্টা করছে ভিতরে ঢুকতে, কিন্তু পা বা শুঙ্গ ছাড়া আর কিছু ঢুকছে না। এই পঙ্গপাল যে পরদা সৃষ্টি করেছে তাতে স্বয়ং প্রায় অদ্বকার।

কয়েক মুহূর্ত সকলে হতভম্ব, তার পর হঠাৎ কুবলিক বাড়ির ভিতর ছুটে গিয়ে নিয়ে এল তিনটে বাষ্প-বন্দুক, একটার গায়ে বোতাম চাপতেই নল দিয়ে জানলার গায়ে বিচ্ছুরিত হল কীটনাশকের বাষ্প, তার অনুসরণ করলে আরও দু জন। দেখতে দেখতে কিছু পিঁপড়ে ঝরে পড়ল নীচে, কিন্তু কিছু আবার উড়ে পালাল।

“ধাম ধাম, আর দরকার নেই,” চিৎকার করে উঠলেন অধ্যাপক।

যোদ্ধারা অস্ত্র সংবরণ করে তাকাল তাঁর দিকে। অধ্যাপক আগের চেয়ে শান্ত, কিন্তু চাপা উত্তেজনার সুরে বললেন, “এটা আক্রমণ নয়, আমরা ভুল বুঝেছি। লক্ষ্য করে দেখুন এরা সৈনিক নয়—অনেক ছোট, নিশ্চয় পুরুষ। এরা হয়তো আমাদের ক্ষতি করতে আসে নি...”

এ দিক ও দিক তাকিয়ে তাঁর চোখ পড়ল কোণের দিকে, সেখানে খোলা কাঁচের পাত্রে রাখা আছে রানীর অনড় দেহ। সে দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, “ওটা ওখানে কে রেখেছে?”

ঈষৎ অপরাধের সুরে ফিলিপ বললে, “আমি রেখেছি, ঢাকবার উপযুক্ত কিছু পাই নি বলে...”

তার কথায় কান না দিয়ে অধ্যাপক বললেন, “ওর গন্ধে পিঁপড়েরা যে যেখানে ছিল ছুটে এসেছে—এমনই টান যৌন ফেরোমোনের। তাই জানলার ঐ দিকটায় সবচেয়ে বেশী ভিড় ছিল।”

তার পর তিনি উলটো দিকের জানলার কাছে গিয়ে একটা সরু সূতো ঝুলিয়ে ধরলেন, তা অল্প অল্প কাঁপতে কাঁপতে ভিতরের দিকে সরে এল। অধ্যাপক বললেন, “হাওয়ার গতি যে দিকে পাঠিয়েছে সে দিক থেকেই ওরা এসেছে, যেমন আশা করা যায়।”

তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে জানলাটার দিকে তাকাতে সকলের চোখে পড়ল আবার কিছু কিছু উড়ন্ত পিঁপড়ে ফিরে আসছে, বোধহয় ইতিমধ্যে হাওয়ার রাসায়নিক বিধেয় পরিমাণ কমে গিয়েছে বলে। আবার সেই আশ্রাণ চেষ্টা ভিতরে ঢুকবার। অধ্যাপক বললেন, “দেখবেন একটা মজা?”

কাঁচের পাত্রটি সহ রানীকে তুলে নিয়ে তিনি রাখলেন জানলার একেবারে অচ্ছ মাথায়। নিমেষের মধ্যে আগন্তুকরা সেই দিকে ছুটে এল।

কিছু ক্ষণ মুগ্ধ চোখে এই দৃশ্য দেখে যে যার রাসায়নিক বন্দুক আবার তুলে নিয়েছে, অধ্যাপক তাদের থামিয়ে দিয়ে বললেন, “এ ভাবে ওদের মারা যাবে না, আবার উড়ে পালাবে। দাঁড়ান আমার মাথায় এক বুদ্ধি এসেছে। ভাল আঠা আছে কোনও রকম?”

এক জন ছুটল আঠা আনতে। ইতিমধ্যে অধ্যাপক রানীর পাত্রটি যথাসম্ভব দূরে সরিয়ে ভাল করে ঢেকে আটকে দিলেন, তার পর আঠা আর বুরুশ হাতে নিয়ে বললেন, “এ বার গন্ধ কমে যাবে, তবু বেশ করে বাষ্প ছড়িয়ে ওদের তাড়াতে হবে।”

তিন বাষ্প-বন্দুকের মুখে পিঁপড়েরা যখন সরে গিয়েছে তখন অধ্যাপক দরজা খুলে বাইরে গিয়েই তা বন্ধ করলেন, ভিতরের লোকে দেখলে তিনি জ্বালের গায়ে ভাল করে আঠা মাখিয়ে দিলেন। তারপর ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে রানীকে আবার জানলার কাছে রাখলেন, ঢাকনা খুলে দিয়ে ঘরের ভিতর দিকে টেবিলের উপর একটা ছোট পাখা খুলে দিলেন। দেখতে দেখতে পতঙ্গের ঝাঁক ফিরে এল, উত্তেজনা চরমে উঠল, দিশেহারা জ্ঞানশূণ্য হটোপুটি; আঠায় আটকেও কেউ পালাতে চেষ্টা করছে না, বরং ভিতরে

দুকবার আশ্রাণ চেষ্ঠা, কিন্তু শুধু শুষ্কগুলি জ্বালের ভিতরে মুখ বাড়িয়ে পাগলের মত নাচানাচি করছে।

দর্শকদের মুগ্ধ দৃষ্টির সামনে ফন্দি অনুযায়ী বন্দী হল পোকাকার দল। দেখা গেল যারা হঠাৎ আঠার টান থেকে মুক্তি পাচ্ছে তারাও আবার ধরা দিচ্ছে। ক্রমশ নতুন আগন্তুকদের সংখ্যা কমতে কমতে মিনিট তিরিশের মধ্যে শেষ হয়ে গেল। তখন অধ্যাপকের সঙ্গে সকলে বাইরে এস।

আরও বিস্ময় বাকি ছিল কিছু, বন্দীদের কাছে এসে ভাল করে দেখে অধ্যাপক বললেন, “আরে, এরা সব পুরুষ নয়, তাই ভাবছিলাম শুধু পুরুষদের সংখ্যা এত হয় কি করে। এই যে দেখছেন এগুলি একটু বড়, এরা কর্মী।”

জেনারেল ডগলাস বললেন, “কিন্তু আপনি তো বলেছেন কর্মীরা বক্ষা জ্ঞী, তারা কেন রানীর যৌন ফেরোমোনের টানে আসবে?”

অধ্যাপক বললেন, “খুব স্বাভাবিক প্রশ্ন। কিন্তু এরা এসেছে অল্প টানে, আমার মনে হয় রানীর যত্ন করতে, তাকে বাঁচাতে। নিশ্চয় রানীর খোঁজ তাদের দিয়েছে অল্প কোনও এক ফেরোমোন।”

একলা নিঃসঙ্গ এক পতঙ্গ ভন ভন শব্দে মানুষ-গুলির মধ্য দিয়ে পথ করে ছমড়ি খেয়ে পড়ল জ্বালে। অধ্যাপক মন্তব্য করলেন, “বোধহয় খুব দূরের বাসিন্দা, খবর পৌঁছাতে এবং এতটা পথ আসতে তাই বেশী সময় লেগেছে। আমি শেষ পর্যন্ত নজর রাখতে চাই। আজ না হয় এখানে বসেই বিকালের কফি খাওয়া যাক, সন্ধ্যার ধীর আগমন উপভোগ করতে করতে।”

হালকা চেয়ার টেবিল বাইরে এনে আসার তৈরি হল। সূর্য ঝুলে পড়েছে পশ্চিমে, ফুরফুরে হাওয়া ক্রমশ ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। সামনে রুদ্ধ উন্মুক্ত

প্রান্তর, ছোট খাটো গাছপালা ছাড়া দিগন্ত পর্যন্ত দৃষ্টি কোথাও বাধা পড়ে না। এর মধ্যে এই আধুনিক সুসভ্য মানুষগুলি যেন অবাস্তব।

এই রক্ত দৃশ্যের দিকে চোখ রেখে অধ্যাপক হঠাৎ আপন মনে হেসে বললেন, “একটা গল্প মনে পড়ছে শুনুন। আমাদের দক্ষিণে পানামা শহরে ফুটপাথ ধরে এক বার এক সৈনিক পিঁপড়ে বাহিনী চলেছে; কিন্তু কিছু ক্ষণ আগে রুষ্টিতে গন্ধ ধুয়ে যাওয়াতে একটা অংশ পথ হারিয়ে ফেলল, তার পর দৈবক্রমে চক্র পথে গোল হয়ে ঘুরতে থাকল; সেই ঘূর্ণী পথের বন্দী দশা থেকে তারা আর উদ্ধার পেল না, ক্রমে দুর্বল হতে হতে শেষ পর্যন্ত মরেই গেল। তা হলে দেখুন পিঁপড়েরা ফেরোমোনে কতটা নির্ভরশীল, কত দূর তারা প্রযুক্তির দাস।”

চামচে দিয়ে কফি নাড়তে নাড়তে কর্নেল টেট বললেন, “আমরা এত রকম পরিকল্পনা করলাম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি খাটিয়ে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত শত্রু নিপাত হল আপনা থেকে, আকস্মিক ও অভাবিত ভাবে।”

শুনে অধ্যাপক জানলাটার দিকে তাকিয়ে বললেন, “শত্রু সম্পূর্ণ নিপাত হয়েছে কি?” তার পর অস্থানের বিস্মিত কুতূহলী দৃষ্টির সামনে ব্যাখ্যা করলেন, “এই বিশাল মরুভূমিতে দিকে দিকে ওরা কোথায় ক’টা বাসা বানিয়েছে, তাদের সব পুরুষগুলির কাছে এই বন্দী রানীর ফেরোমোন পৌঁছেছে কিনা কে বলতে পারে? যদি সব পুরুষরা মরেও থাকে, সব ঘরে ঘরে এমনি পূর্ণগর্ভ রানী আছে একটি করে, অসংখ্য ডিম মজুদ আছে তাদের পেটে, তা ফুটে আবার বার হবে প্রচুর জ্ঞী পুরুষ, যথারীতি এগিয়ে চলবে বংশবৃদ্ধির কাজ। স্মরণ্য যদিও বা ধরে নিই যে আপাতত

পুরুষেরা সব ধ্বংস হয়েছে, তাতে শেষ পর্যন্ত কতটুকু ক্ষতি হচ্ছে?”

সময়ে আর এক পাত্র কফি ঢেলে অধ্যাপক বলে চললেন, “যে জীব যত ছোট তার প্রজনন তত প্রগলভ; নতুবা বংশ রক্ষা হত না, কারণ তাদের অনেক সন্তানই মারা পড়ে—প্রকৃতির নিয়মে ছোটদের খায় বড়রা, এরা খায় আরও বড়দের পেটে। কীট প্রসঙ্গে একটা উদাহরণ দিই : এক যুগল মাছির যা সন্তান হবে তারা এবং তাদের বংশধররা যদি সবাই বাঁচে এবং সন্তান উৎপাদন করে তবে এক বছর পরে সবগুলি দেহ একত্র করলে সৃষ্টি হবে একটি গোলক যা ৯৬০ লক্ষ মাইল দূরে সূর্যে গিয়ে ঠেকবে। এই অবস্থা অবশ্য অসম্ভব, কিন্তু এর থেকে কীটদের বংশ-বৃদ্ধির হার সম্বন্ধে কিছুটা আন্দাজ পাওয়া যাচ্ছে।”

ঠোটে তিস্তা হাসি নিয়ে জেনারাল বললেন, “এখন হয়তো আমার কথাটা আর অত অদ্ভুত মনে হবে না যে এই অশ্বিনতি পিঁপড়ের দল প্রতিহিংসায় বশে শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে থামবে কে জানে! হয়তো প্রথমে গ্রাম, তার পর ছোট শহর নিশ্চিহ্ন করে জয়ের নেশায় মেতে আমাদের মহানগর আক্রমণ করবে, মানুষের সম্ভ্রাতা, সংস্কৃতি এমন কি অস্তিত্ব নিয়ে টানাটানি পড়বে।”

অধ্যাপক বললেন, “জেনারাল, আপনার সব আশঙ্কা সম্ভব বলে মনে নিলেও আপনার ব্যবহৃত একটি শব্দে আপত্তি করব—তা হল প্রতিহিংসা। পিঁপড়ের মগজের গড়ন এমন নয় যে দিনের পর দিন প্রতিহিংসা পুষে রাখবে অথবা তারই বশে পরিকল্পনা করবে মানুষের বিরুদ্ধে সর্বনাশা যুদ্ধ চালাবার। তাদের সেনা দল অক্ষপ্রবৃত্তির অনুশাসনে আত্মরক্ষা বা আক্রমণের জন্য সাময়িক যুদ্ধ চালাতে পারে, কিন্তু

সেটা অস্ত্র জিনিস। অবশ্য আমি বলছি না আমরা এ জায়গা ছেড়ে চলে গেলে এদের থেকে আর কোনও বিপদের ভয় নেই; পরিকল্পনা ছাড়াও ওরা কোনও দিন যে আমাদের ক্ষতি করতে পারে না, তা নিয়ে লড়াই লাগতে পারে না এমন কথা জোর করে বলা যায় না। মাটি-খোঁড়া জীব ওরা, খেয়ালের বশে ছুঁড়িয়ে পড়লেও শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে উপস্থিত হবে কেউ বলতে পারে না, আমাদের স্বার্থ ও তাদের স্বার্থ বিপরীত হতে পারে...হয়তো খাচ্চা নিয়ে, হয়তো বাসস্থান নিয়ে।”

এ সব কথাবার্তার পর সকলের মনে জয়ের উত্তেজনা ও আনন্দ প্রায় মিলিয়ে গেল। কর্নেল টেট প্রশ্ন করলেন, “তা হলে এখন কি কর্তব্য? আপনার প্রস্তাব কি?”

অধ্যাপক বললেন, “আমি সামান্য এক কীটবিশেষজ্ঞ, আমার মনে হয় এ সম্বন্ধে দেশের সেরা বিজ্ঞানীদের একযোগে মাথা ঘামাতে হবে। যে সব পিঁপড়ে আমরা সংগ্রহ করেছি শ্রেষ্ঠ গবেষণাগারগুলিতে তাদের আরও বিশদ এবং সম্পূর্ণ পরীক্ষা দরকার। হয়তো তার থেকে এদের ধ্বংসের পথও আবিষ্কার হবে। রসায়নবিদরা হয়তো আরও প্রবল কোনও কীটনাশক বানাতে; তার চেয়েও উত্তেজক সম্ভাবনা হল রানীর দেহ থেকে এই যৌন ফেরোমোন নিষ্কাশন করে তার রাসায়নিক গড়ন স্পষ্ট হবে, তার পর গবেষণাগারে কৃত্রিম ফেরোমোন তৈরি হবে যথেষ্ট পরিমাণে, তার ক্রমাগত ব্যবহারে পুরুষেরা সব মারা যাবে সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে, ফলে এক সময়ে ভাবী-রানীদের আর গর্ভ সঞ্চারণ হবে না, এই দানব পিঁপড়ের বংশ নিপাত যাবে।”

অধ্যাপকের চোখে মুখে তখন এক নতুন আভার দীপ্তি—হয়তো অন্তর্গামী সূর্য সৃষ্টি করেছে আলোর

যাহ, হয়তো তাঁর কল্পিত সম্ভাবনার আশা ঝটিয়েছে রূপান্তর। তন্ময় শ্রোতাদের মধ্যেও লাগল তার হোঁয়া।

অধ্যাপক বলে চললেন, “শুধু আমাদের মত জীব-বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে দেখলে চলবে না, পদার্থবিদরা হয়তো সম্পূর্ণ ভিন্ন কৌশল বাতলে দেবে। কত রকম সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সেন্সর বা যন্ত্রেঞ্জিয় আবিষ্কার হচ্ছে, প্রদক্ষিণরত কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে তার দ্বারা মাটির উপরে শস্ত, মাটির নীচে তেল ও অন্যান্য আকরিকের খনি ধরা পড়ছে, যেমন ধরুন অবলোহিত বা তাপ রশ্মির তারতম্য মেপে। হয়তো হেলিকপটারে চড়ে এই ধরনের যন্ত্র নিয়ে জরিপ করলে ভূগর্ভে পিঁপড়ের ভীড় অথবা রানীদের চিহ্নিত করা সম্ভব হবে। অথবা অন্য কোনও যন্ত্র মাটির নীচে কাঁপা অংশ অর্থাৎ এদের সূড়ঙ্গগুলি বাতলে দেবে, তখন এদের ধ্বংস করা অনেক সহজ হবে।...”

সূর্য ডুবে গেল। আকাশ রাঙা, কিন্তু নীচে দেখতে দেখতে আলো মিলিয়ে যাচ্ছে। বাতাসটা ঠঠাৎ পড়ে গিয়ে কেমন এক ধমধমে ভাব। তৃষিত

মরু-প্রান্তর ঘিরে নামছে শান্ত সন্ধ্যার প্রলেপ। জ্ঞানলার গায়ে আর কোনও নতুন আগন্তুক আছড়ে পড়ল না।



পর দিন এই সময়ে ঠিক এমনি সন্ধ্যা নামল, কিন্তু মরুভূমিতে তখন আবার আদিম অবিচ্ছিন্ন নির্জনতা। কয়েক দিন চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে মানুষগুলি উত্তর মুখে বিদায় হয়েছে, ঘর দোরে তালা বন্ধ, ভিতরে আছে শুধু কিছু কিছু ভারী জিনিস পত্র।

হয়তো কিছু দিনের মধ্যে হু এক জন এসে আবার তালা খুলবে, থাকবে ঘাঁটি আগলে, কড়া নজর রাখবে চার দিকে—শত্রুর চিহ্ন পেলে বা কিছু একটা ঘটলে তখনই জানাবে ‘সমর দপ্তরকে’; এই দপ্তর এখন দ্বিতীয় পর্বের পরিকল্পনায় ব্যস্ত, বিজ্ঞানীরা মগ্ন দানব পিঁপড়ে ও তাদের ফেরোমোন ইত্যাদির পরীক্ষায়। স্তব্ধ রাতে অদ্ভুত আওয়াজ শুনে নিঃসঙ্গ রক্ষী আঁকে উঠবে...হয়তো আধুনিকতম যন্ত্রে জরুরী বাতী ছুটেবে উত্তরে, কিন্তু তা হয়তো থেকে যাবে অসমাপ্ত...

শচীন্দ্রনাথ বসু রচিত

বিজ্ঞানধর্মী ও অন্যান্য গল্প সংগ্রহ

কয়েকটি ঋতু

দাম ছয় টাকা

বিজ্ঞানধর্মী উপন্যাস

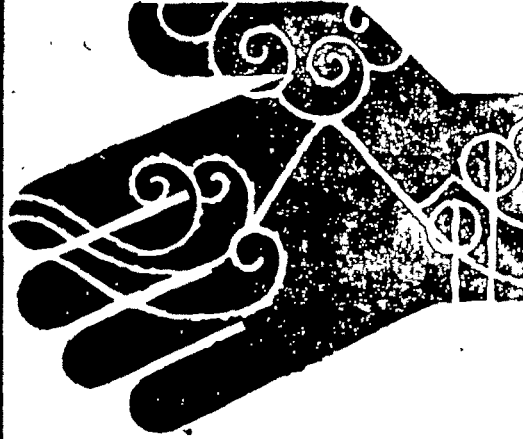
মায়াগুরী

দাম তিন টাকা

ফার্মা কে, এল, মুখোপাধ্যায়, ২৫৭ বি বিপিন বিহারী গান্ধী স্ট্রীট কলকাতা ১২

অথবা

১১, ক্যোতলা লেন, কলকাতা-২৯



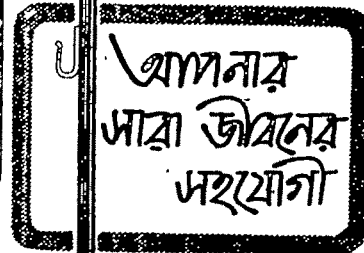
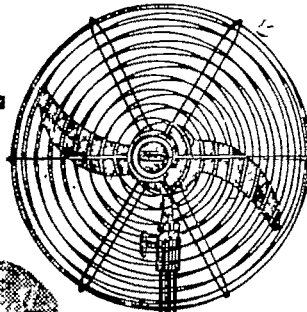
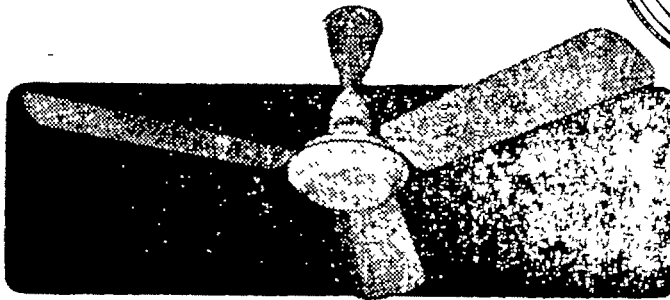
medium



পূর্ব রেলওয়ে

আকাশে শরণ। মানুষের মন
এখন মেঘের সঙ্গী। ছুটে চায়
দূর দিগন্তে যেকোনো নদী, সমুদ্র,
পর্বত, যেকোনো সৌন্দর্য এবং
সুখমা। আমরা জানি। এবং
আমরা প্রস্তুত। মানুষের আসা-
যাওয়ার পথের ধারে আমরা
বাড়িয়ে আছি হাত সাহায্যের,
সৌজন্যের, সহযোগিতার।
বিনিময়ে প্রত্যাশা শুধু একটাই।
তার নাম শৃঙ্খলা। জীবনের
চলা-হাঁটার পথে শৃঙ্খলাও এক
সৌন্দর্য।

ক্যালকাটা ফ্যান



ক্যালকাটা ফ্যান ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড
৩০, চৌমুখী রোড, কলিকাতা-১৩

কবিতা

‘সেই সাধ থেকে গেল মনে’

সদ্বিজয়কুমার মদনোপাধ্যায়

অকস্মাৎ গেলা চলি স্নকুমার-হৃদি
মাতৃহীন-মোর মাতৃসমা বড়দিদি !
শিশুকাল হতে প্রায় বছর সম্বর—
স্নেহময়ী কতকাল কাছে ছিল মোর !
রূপ আমি ! নিকটে থেকেও কতদূরে !
কোনোরূপে তুলে নিয়ে গেল তাঁর পাশে—
ভাইটিরে ‘শেষ-দেখা’ দেখাবার আশে ।
প্রত্যহ প্রত্যুষে যথা—মুদিত নয়ান—
সুভ্রশয়াপরে স্তম্ভা ! প্রশান্ত বয়ান !
এখনি জাগিবে ওকি ! খুশি হয়ে ফিরে
করিবে স্নেহেতে স্নিগ্ধ ছোটো ভাইটিরে !

কথাছিল—ভাই-বোনে লয়ে একসাথে
প্রবেশিবে শুভক্ষণে স্নমধুর প্রাতে,
জ্যোষ্ঠীকণ্ঠা-তাঁর, নবনির্মিত ভবনে—
হোলো না তা ! ‘সেই সাধ থেকে গেল মনে’ !
[প্রত্যুষ—চৌঠা ভাদ্র ১৩৮৩ ।]

সচেতন শিল্পের তাগিদে

গোপাল ভৌমিক

ভরাডুবি হতে হতে কেউ যদি বাঁচে
মনের অবস্থা তার কি যে হয় বুঝে ওঠা দায় ;
হয়তো সে আনন্দেই আত্মহারা হয়
অথবা ট্রাজেডি তার তীব্র অনীহায়
সাফল্যের মুহূর্তকে করে পরিহাস
অতীতের ভুল শুধু বাতিক বিলাস ।
অন্যহত সাফল্যের অভিশাপ আছে
আত্মসন্তুষ্টিই তার শেষ পরিণাম ;
ডোবার আশঙ্কা যদি থাকে তার মনে
তবে সে নিশ্চিত বুঝে সাফল্যের দাম
শ্রুতগতি হয়ে করে হিসাব নিকাশ
করে না সে কাটাকুটি অতীতের লাস ।
সচেতন শিল্পী হলে সব অবাস্তব
ডুবতে গিয়েও ভাসে ভোলে ঘর পর ।

প্রতীক্ষায় বসে থাকি

শান্তশীল দাশ

মাঝে মাঝে মনে হয়, হঠাৎ কখনো যদি তুমি
এসে পড় এ নিরুজ্জ্বল, এইখানে, এ আমার কাছে,
যেখানে কাটাই আমি দিনগুলো সঙ্গীসাথীহীন,
বেশ হয়, বসে বসে কথা বলে কাটাই প্রহর ।

কত কথা জমে আছে, কেউ-যে শোনার মত নেই ;
সবাই কত-না ব্যস্ত—ছোটোছুটি, কাজ আর কাজ ;
ছ’দণ্ড থাকবে কাছে, শুনবে আমার সব কথা
স্বপ্নের স্বপ্নের যত, জমেছে যা এতদিন ধরে ।

মনের সমস্ত ভার তৃপ্ত হব নামিয়ে আমার ;
কখনো হাসবে তুমি, কখনো বলবে আশির্জল
তোমার কপোল বেয়ে, ভাগ নেবে স্বপ্নের স্বপ্নের
কাছে বসে, পাশে বসে, দুটি হাত দুটি হাতে নিয়ে ।

কোনদিন পুরোনাক, হায়রে, এ কামনা আমার ;
কতকাল কেটে যায়, দেখা কত দাওনাতো তুমি,
বসে বসে দিন কাটে, মাস কাটে, বৎসর শেষ—
কোথায়, কোথায় তুমি, কবে তুমি আসবে এখানে

যে তোমার প্রতীক্ষায় বসে থাকি, সে-তোমার সাথে
কবে হ’ল পরিচয় ? কবে তুমি একান্তে আমার
হলে আপনার জন, একেবারে প্রাণের দোসর—
তাও আজ মনে কই পড়ে না তো ! তুমি কি কল্পনা !

হয়তো কল্পনা তুমি—প্রতীক্ষায় তবু বসে থাকি ;
রূপ নিয়ে কখনো কি আসবে না এ-আমার কাছে ?
শুনবে না কাছে এসে আমার মনের সব কথা ?
আমি যে এখনো বসে দিন গনি তোমার আশায় ।

এই সব ছোট ছোট দৃশ্য

নচিকেতা ডরম্বাজ

সিঁড়ি বেয়ে গিয়ে আমরা আলোকিত ঘরে বসলাম
আমরা কজন ; মুগ্ধ সমন্বিত ঘরের আয়নার
কয়েকটি মুখের ছায়া,—পিতাপুত্র—ভাইবোন—জননীর নাম
উচ্চারিত স্নিগ্ধ স্বর ; বাইরে দেয়ালে
একটি প্রকৃতি চিত্র, কয়েকটি প্রতিকৃতি, দার্জিলিং থেকে আনা
একটি বাবুইর বাসা, মানি-প্ল্যান্ট মৌন জানালায় ।

কয়েকটি চেয়ার, ছুটি নিজের নরম সোফা, ছোট্ট টেবিলে
কয়েকটি মাসিক পত্র, এক কোণে কাশ্মীরী টিপয়ে
রবীন্দ্রনাথের মূর্তি । হাওয়া-কাঁপা পর্দার আড়ালে
আলনা, আলমারি, তাক—যেন কোন সম্পন্ন নিখিলে
স্পষ্ট হয়ে তারা ! ছাখো ছাখো, কেমন নির্ভয়ে
রেডিও সেটের পরে ছরস্তু উজ্জল ঘোড়া সংহত গতির
দ্রীপ্রশুর তুলে আছে । রজনী গন্ধার
এক গুচ্ছ মৃন্ময় গেরুয়া পাত্রে । রাস্তাপথে জনতার ভিড়
ট্রাম বাস ট্যাক্সির—আরো নানা মগ্ন কোলাহল ;
অতন্দ্র আলোর মধ্যে নিবেদিত কয়েকটি অতল দৃশ্যের
এই সব স্বরলিপি—জীবনকে ঠিক ধরে আছে
নিরঙ্কর আধারে কাঁপছে কয়েকটি আলোর পঞ্চল ।

এই সব ছোট দৃশ্য দিয়ে বাঁধা আমাদের
অন্তঃপুর সেখানে এলেই মন মুগ্ধতার কাছে
সমর্পিত হতে থাকে—অথচ এ স্থান কাল এবং পাত্রের
পরিচয় মুছে ফেললে কারো কোনো অর্থ থাকে না ।
নিরন্তর মরুর যাত্রী—মাঝে মাঝে মুছ ওয়েসিস্
সবুজ লাবণ্যে তার আমাদের একান্তে ডেকেছে ;
চারিদিকে ঘন হয়ে এসেছে কি শাস্তির প্রাবৃষ !
ছরস্তু তাতারী অশ্ব সেও ছাখো স্থির হয়ে এসে
কী এক হ্রের উৎসে দীর্ঘ যাত্রা বৃষ্টি ভুলে গেছে ॥

মেঘভাঙা

মানস রায়চৌধুরী.

আমাকে সমস্ত ভুলে যেতে বলেছিলে
নিজে কিন্তু সব কিছু রক্তের অক্ষরে গঁথে রাখো
কবে মেঘ হয়ে পড়েছিলো এই বাগানে কখন সমুদ্রের
উদাসীনতার স্বপ্ন বয়ে এনেছিলো গাঙ চিলে
অথবা আমার ছায়া, সব জীক্ষেতে, দিনান্তের সাঁকো
ছিন্ন ছবি, বর্নিল ছবির তাপ সব ভুলে যেতে
বলেছিলে, কিন্তু নিজে সব কিছু নিয়েছো ব্যাকুল হাত পেতে।

এখন দিনের শেষে রক্তিম ফুলের দীর্ঘ ফাঁদ
ছিঁড়ে ফেলে চিমনির পাশে উঠে আসে মস্ত চাঁদ
জলাধারে ছায়া পড়ে যেন পৃথিবীর আত্ম স্বর
আকাশ ও ভূমণ্ডল গ্রাস করে দিয়ে যায় চূড়ান্ত খবর।

তুমি বলেছিলে তাই সব ভুলে যেতে আমি হয়েছি প্রয়াসী
যা কিছু নিজের ছিলো তাও গৃহস্থের হাতে তুলে দিয়ে আসি
তুমি বেশ, চুহাতে সমস্ত ছবি স্মৃতি ও বিস্মৃতি ঘোর বসন্ত আগুন
অশ্রু থেকে তুলে আনা বাঁচা ও মরার শুভ্র মুন
ধরে আছো, মুখভঙ্গী খুব চেনা ব্যঞ্জনায় রাঙা
কেমন সুন্দরী ছিলো আমাদের দিনরাত্রি অর্থহীনতায় চাঁদ দৃষ্ট মেঘভাঙা।

ସ୍ମାର୍ତ୍ତ ରୋଡ଼ିଓ

ଶରତ୍ ଏସେହି ଆଲୋ ହାସି ମାନ
ଆଉ ଉତ୍ସବର ବାରତା ନିୟେ
ଏହି ଆନନ୍ଦ ଲାଗ୍ନେ ପ୍ରହମ କରନ୍ତୁ
ସ୍ମାର୍ତ୍ତର ଶୁଭେଚ୍ଛା



ଦେବସନମ୍, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍

କଲିକତା • ମାଟିନା • କଟକ • ଗୌହାଟୀ • ଉତ୍କଳପୁର

BEVAS/787

কলকাতা : ১৯৭৬

শংকরানন্দ অরুণোপাধ্যায়

১. ফিনিক্স

শুধু জালই নেই যেন খোলা চিড়িয়াখানাই
একটা খাঁচার মধ্যে রঙবেরঙের পাখিটাখি
একবার এদিক যায় একবার ওদিক

দানাপানি খান্দা করে সারাদিন

এ খাঁচার বয়স কত পাখিঅলা জব চার্ণক

স্বপ্নে বাঁড়ুজ্জের রোড, খাঁচার বয়স কত হল ?

পাখিদের বয়সের কুলপাথর নেই

একজন কেওড়াতলায় পুড়লে

দশজন গঞ্জিয়ে ওঠে সেবাসদনেই

এ পাখি ফিনিক্স যার ছাই থেকে অনেক, অনেক পাখি

ফিনিক্স পুরাণে নয়, কলকাতায় ছিল

ফিনিক্স কলকাতার মানুষ।

২. পথে গাছ বসাই

কেন, পথে পথে আমরা গাছ বসিয়ে

প্রত্যেকটি ছেলেকে বলবো খুব সকালে মাটি কুপিয়ে যেও

প্রত্যেকটি মেয়েকে বলবো এক ঘটি জল ঢেলো বিকেলবেলায়

এবছর গাছ হলে ওবছর ফুলফুটবে আর তার পরের বছর

মাল্লাগুলি ছলতে ছলতে স্থির হবে দুজনের উন্নত গলায়।

৩. যার যেখানে

যার যেখানে ছাদ আছে যার যেখানে উঠোন কার্নিস

সেখানেই টবের ওপর পুঁইমাচা, কুমড়া ফুল

বই পড়ে পড়ে ছবি দেখে আর কতকাল চলতে পারে

ছেলেরা দেখুক ফুল, দেখুক বাংলার টুকরো

শুধুই কিচেনগার্ডেন কিংবা সমাজশিক্ষণ নয়

আমাদের গাছ গাছই, তাতে যসে অমর মৌমাছি
তাতে এসে জুটবে প্রজাপতি।

৪, রাস্তার ধারে ধারে

আমি রাস্তার ধারে ধারে রেলিং বসিয়ে
মেয়েদের বলবো ডুরে কাপড় শুকোতে
হাওয়ায় হাওয়ার উড়ে চারিদিক রঙিন, রঙিন
ভেজা কাপড়ের গন্ধে ট্রাম-বাসও ঝরঝরে হবে
মনে হবে ট্রামের ধাক্কায় মরতেন না একজন কবি
মনে হবে মেয়েলি হাতের স্পর্শে রূপসী বাংলার এই
বিশাল পরিধি।

৫, কলকাতার উত্তি

এবার আমায় ছুটি দাও
একটা বিস্কুবিয়াস যদি থাকতো, ও :
আমি পম্পিয়াই নগরী ছাইয়ের ভিতরে
পৃথিবীর নিরীহতম জীব কবি-হরিণদের ভোঁতা শিং নিয়ে
পাশা খেলতাম

কিন্তু ধোঁয়ায় কিছু কি দেখা যেত
পুড়তো ব্যবসার কাগজ, মাথার সি-লাগা বইটাই
পুড়তো কাব্যটাবি ফর্মুলামাফিক
সংস্কৃতি পুড়ে যেত
উচ্চ বাড়িগুলির মাথা পর্যন্ত উঠতে উঠতে
মাঠ ভরে যেত ছাইয়ে
ছাইয়ের নরম বিছানায় আমার বিশ্রাম
হাঁক ছেড়ে বাঁচতাম কিছুকাল।

টিউলিপ

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

রাত না পোয়াতে উঠে আসি;
জানলায় শিশিররূপোলি লেগে। তিরস্করণীর
জাল ছিঁড়ে ফুটে আছে সত্য টিউলিপ! কলকাতায়
কবে এল? বিদেশী মুদ্রায় কেনা এতখানি রক্তস্পন্দন....

অরেঞ্জপিকোর মুখে মায়াবি ডালপালা
নীহার হাওয়ায় দোলে গৃহদয়িতার
যে স্মৃতিটুকুনি ফিরে ফিরে পড়ি রোজ বিজ্ঞাপনে
সেই রঙ — পাশাপাশি ভাড়াটে বাড়ির বোবা মুখ — সার সার
মোরগচূড়ার মতো....মনে পড়ে পরের কারণে
স্বার্থবলি দেওয়া বাকি রয়ে গেছে, সঁহিবাবার কুপা
পাওয়া হয় নি, আরো ঢের—জীবনের শতপ্রস্থ স্বর্ণ
ঝাঁকায় — ঝাঁকায়—আধো তিরস্করণীর

জাল ছিঁড়ে সদ্য টিউলিপ....
রোজ ফুটে ওঠো নাকি? অপেক্ষাআকুল কিশোরীর
চালে-বাওয়া লতার আড়ালে? মানুষের গায়ে গায়ে ঢাকা পড়া
কিশোরীর মতো? আমি দেখতে পাই না।

ষড়ির পকেটে চাপ, হুহু-ছোট্ট বাস — আমি তারও
হেডলাইটের আগে—ক্রমাগত শহর ডিঙিয়ে আরো বড়
শহরের ঘেরে দ্রুত ঢুকে যাই, অরেঞ্জপিকোর
গোলাপী মাড়িয়ে জমে জমে ওঠে মানুষ মানুষ

ধর্মাস্ত্র মানুষ, আমি তিরস্করণীর
ঘন বুকচাপা জালে হাতড়াই হাতড়াই বাতাসের
মায়াবি ডালপালা—বাধাবদ্ধহীন আকাশ অবধি
সার সার মোরগচূড়ার মতো ভাড়াটে বাড়ির বোবা মুখ

নৃকৃপাতবিহীন ; দেখ, তাকাও আমার দিকে, একবার চাও ! চাপ চাপ
মানুষের ভিড়ে আমি খুঁজে ফিরি মানুষের মুখ
মানুষের মুখে আমি খুঁজে ফিরি আমার ছ-চোখ....
জীবনের শতপ্রস্থ স্থল

ঝাঁকায়-ঝাঁকায়... আমি ভিথিরির হাত দেখে দ্রুত
সরে আসি, আমার হাত থেকে বারবার
ধুয়ে ফেলি ভিথিরির হাত !
সুমঙ্গল সেয়ে

রাত না পোয়াতে উঠে আসি ;
জানলায় শিশিররূপোলি লেগে । তিরস্করণীর
জাল ছিঁড়ে ফুটে আছে সত্তা টিউলিপ ! কলকাতায়
কবে এস ? বিদেশী মুদ্রায় কেনা এতখানি রক্তস্পন্দন...

একালের একজন দুর্ধর্ষ কবি প্রচণ্ড আছাড় খেলেন ভিড়ের ট্রামে চড়তে গিয়ে। মুখ
দিয়ে যা বেরোল তা ছন্দময় কাব্য নয়।

আরেকজন শিল্পী বর্ষায় হাঁটু জলের মোকাবিলা করতে গিয়ে একপাটি চটি হারিয়ে
ফেললেন। আরেক পাটিকেও বিসর্জন দিয়ে অনেকটা শ্মশান-যাত্রীর মত বাড়ী ফিরলেন।

কলকাতার এই পরিচিত চিত্র। বদলায়-না, কবি শিল্পী, সাহিত্যিককে খাতির করে না।

তাইলেও কবির এই কলকাতার আকাশেই চাঁদ দেখেন। শিল্পীর এই ফুটপাথেই হবি
আঁকেন। কলকাতার মায়া বড় মায়া।

দলবেধে একদল শিল্পী একবার সি. এম. ডি. এ-র চেয়ারম্যান শ্রীভোলানাথ সেনের আফিস
চড়াও করলেন। কলকাতাকে সুন্দর করুন, তাঁদের দাবী। শ্রীসেনের জবাব, সুন্দর হয়নি ?
মুখচাওয়া-চায়ির পালা শেষ হলে আলোচনা হল অনেকগুলো রাস্তা চওড়া হয়েছে, কয়েকটি সেতু
তৈরী হয়েছে, জলের সরবরাহ বেড়েছে, বর্ষায় জল-জমলেও বেশীক্ষণ দাঁড়ায়না, আর বস্তীগুলিরও
পরিবেশটা অনেকটা স্বাস্থ্যকর হয়েছে।

সেকাল হোক-একাল হোক, পাকাচুল বা লম্বাচুল হোক শিল্পীদের দাবী, আরো সুন্দর
হোক কলকাতা, ভাস্কর্য্য তৈরী-হোক, হবি আঁকা হোক, সবুজ সবুজ উদ্যান হোক।

হোক তাতে আপত্তি নেই, শিল্পীরা করুন তাতে আপত্তি নেই, সবাই একসঙ্গে করুন
তাতেই বা বাধা কোথায়, কিন্তু সুন্দর শিল্প আকর্ষণের শহরে ঠিক খাপ খায়না, তাই চেষ্ঠা, তাই
কর্ম-প্রয়াস আর তাই সি. এম. ডি. এ।

কলকাতা কখনো তুমি কল্লোলিনী হবে ?

সৌমিত্রশংকর দাশগুপ্ত

কলকাতা কখনো তুমি কল্লোলিনী হবে ?

বিশ্বস্ত তোমার গান বহুতর বিরুদ্ধ কোরাসে

সুরলোক ছিন্ন ভিন্ন করে ।

উর্ধ্বাশ তোমার উত্তাল জনশ্রোত

সাধ্য নেই তুমি তারে নিয়ে যাবে উজ্জল সমীরে ।

ধূম্রজ্বলে ধূসর আকাশ

শ্বেদগন্ধে ভারাক্রান্ত অগণ্যের প্রিয় সে আবাস

বিপর্যস্ত মানবতা সেইখানে বিলুপ্ত রৌরবে ।

তবুও তোমার দর্প

স্পর্ধাভরে হোঁয় যে আকাশ

মেদক্ষীত বিক্ষিপ্ত প্রাসাদে

দিনে দিনে তুমি ব্যাপ্ত

যদিও তোমার বৃদ্ধি

স্বপ্নমা মণ্ডিত রূপে কোনোদিন হল না প্রকাশ ।

তোমার উদ্ধার যেই

সৃষ্টিনাশা ধারাজলে সম্পূর্ণ না হলে ভরাডুবি ।

কলকাতা সেদিন তুমি হয়তো বা হবে কল্লোলিনী ।

তাকে শুধু হুঃখে রেখো

বাসুদেব দেব

ভালো রেখো সকলকে খুব ভালো রেখো

আমার জন্তে ও রেখো আধখাওয়া চাঁদ

ঝাউগাছে স্মৃতির বাতাস

উঠোনে সামান্য জ্যোছনা

জ্যোছনার ভিতরে সে পাখি

অথবা একাকী

আমাকে রাখুক বেঁধে আধ ভোলা গানের কলিটি

বহুদিন লেখে না সে চিঠি

তাকে শুধু হুঃখে রেখো

যেমনটি রেখেছ আমাকে

আর সব যেন ভালো থাকে

যে স্বাদ
সকলের
মুখে মুখে



ভার্জিনিয়ার স্বাদ—
উইলস্‌ নামের মর্যাদা রাখে

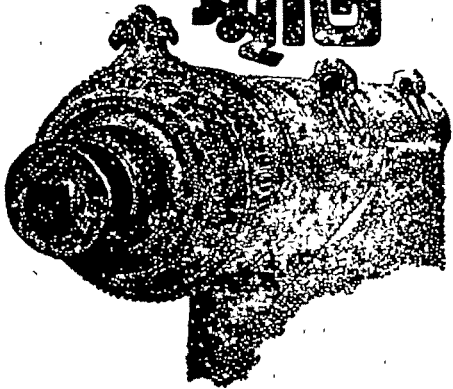


বিধিসম্মত সতর্কীকরণ, সিগারেট খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর

STATUTORY WARNING: CIGARETTE SMOKING IS INJURIOUS TO HEALTH

WVF 6801

দুর্মন্দ
আহানকোষা
আজ
অতীতের
স্মৃতি



জাহানকোষা। নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর সেরা
হাতিয়ার। আজ অতীত গৌরবের স্মৃতিমান্ন।
অতীতের মুর্শিদাবাদ—ঐশ্বর্য অমর বিলাসের
লীলাভূমি। যেখানে অতুলনীয় দেশপ্রেম আর
মুগ্ধতম যত্ন একই সঙ্গে পাশাপাশি চলেছে
সমান পতিতে। এখানে ছড়িয়ে রয়েছে
অজস্র স্মৃতিসৌধ, যা আপনাকে মনে করিয়ে
দেবে নবাবী বাউলার গৌরব-গীতা আর তার
পতনের বেদনাময় ইতিহাস। এছাড়াও
আজকের মুর্শিদাবাদে আপনি পাবেন অতীত
ঐতিহ্যের স্মারক সূক্ষ্ম কারুকার্যে অসাধারণ
হাতীর দাঁতের জিনিস পত্র আর সিলেক্টর শাড়ি।
আজই চলুন মুর্শিদাবাদ। দেখে নিন নবাবী
আমলের গৌরবোজ্জ্বল স্মৃতি।

রাষ্ট্রবাসের জন্য রয়েছে বহরমপুর ট্যুরিস্ট
লজ। সেখানে পাবেন আধুনিক স্বাস্থ্য আর
আরাম। বুকিং-এর জন্য যোগাযোগ করুন :
রিজার্ভেশন কাউন্টার, ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্যুরিজম
ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন, ৩/২, বিনয়-বাদল-
দীপেশ বাগ (ইস্ট), কলিকাতা-৭০০ ০০৯
অথবা ম্যানেজার, ট্যুরিস্ট লজ।

দিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন :
ট্যুরিস্ট বুটেল
৩/২, বিনয়-বাদল-দীপেশ-বাগ (ইস্ট),
কলিকাতা-৭০০ ০০৯
ফোন : ২৩৮২৭৯ গ্রাম : TRAVELTIPS
পণ্টম বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

TC/TS 230A2R76

একবিংশ শতাব্দীর কোলকাতা কেমন হবে ?

ডঃ সুধেশ্বর মধুপাধ্যায়

বিংশ শতাব্দীর Charm যেন ফুরিয়ে গেছে, সবাই কেমন অধৈর্য্য হয়ে পরেছেন, কবে একবিংশ শতাব্দীর সূর্যোদয় ঘটবে। বেশ কিছুদিন আগেও ঊনবিংশ শতাব্দীর রেনেশাঁর স্বপ্নে মশগুল ছিলাম, তারপরে হালে রেনেশাঁ-নায়কদের শ্রেণী চরিত্র নিয়ে অনেক কাঁটাই ছেঁড়াই করলাম খুব একটা কুলকিনারা পেলাম না, তাই এবার সবাই মিলে ২০০১ খ্রষ্টাব্দের দিকে চাতক পাখীর মত চেয়ে আছি—যদি একটা হিল্লো হয়ে যায়, আর সফল হয়না বিংশশতাব্দী।

শতাব্দীর কথা বলতে গেলে তত্ত্বের কথা বলতে হয় কারণ ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর সন্ধিকালে আমরা পেয়েছিলাম বন্ধিমন্ত্র, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, অবিন্দ প্রমুখ মনীষীদের। তাঁদের সব ভবিষ্যদ্বাণীই যে সত্য প্রমাণিত হয়েছে এমন নয়, কিন্তু তাঁরা সমাজ এবং মানুষের মনকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিলেন—সেটা বোধহয় বিগত শতাব্দীর রেনেশাঁর শেষ রশ্মি। অনেক ছড়িয়ে বলতে গেলে হয়ত বলা উচিত, চলতি শতাব্দীর প্রারম্ভে জাপানের হাতে রাশিয়ার পরাজয় গোটা এশিয়ার ভাগ্যকে অনেকটা উজ্জ্বল করে তোলে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন আর তৎপরবর্তী সম্রাসবাদী-বিপ্লবী আন্দোলনের উন্মেষ এই দশকেই হয়, যার পরবর্তী ধাপ ছিল বাঘা যতীনের নেতৃত্বে জার্মান অস্ত্রসহযোগে স্বাধীনতার লড়াই—সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিলেন ভারতীয় বিপ্লবীরা, পথের আর-রসদের সন্ধান—লক্ষ্য এক স্বাধীনতা। রাশিয়ার পরাজয় পরবর্তী দশকের রুশ বিপ্লবের সম্ভাবনাকে ত্বরান্বিত করে। তারপরে জলে গুঁতে প্রথম মহাযুদ্ধের দাবানল—ইউরোপের ভূগোল তালগোল পাকিয়ে যায়, জন্ম নেয় নতুন নতুন রাষ্ট্র আর সফল হয় স্বল্পপ্রসারী সম্ভাবনাময় রুশ বিপ্লব। চলে গেল দ্বিতীয়দশক, তৃতীয় দশকে গোটা

এশিয়া ছুড়ে স্বাধীনতা আন্দোলনের জোয়ার বয়ে চলল, যে জোয়ারের ঢেউ শেষে এশিয়া ছেড়ে আফ্রিকাকেও ধাক্কা দিল। ত্রিশ দশক পেরোতে না পেরোতেই আবার ইউরোপে রণদামামা বেজে উঠল—বাঘাযতীন যদি প্রথম মহাযুদ্ধের স্বযোগ নিতে গিয়ে বালেস্বরে আত্মোৎসর্গ করেন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে স্বযোগ সন্ধানী স্বভাবচক্র তাল গুনতে থাকেন, অকস্মাৎ '৪১ সালের ১৬ই জামুয়ারী মারুঝাতে পাড়ি দেন ইউরোপের পথে, চোখে লেই এক স্বপ্ন স্বাধীনতা।

৪০-দশকের মাঝপথে ধামল মহাযুদ্ধ, আবার ইউরোপের রাজনৈতিক মানচিত্র পালটালো আর কালবৈশাখীর ঝড় উঠল ভারতে, ব্রহ্মে, ইন্দোনেশিয়ায়, চীনে, অর্ধশতাব্দীর চরম আত্মবলিহান আর অসুত শহীদের রক্তমোক্ষনের ফলশ্রুতি হিসেবে এল দেশে দেশে স্বাধীনতা আর চীনে বিজয়ী হল মাও-সে-তুঙ। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের যবনিকা পড়ল।

৫০ দশকে নেহেরুর নেতৃত্বে দেশ পূর্ণগঠনের ভেরী বেজে উঠল, আধুনিক শিল্পায়নের শিলাস্তাস করলেন তিনি—ইস্পাত, খনিজ তেল, জলবিদ্যুত আর অজস্র ভারী শিল্পের ভিত্তি স্থাপিত হল, যার প্রচণ্ড সম্ভাবনাময় ভবিষ্যত আজ ভারতের দিগন্তকে উবার রক্তিমায় লাল করে দিচ্ছে। যদি শতাব্দীর প্রথমার্ধে আমাদের মনীষীরা চুলচেরা মূল্যায়ন করে থাকেন। দেশ স্বাধীন হবে কি দরখাস্ত পেশ করে, না অস্ত্র ধরে বা আর্দ্রো স্বাধীন না হয়ে ইংলণ্ডের গাউনের নীচে Dominion Status-এর তল্লি নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে, শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে শুরু হল তুমুল তর্কের ঝড়, উন্নতি কোন পথে, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র না কোন মিশ্র তন্ত্রের মাধ্যমে, আবার শতধা বিভক্ত হল ভারতবর্ষের রাজনৈতিক কাঠামো, যার

টেটে প্রতিদিন আছড়ে আছড়ে পড়ছে ভারতের প্রতিটি সীমায় পরিসীমায়, প্রতিটি ঘটনার আলোড়ন—বিলড়নে। ইতিমধ্যে ষাট দশকে পৃথিবী আরো পালটালো, গোটা আফ্রিকা মুক্ত হল, আমেরিকার ভিয়েতনাম নব্ব্বয়ের অবসান হল, তারপর মাথা তুলে দাঁড়াল আরবরা—চড়া দামে তেল বেচে মধ্যপ্রাচ্যের চেহারা পাণ্টে ফেলল। এই পরিবর্তিত বিশ্বপরিপ্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে আছে ভারত, কোলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যত কি কোনো আলাদা দাঁড়ি পাল্লায় মাপা যায়—পাঁচটা মহাসাগর আর পাঁচটা মহাদেশ, সবই তো আজ এক প্রচণ্ড পরিবর্তনের মুখে দাঁড়িয়ে আছে। ভারত আর কোলকাতা এই বিশ্বের সাথে তাল রেখেই চলবে। কোলকাতার ভবিষ্যতকে যারা শুধু নদমা-খাটাপায়খানা আর খাটাল অপসারণের পরিপ্রেক্ষিতেই দেখেন, তাদের চোখে কি শতাব্দী-সাধনার সৌম্য মেজাজ আছে? দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসছে, শতাব্দীর গোড়াতে যদি সত্যেন বোস আর মেঘনাদ সাহা আইনষ্টাইন আর মহাকাশ বিজ্ঞানীদের সমচারিতা করে থাকেন, তবে আমাদের এখনকার চিন্তা কেন এই বন্ধায়ে এসে দাঁড়িয়েছে যে আমরা একটা বলিষ্ঠ সন্তানবানায় পশ্চিম-বঙ্গে আর কোলকাতার কথা ভাবতে পারি না—এটাই আজ বেশী করে ভাবতে হবে, আর পঁচিশ ছাব্বিশ বছরে কোলকাতার পরিবর্তন কোন পথে হবে।

কোলকাতার ইতিহাস লিখতে গিয়ে কেউ জব চার্ণকের নৌকো ভিড়ানো থেকে শুরু করেন এবং সেদিন মধ্যাহ্নে অর্থাৎ ১৬২০ খৃষ্টাব্দের ২৪শে আগষ্ট মূলধারে বুষ্টি পড়ছিল বলেই কি চার্ণক সাহেব স্থানটিতে নোঙর ফেলতে বাধ্য হয়েছিলেন, এ জাতীয় তথ্য নিয়ে মাথা ঘামান। তারপর অবশ্য অনেক জল গঙ্গা দিয়ে বয়ে গেছে কিংবা বইতে বইতে থেমে গিয়ে কাটোয়া থেকে কব্বাক্ষা পর্যন্ত চড়া পড়তে শুরু করেছে। সেই সূত্রে কোলকাতার অভ্যুত্থানে গঙ্গা তথা বন্দরেব ভূমিকাকে তুলে ধরেন। এই প্রশ্নটাই তখন কি ছিল আব এখন কি হয়েছে এটা ক'জন মনে রাখেন? সিরাজদৌলার মার খেয়ে ছ' একবার চার্ণক সাহেব চট্টগ্রামে

পালাতে বাধ্য হয়েছিলেন আর তেমন সময় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিলাতী মালিকেরা চট্টগ্রামেই ঘাঁটি গাড়তে বলেছিলেন। আবার কেউ পরামর্শ দিয়েছিলেন মাতলা নদীতে ক্যানিং এর কোন স্থানে ঘাঁটি গাড়তে, কারণ মাতলা তখন গঙ্গার চেয়েও বড় নদী ছিল, কিন্তু মাতলাতে চড়া পড়ার আশংকা ছিল আর হয়ত পরাজয়ের মানি মোচনের নেশাতেও চার্ণক সাহেব, বিলাতী উপদেশ অগ্রাহ্য করে স্থানটিতেই ঘাঁটি গাড়লেন। তারপর বন্দরকে অবলম্বন করে কোলকাতা অনেক বড় হতে থাকল কিন্তু পূবদিকের নদী বিজ্ঞধবী ধীরে ধীরে মজতে থাকল, শেষে তিরিশ দশকের শেষাংশে একেবারে জলপ্রবাহ রুদ্ধ হল, মাতলাও মজতে থাকল, কোলকাতার ময়লাতে। সাথে সাথেই চলতে থাকল গঙ্গার “অবক্ষয়,” ঠিক অবক্ষয় নয়, সরাট হতে থাকল নাগরের পলিতে। তারপর গঙ্গার ওপর দিকের প্রবাহ বন্ধ হল আর খিদিরপুর বন্দরের নান্দিস্বাস উপস্থিত হল, বড় জাহাজ আসা বন্ধ হল বহিবাগিছের ক্রমবর্ধমান গতি। বোম্বাই ছিনিয়ে নিল কোলকাতার সম্পদকে, অগ্রদিকে যে চা আর পাট রপ্তানীকরে কোলকাতা বড় হয়েছিল তারও প্রতিদ্বন্দী দাঁড়িয়ে গেল পৃথিবীর দেশে দেশে—কেনিয়া আর শ্রীলঙ্কাও চা বানাতে থাকল, আর সিনথেটিক্স (কৃত্রিম তন্তু) এর দৌলতে পাটও মার খেতে থাকল, পূর্ব পাকিস্তানও পাল্লা দিল—এইভাবে খিদিরপুরের ভাগ্য বিলীময়ান হতে থাকল। কিন্তু আমরা অনেকেই হয়ত খবর রাখিনা যে ফরাক্কার জল-ধারায় গঙ্গা আবার প্রাণবতী হয়ে উঠেছে আর হলদিয়াও মাথা তুলে দাঁড়াতে শুরু করেছে। তাহলে কি বলতে পারি কোল-কাতার বন্দরের সমস্যা হুচেছে? কিন্তু চা আর পাট আগের মতো তো বিকোচ্ছে না। কেন আর চা আর পাট উৎপাদন বাড়াতে মনোযোগ দিলাম না, কেন পাটজাত সিনথেটিক্স তৈরীতে উৎসাহ দেখালাম না, যদিও একজন বাঙালী কেমিষ্ট এই ব্যাপারে অনেকদূর সফল হয়েছিলেন। অপরদিকে ছ'শ বছরেব ইউরোপমুখী রপ্তানী ধাবা আজ যে বদলাতে শুরু করেছে, সেটাও সমযমত বুঝতে চাইলাম না। আফ্রিকার প্রায় তিরিশটা দেশের তিরিশ-চল্লিশ কোটি মানুষ

১৬৪-৩ একবিংশ শতাব্দীর কোলকাতা কেমন হবে ?

আজ জীবনধারণের মানউন্নয়নে অধীর হয়ে পড়েছেন, তাদের সাথেও তো আমরা বাণিজ্য করতে পারি। আরও আছে তেলের ঐশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যময়ী আরব দুনিয়া, তারাও আজ উজার করে দেশে দেশে সওদা কিনে বেড়াচ্ছেন, আমরাও সে বাজারে চুকতে শুরু করেছি। আরও আছে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বাজার, আছে জাপান—চীনের বাজার,—তাদেরও হ হ করে অর্থনৈতিক উন্নতি হচ্ছে তারাও কিনছে আমাদের জিনিষ, কয়লা, আকরিক লোহা, রেলের ওয়াগন, জামকাপড় ইত্যাদি। তবে কোলকাতা বন্দর বহিবাণিজ্যে মার খাবে কেন ?

শুধু কয়লা, লোহা আর খনিজ তেলের কথাই ধরা যাকনা কেন ৬০ সালে ৫২ মিলিয়ন টন কয়লা উৎপাদন হত আজ লেটো ১১০ ছাড়িয়ে গেছে আর সারা ভারতবর্ষ জুড়ে অজস্র নতুন কয়লাখনির সন্ধান মিলছে, এমন কি বাঁকুড়ার যেজিয়াতেও প্রচুর কয়লার সন্ধান মিলেছে, কয়লার মোট উৎপাদন সত্তাবনা আজ ভারতকে বিশ্বের প্রথম সারিতে নিয়ে আসছে, তারমধ্যে আবার বঙ্গ বিহার সীমান্তের কয়লা সম্পদই গোটা ভারতের শতকরা ৮০ ভাগ। খনিজ তেল—গোটা ব্রিটিশ যুগে শুধুমাত্র ডিগবয় আর আটকেই সামান্য তেল পাওয়া যেত আর আজ মাত্র ১৫ বছরের চেষ্টার ফলেই গোটা ভারত জুড়ে অসংখ্য তেলের খনি আবিষ্কৃত হচ্ছে, যেন এই তেলের খনিগুলি শিউলী ফুলের মত হঠাৎ গজানো, আমরা কি জানিনা, তেল ভূগর্ভে সঞ্চিত হয় যুগাভীত কাল থেকে ভূতাত্ত্বিক নিয়মে, ইংরেজরা খুঁড়তে দেয়নি আর প্রেসিডেন্সি কলেজের পাশ করা জিওলজিষ্টরা কাঁচের আলমারীতে ঢাকা এবং ব্রিটিশ সাহেবদের পুরোনো কয়েকটা হুড়িপাথর অবলোকন করাকেই ভূতত্ত্বের শেষ তত্ত্ব বলে জানত, আর আজ O.N.G.C.-র সেই ভারতীয় ভূতাত্ত্বিকেরাই কি মন্ববলে পাহাড়ে, সমুদ্রে আর জঙ্গলে খনিজ তেলের আবিষ্কার করে যাচ্ছেন ? না, সত্যিকারের ভূতত্ত্বের বিকাশ ঘটবে না ঠিক তেমনই উদ্ভিগ্ণা, মধ্যপ্রদেশ ; বিহাবের জঙ্গলে জঙ্গলে আবিষ্কৃত হচ্ছে লোহার খনি, আমরা অবশ্য তার অনেকটাই

বেচে দিচ্ছি জাপানকে, না ইম্পাত তৈরী করে, না মেশিন তৈরী করে।

খনিজ তেল পাওয়া যাচ্ছে গোটা আসাম জুড়ে, মেঘালয়ে অরুণাচলে, নিশ্চিত সম্ভাবনার কথা শোনা যাচ্ছে বঙ্গোপ-সাগরে, করোমণ্ডল উপকূলে, কাবেরীর মোহনায় আর ফোয়ারার মত উপচে পড়ছে গোটা বোম্বাই উপকূলে, যার নাম Bombay High. চেষ্টা করলে ৮০ দশকে ভারত তেল আর পেট্রোকেমিক্যাল সম্পদে যুগান্তর ঘটাতে পারে—যে দেশে যুগ যুগ ধরে রেড়ির আর সরষের তেল ব্যবহার হচ্ছে, সেদেশের পক্ষে এর চেয়ে রোমাঞ্চকর ঘটনা আর কি হতে পারে ? সব মিলিয়ে তাহলে বলা যায়, কয়লা, তেল আর লোহা আর তাদের সহস্র derivatives—এতেই ভারতবর্ষের শিল্পায়ন কল্পনাভীত বেগে এগিয়ে যেতে পারে, এর সাথে যদি যুক্ত হয় জল—আর তাপ—বিদ্যুত আর তাদের দেশ জোড়া Transmission লাইন এর জাল, তাহলে দেশের প্রতিটি ইঞ্চি জমিতে অঙ্কুরিত হবে বছরে কম করে তিনটে ফসল। এভাবেই ঘটবে কৃষি-শিল্পের মণি-কাঞ্চন যোগ। চাল উৎপাদনে সীমাহীন অগ্রগতি ঘটছে, গমে সব আগেকার রেকর্ড হান হয়ে যাচ্ছে, ডাল, তেল, বাদাম, আখ, আম, নানা-জাতের ফল, সবজী আর তুলোতে একটু চেষ্টা করলেই যুগান্তর ঘটানো যায়।

এই সব সম্ভাবনার পশ্চিমবঙ্গীয় রূপটা কি হবে ? কল্পনা করা যাক বাঁকুড়ার কয়লা পুড়ছে সানতালডিহির বৈদ্যুতিক চুল্লিতে আর সেই বিদ্যুত-চালিত হাজার হাজার গভীর নল কূপ বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূমের উষর মাটিতে ফলাচ্ছে হাজার বকমের নতুন ফসল। কংসাবতী, শীলাবতী, কৈলেশাই এই সব বর্ধমান দামাল নদীকে বেঁধে বিদ্যুত বানানো হচ্ছে আর তাতে D. V. C. যে ভাবে বর্ধমানকে শস্ত্রশ্রামলা করছে ঠিক তেমনই উজ্জল হয়ে উঠবে মেদিনীপুরের কৃষি। তেমন ভাবেই বাঁধা হবে মহানন্দা, তোড়বা আর তিস্তাকে, অবশ্য এখন যেভাবে বাঁধা হচ্ছে সে ভাবে নয় অর্থাৎ উত্তরবঙ্গে লক্ষ লক্ষ চাষীর জীবন ভাসিয়ে দিয়ে শুধু কয়েকজন কণ্ট্রাকটরই প্রতিবছর বাঁধ বেঁধে চলেছেন আর শাসালো হয়ে উঠছেন।

তেমনভাবেই নিয়ন্ত্রণ করা যায় গঙ্গা আর দক্ষিণ বঙ্গের অসংখ্য নদী নালাকে—গঙ্গা সেদিনও লুকিয়ে ছিল, আজ হিমালয়ের শীতল মিষ্টি জল ফরাঙ্কার বাঁধের ফাঁক দিয়ে গঙ্গার মরাগাঙে বান এনেছে, শুধু বান নয় এসেছে মিষ্টি জল, কাটছে নোনা আর ডায়মণ্ডহারবার পর্যন্ত চাষীরা নোনা কেটে যাওয়া মিষ্টিজলকে চেটে চেটে দেখছে, এই জলকে চাষের কাজে লাগানো যায় কিনা। হ্যাঁ, চেটে চেটে দেখছে, কারণ তারাতো Geology পড়েনি, তাদের তো Hydrological Laboratory নেই, তাই হঠাৎ যখন তাদের চোখে পড়ল, জমিতে সবুজ ঘাষ গজাচ্ছে, যে জমিতে নোনাতে সব জলে যেত, তাই দেখে তাদের চোখ জলে উঠল, কই কোনদিন তো এঁ জমিতে ঘাষ গজায়নি; তবে কেন ঘাষ হল। বাংলা-দেশের ক'জন জানে যে গঙ্গার দু'পার বেয়ে কোলকাতার আশেপাশে যে গ্রামগুলি আছে, সেখানকার মানুষ ফরাঙ্কার আসার সাথে সাথে নতুন করে বৃকে ধল পাচ্ছেন, তাদের শুকনো জমিতে আবার ফসল ফলবে। সামান্য অশিক্ষিত চাষী যে কথা জেনে ফেলেছে একবছরে, কজন Planner সেকথার খবর রাখেন। তার চেয়েও বড় কথা ২৪ পরগণা, মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলী, নদীয়ার মঞ্চে যাওয়া নদীনালা আর নোনার জলে যাওয়া হাজার হাজার গ্রামের মানুষ জমি আর ফসল হারিয়ে কাতারে কাতারে কোলকাতার বস্তি আর ফুটপাতে আশ্রয় নিচ্ছেন? বস্তি আর ফুটপাতে এরা শুধু আশ্রয়ই নিচ্ছেন না, এরাই তারা যারা কোলকাতার Population explosion ঘটাইছেন। আর সেই Demographic Projection এর হাবুডুবুতে Planner দেব অনেক অর্থ গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। কোলকাতার রাস্তা প্রতিনিয়ত ভাঙছে, বলে মানুষ বিক্ষুব্ধ, কিন্তু Sanitary Engineer রা বলবেন, ২০০১ খৃষ্টাব্দে কতলোক আসবে আর কোন পাড়ায় আতানা গড়বে সেই হিসেব করেই তো আমাদের সড়ক, মোটা, লম্বা পাইপ বসাতে হবে, তাতে তো একটু ভুলচুক হবেই আর তাতে যদি আপনি হোঁচট খেয়ে পড়ে যান বা বাসটা উল্টে যায় তার ক্ষেত্রে Sanitary Engineer কে গালি না দিয়ে Harvard MIT তে যে Mathematical model করা হয়েছিল কোলকাতার Sanitation এর net work সম্পর্কে,

তাদের কি আমরা গালি দি? আর তাদেরই বা গালি দেব কেন—তারা তো জানতো না ১৯৬২ সালে যে Mexico Formousa তে নতুন ধরণের শস্তবীজ উৎপাদিত হবে, তারাতো জানতো না গঙ্গার মরাগাঙে বান আসবে আর মিষ্টিজলে দক্ষিণবঙ্গ উর্বর হয়ে উঠবে অর্থাৎ Population explosion কে কখনো বনিয়াদ তৈরী হবে, তাই অজ্ঞও সেই পুর্বানো Mathematical model Engineer রা ছাড়তে পারছেন না আর World Bank লব্ধী টাকার return আসছে না দেখে ক্ষেপে উঠছেন, বলছেন Sanitation এর Design পালটাতে। এই গোলক ধাঁধার মধ্যে কলকাতার মানুষ হাঁপিয়ে পড়ছেন, কবে সঁবাই পানীয় জল পাবে, কবে বর্ষার প্রাবন বন্ধ হবে, কবে বাড়ীর নোংরা ময়লা মাটির তলা দিয়ে নিষ্কাশিত হবে—নাগরিকরাও জানে না ইঞ্জিনীয়াররাও জানে না। এই জাঁতাকলে বন্দী আজ কোলকাতার প্রান। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, সমস্ত শরীরকে বক্ষিত করে শুধু মুখে রক্ত সঞ্চার করলে স্বাস্থ্যরক্ষা হয় না, ঠিক তেমনি পশ্চিমবঙ্গকে শুকনো রেখে আর শহরতলী—আশপাশকে ফাঁকি দিয়ে শুধু শহরের মাঝখানে পাতাল রেল আর underground sanitation করলেই কি কোলকাতার মুখশ্রী ফিরে আসবে—জবাব দিচ্ছে ফুটপাত বাসিন্দারা, তলায় Sewerage পাতালরেল, ওপরে রঙিন পার্ক আর গোটাশহরে পথঘাটকে পায়খানায় পরিণত করছেন এই ফুটপাত বাসিন্দারা। এরা এসেছেন কোথেকে—ফসল হয় না, ২৪ পরগণা, হাওড়া, হুগলী, বর্ধমানের গ্রাম থেকে। এ তো সরকারী সমীক্ষারই কথা। তাহলে গ্রাম আগে না শহর আগে, Sanitation আগে, না ভূমিহীনদের জমি দেওয়া কাজ দেওয়া জল—বীজ—সার সহ। অর্থাৎ মুরগী আগে না ডিম আগে, এ প্রশ্নের যেমন সোজা উত্তর হয় না, অথচ মুরগীও পালি আর ডিম ফুটে বাচ্চাও বেড়ায়। অর্থাৎ গ্রাম, শহর, Sanitation, চাকরী বাকরী আর কোলকাতার কেন্দ্র বনাম চারপাশ—কোথায় কতটা উন্নতি হবে, এই অঙ্কটা সঠিকভাবে করতে না পারলে Plan হয় না। সেকথা ভাবার আমাদের সময় কোথায়—ইষ্টবেঙ্গলকে কি মারটাই না দিয়েছে মোহনবাগান, তাই হ্যাঁ, কোচ প্রদীপ ব্যানার্জী

আর অমল দত্ত, এরাই বা এত দল পালটায় কেন কিংবা সত্যজিৎয়ের জনঅরণ্য একেবারেই Flat, আদর্শের বাংলাই নেই, না না, এটাই তো real বাস্তব— এই তর্কই শেষ হল না, তাই ওই planning এর জটিল অঙ্কটা কে করবে ? আর এই ঐতিহ্যের গরিমা তো আমাদের কম নয়, পারি-বারিক স্বাস্থ্য অঙ্ক হয়ে পলাশীর প্রান্তরে বিদেশীর পায়ের তলায় স্বাধীনতা, বিকিয়ে দেওয়া মিরজাফরী গৌরব তো আমাদের রয়েছে। তবুও বিদগ্ধ বুদ্ধিজীবীরা কেনই বা পিছিয়ে থাকবেন, তাই শুরু হয়েছে আরাম কেমারায় শুয়ে লিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলা, একবিংশ শতাব্দীর Perspectiveটা ঠিক না হলে বর্তমানটা ঠিক রোকা যাচ্ছে না।

ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধে প্ররোচিত করার জন্ত কৃষ্ণ অর্জুনকে বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন, গোটা পৃথিবী না বুঝলে ছোট, সমস্তায় Strategy ঠিক করা যায় না। হ্যাঁ, কোলকাতার সমস্তাটা ছোটই। এই বিগত হুড়ি বছরেই তো মহাকাশ বিজ্ঞানে অসীম-সাক্ষ্য এসেছে, চাঁদে মানুষ ক'বার গেছেন অনেকেই ডুলে গেছেন, মঙ্গলগ্রহ আর Venus ও হাডের ছোঁয়ার মধ্যে এসে গেছে। তারপর Telecommunications, Electronics ইত্যাদি ক্ষেত্রে নতুন আবিষ্কারের প্রাবন বইছে সাম্প্রতিক কালে, Computer, Petro-chemicals আর Synthetics এর ক্ষেত্রেও বিপ্লব ঘটছে। জেট প্লেন, রেডিও টেলিভিসন মোটরগাড়ী আমাদের দৈনন্দিন তথা সামাজিক জীবনকে সম্পূর্ণ উলটিয়ে পালটিয়ে 'দিচ্ছে। বিশ্বজাগতিক Technological উন্নতির এই হিসেবটা সব সময় মাথার মধ্যে রাখতে হবে, ইউরোপে কি ঘটছে সে সম্বন্ধে উন্নাসিক ধারণা থাকার জন্যেই আমাদের 'পলাশীর মায়' খেতে হয়েছিল সে মারটা বোধহয় তেমন যন্ত্রণাদায়ক ছিল না, তবেই না আমাদের সেরা সেরা Economist আর Plannerরা 'Developing Country'র economics নিয়ে গুছিয়ে ছেঁদো বাধতে পারছেন অর্থাৎ আমরা তো Developed নই, তাই অনেকদিন ধরে Developing country র জাল কাটতে হবে, অর্থাৎ আস্তে আস্তে চলতে হবে, জোরে চলতে

গিয়ে যদি হোঁচট খেতে হয়। এরই নামান্তর হল, appropriate বা Intermediate Technology অর্থাৎ Electricity র বদলে গোবর গ্যাস University র বদলে Primary School, Chemical Fertiliser এর বদলে গোবরের সার-গাদা, মোটরগাড়ীর বদলে রবারের Tyre দেওয়া গরুর গাড়ী, কিংবা উদয়নের পরিবর্তে খড়ে ঢাকা শ্রামলী বা উরীচী অথবা পলিথিনের মোড়কে খাদির জামা-কাপড়। কেউ কি ভেবে দেখেছেন, এই সমস্ত কথাগুলোর মধ্যে একটা পুরোনো স্রবের ঘূর্ণনা বাজছে—দরখাস্ত করে স্বায়ত্তশাসন না Dominion Status, ইউনিয়নবোর্ড, করপোরেশন না আইনসভা, পাল্লামেন্ট, দেশ প্রস্তুত, না প্রস্তুত না অর্থাৎ স্বভাব না গান্ধীজী অর্থাৎ গোবর-গ্যাস না Electricity ?

যে কথাটা পরিষ্কার করে বুঝতে হবে, সেটা হল, কিভাবে ক্ষুণ্ণ তালে পৃথিবীর অনেকগুলো পিছিয়েপড়া দেশ এগিয়ে চলেছে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে হবে তারা কোন পথে এগিয়ে গেছে, আমরা কি সেসব পথ নিতে পারি। যদি জ্ঞানের সন্ধানে দীপকর শ্রীজ্ঞান হেঁটে তিরত গিয়ে থাকতে পারেন (সে যুগে তিরতে যাওয়া আর জেট প্লেনে বিশ্বভ্রমণ করা, কোনটা সহজ) তাহলে কেন আমরা গোটা পৃথিবীর উন্নতির 'পথ-বিব্রেকণ' করব না। আর অন্য দেশে যা সম্ভব হয়েছে আমাদের দেশে তা কেন সম্ভব হবে না ? এটাই দেশ উন্নয়নের কৃষ্ণক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্বাহ্নে কৃষ্ণ কর্তৃক অর্জুনকে বিশ্বরূপ দেখানো। দ্বিতীয়ত, দেশের মধ্যকার অভূতপূর্ব উন্নতির যোজনামতাই ভাল করে খতিয়ে দেখতে হবে। যে দেশ আলপিন তৈয়ারী করতে পারত না সে দেশ কি করে বৈদ্যুতিক রেলইঞ্জিন তৈরী করছে, যে দেশ রেডির তেলে প্রদীপ জ্বালাত তারা কি করে Atomic reactor তৈরী করছে আর সমুদ্র মন্থন করে অমৃতরূপী তেল-গ্যাস উত্তোলন করছে, কি করেই বা সবুজ বিপ্লবের রোশনাই জ্বলছে। হাজারো রকম ইঞ্জিনীয়ারিং—বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি তৈয়ারী হচ্ছে, যা বিশ্ববছর আগেও কেউ ভাবতে পারত না। এই জ্ঞানটা যদি সর্বক্ষেত্রে সর্বব্যাপী ছড়ানো যেত, গ্রামের

কোটি কোটি মানুষকে এই উন্নয়ন যন্ত্রের সরিক বানানো হত তা হলে কি দেশের অবস্থা অনেক পাল্টে যেত না? সেই সম্ভাব্য অসুত সম্ভাবনার কথাই কি আজ নানান কর্মসূচীর ‘কর্মসূচী’ মध्ये শোনা যাচ্ছে না? কর্মসূচীর সূচীপত্র এড়িয়ে কবে আমরা দেশোন্নয়নের গোটা প্রবন্ধটা শেষ করব, এটাই আজ মূল জিজ্ঞাসা।

বিংশ শতাব্দীর প্রত্যয়ে যদি ইংরেজ স্ট্রট দেশ বিভাগের বিরুদ্ধে জাতীয়তার ভৈরবী বেজে থাকতে পারে শতাব্দীর মধ্যাহ্নে লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে যদি স্বাধীনতা এসে থাকে তাহলে অপরাহ্নেই কেন আমরা এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছি যে, হঠাৎ তিন লাফ দিয়ে আমাদের একবিংশ শতাব্দী প্রত্যয়ের কথা ভাবতে হবে? আমরা রোজ কাগজে পড়ছি না, ভূপালের Heavy Electricals আর বাঙ্গালোরের Telephone এর ক্ষমতাতি প্রচুর পরিমাণে বিদেশে রপ্তানী করছি, কিন্তু তার সাথে কি শতাব্দী-লব্ধের একটু আগেকার একটি ঘটনা মনে পড়ে? বিগত শতাব্দীর ২০ দশকেই তো জগদীশ বোস প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে টাউন হলে বে-তারে কথা বলেছিলেন, সামান্য একটু ভাগ্যের পরিহাসে আজ মার্কিনীর নামের পাশে জগদীশ বোসের নাম পাওয়া যায় না। কিন্তু বিজ্ঞান তো একটাই, তাকে ভাঙ্গা যায় না। ঠিক তেমনই জাগতিক শক্তি-নিয়োগের পারস্পরিক সম্পর্কের আপেক্ষিক তত্ত্বের কথা শুধু আইনস্টাইন এর মাধ্যমেই আসেনি, এলোহিল সত্যেন বোসের মাধ্যমেও। তারপর, গ্রহ-নক্ষত্রের আলোর Spectrum দেখে তাদের পারস্পরিক গতিপথের আনুপাতিক বেগ নির্ণয় সম্ভব করে ছিলেন এমন একজন বৈজ্ঞানিক, যাকে ঢাকার এক স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল ‘ছুতো পড়ে না আসার জন্তু, নীচু জাতের ছেলে এবং দরিদ্র বলে সে অপমান তাকে মুখ বুজে সহ্য করতে হয়েছিল, তার একার চেষ্টায় আজ প্রায় ছ’সাতটা জাতীয় বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান এগিয়ে চলেছে, এমন কি নোবেল-সুভাষকেও যিনি জাতীয় পরিকল্পনার নামতা পড়িয়েছিলেন তার নাম মেঘনাদ সাহা। রোজ কাগজে পড়ি গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে ছুটে চলেছে Space Craft, ঠোঙর

লাগে না কেন, এক গ্রহের টানে বিপর্যয় চালিত হয় না কেন, আর ঠিক অকু কষা পথে গিয়ে আলতো ভাবে চাঁদ বা মঙ্গল গ্রহের ওপর পড়ছে কি করে? এটা সম্ভব হয়েছে অনেক কারণের মধ্যে একটা অমূল্য আবিষ্কারের জন্তু যেটা বিশ-দশকের মাঝামাঝি মেঘনাদ সাহা করেছিলেন Stellar-Spectra বিশ্লেষণ করে। এটাকে পৃথিবীর দশ-বারোটি মৌলিক আবিষ্কারের মধ্যে ফেলা হয়। একটা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে যদি এতগুলি মৌলিক প্রতিভার জন্ম হয়, তবে শতসহস্রাধিক জাতীয় বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান গুলিতে হাজারো জগদীশ বোস, সত্যেন বোস, আর মেঘনাদ সাহা জন্ম নিচ্ছে না কেন?

ভারতবর্ষের অতীত যথেষ্ট গরিমাময় ছিল, তবে ক্ষেত্র—পঙ্খিতাও কম ছিল না, তাই পলাশীর প্রান্তরে হেরে গিয়েছিলাম। শোষণ-অত্যাচারে পিড়নাম ভুলে গিয়েছিলাম আবার অতীতের গরিমাকে ফিরে পেলাম ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যাহ্নে যার নাম রেনেশ। ঠ্যা, রেনেশার মধ্যে অনেক ঝাঁক ছিল। সেটা আবিষ্কার করে অনেকে এখন দিব্যজ্ঞান লাভ করছেন, যেন ইউরোপীয় রেনেশ। একেবারে বিধবার মত বিস্তৃত ছিল, মধ্যযুগীয় বর্বরতা থেকে ইউরোপীয় মানুষ মুক্ত স্বাধীন হয়ে পৃথিবীতে সার্ব, মৈত্রী, স্বাধীনতার জয়জয়কা বাজিয়েছিল আর সেই জৈলঙ্গস্বারীর মত মুক্ত ইউরোপীয় মানুষ রেনেশার পর সারা পৃথিবীতে পাবনিক আর লুণ্ঠন চালিয়ে জন্ম দিয়েছিল সাম্রাজ্যবাদের। খাঁটি ইউরোপীয় রেনেশার কি অপূর্ব প্রকাশ? না, এটাতে অনেক পুরোনো ঘটনা। এই সেদিন হিটলারের অত্যাচার কিংবা ক্রাঙ্কো-সালাজারের অত্যাচার, সেটাও কি পুরোনো? বিস্তৃত ইউরোপীয় রেনেশ। দিয়ে কি একে ব্যাখ্যা করা যায়? আর সর্বশেষ, ভিয়েতনামের নরমেধযজ্ঞ এটাকি আমেরিকান ‘গণতন্ত্রের’ এক বলিষ্ঠ প্রকাশ? তাহলে বিস্তৃত ইউরোপীয় রেনেশ।টা কি বস্তু? একটু সজ্ঞানেই এই আপাতঃ অপ্রাসঙ্গিক কথাগুলি বললাম। তারপর, রেনেশার সূত্রে ধরেই জন্ম নিল রাজনৈতিক স্বাধীনতা আন্দোলন, কখনও দরখাস্ত লিখে, কখনও কখনও ম্যালেরিয়া নাশ করার জন্তে

৩৬৪-৭ একবিংশ শতাব্দীর কোলকাতা কেমন হবে ?

কচুরীপানা পরিষ্কার করে কখনও বা বোমা-পিস্তল ধরে। এই সমস্ত পথ অভিক্রম করে এসেছে স্বাধীনতা আর গত পঁচিশ বছরে অনেক ভুল ভ্রান্তির মধ্যে দিয়ে জন্ম নিয়েছে একটা Technological Industrial base. অর্থাৎ বিগত শতাব্দীর মাঝামাঝি শিল্পায়নের যে সামান্য অঙ্কুরোৎগম হয়েছিল কোলকাতায়, তারই পরিণতি রেনেসাঁ আর স্বাধীনতা আন্দোলন। তাহলে, নতুন যুগের শিল্পায়নের যে বাপক এবং স্বচ্ছ Technological base. তৈরী হয়েছে তাকে অবলম্বন করেই এগিয়ে চলবে নবভারতের রেনেসাঁ—অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং Technological-বিগত রেনেসাঁ—স্বাধীনতা আন্দোলনের লক্ষ্য যদি স্বাধীনতা আর জাতীয় কৃষ্টির বিকাশ হয়ে থাকে তাহলে Developed World এর নাগপাশ থেকে মুক্তি পাওয়ার যে লক্ষ্য বোঝিত হয়েছে UNCTAD এর দিল্লী-নাইরোবী সম্মেলনে, যে New Economic Order এর কথা শোনা যাচ্ছে প্রতিনিয়ত তৃতীয় বিশ্বের অলিঙ্গ-অলিঙ্গ যার প্রথম ভোপক্ষনি শোনা গেছে OPEC-র ঘোষণাবলীতে, সেই পুথই বিংশশতাব্দীর শেষপ্রহরের সাধনা হোক। বিরাট ভাষ্যার্থ্য নিহিত আছে এই New Economic Order এর প্রস্তাবনায়—যদি প্রথম আর দ্বিতীয় বিশ্ব বাধা দেয়, তা হলে তৃতীয় বিশ্ব নিজের সত্তা বেছে নেবে, যার নির্গলিতার্থ হচ্ছে স্ব স্ব দেশের অর্থনীতিকে স্বাবলম্বী করে তোলা আর তৃতীয় বিশ্বের বিরাট জনসমষ্টির মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্যের জোয়ার সৃষ্টি করা। আছে অম্লরস কঁচামাল, সৃষ্টি হয়েছে Technological base, এবার সাতসমুদ্রে চাঁদ সদাগরের পাড়ি জমানোটা বাকী, চাই স্বস্তি আর বহিবাণিজ্যের সার্থক মিলন। কিন্তু স্বস্তি বাণিজ্য বাড়বে কি করে, যদি ৬০ কোটির মধ্যে ৩০ কোটি মানুষের ক্রয়ক্ষমতার Poverty line এর নীচে থাকে, অর্থাৎ মাথাপিছু মাসিক ২০ টাকারও নীচে। তাই চাই অবিলম্বে যথার্থ ভূমি সংস্কার ও জমির পূর্নবন্টন চাই গ্রামে বৈজ্ঞানিকরণ যার সাহায্যে চলবে হাজার হাজার গভীর নলকূপ, চাই সাগর-সমুদ্র পাহাড় জঙ্গল খুঁড়ে ডুগর্ভের ডেল-গ্যাস আহরণ যার সাহায্যে তৈরী হবে

রাসায়নিক আর পেট্রোকেমিক্যাল শিল্প, চাই অম্লরস কয়ল সম্পদের অম্লত সম্ভাবনাময় রাসায়নিক ও বৈজ্ঞানিক শক্তি উৎপাদন—এই জাতীয় হিমালয়সম উন্মুক্ত জাতীয় সাধনা শতাব্দীর প্রান্তে দাঁড়িয়ে এই নতুন স্বপ্নকেই জাতির সামনে বলিষ্ঠভাবে তুলে ধরতে হবে আর জাতির লক্ষ্য ঠিক হলেই পশ্চিমবঙ্গ তথা কোলকাতার লক্ষ্যও ঠিক হবে।

পশ্চিমবঙ্গের ৪০ হাজার গ্রাম যদি হারে তিন ফসল তুলে সোজা পায়ে দাঁড়াতে পারে, তাহলে জেলায় জেলায় ছোট-বড়-মাঝারী শহরগুলি হয়ে উঠবে সমৃদ্ধ তাতেই কোলকাতার উপর চাপ কমবে আর তাহলেই ৬০০ বর্গ-মাইলের মেট্রোপলিটন কোলকাতাকে নতুনরূপে ঢেলে সাজানো সম্ভব হবে, আর এর বিকল্প হল, তলার সুন্দর সাজানো জল-ড্রেন-স্বারাজের পাইপ আর শহরের ওপরে রাস্তার, পার্কে আনাচে-কানাচে জমি থেকে উৎখাত লক্ষ লক্ষ গ্রামের আর্ত মানুষের ভীড়, যারা কোলকাতাকে বিষাক্ত ও পুণ্ডিগন্ধময় করে তুলবে, ব্যর্থ হবে মাটির নীচেকার স্যানিটেশন ব্যবস্থা। যদি স্যানিটেশন বিপর্যয় হয়, তাহলে কলেরা, টাইফয়েড, আমাশয় দ্বারা যাবে বস্তির গরীব মানুষ আর গোটা দেশের অর্থনীতি যদি সোজা হয়ে-না দাঁড়ায়, তা হলে বস্তির মানুষ চিরদারিদ্র্যেই দিন কাটাবে। সে জন্যে বস্তির মানুষের সমস্যা কোলকাতা—পশ্চিমবঙ্গের সমস্যাতে বাদ দিয়ে সমাধান করা যাবে না, শুধু পুণ্ডিগন্ধ লাগানোই হবে। শেষ কথা, শতাব্দীর উত্তরার্ধে যদি জগদীশ বোস-সত্যেন বোসের দীপ্তিময়ী প্রতিভা দেশের গগনকে আলোকিত করে থাকে, যদি সুদীর্ঘ-বাণ্যযতীনের জলন্ত সাহস দেশকে বলিয়ান করে থাকে, তাহলে শতাব্দীর অপরাহ্নে কি আমরা রাস্তায় নিওন লাইটের খুঁটি কোথায় বসবে, জেব্রা ক্রসিং কোথায় হবে, ফুটপাথ কাটা হবে কি হবে না, হকাররা রাস্তার কোনদিকে বসবে বা বসবে না, এই নিয়েই মাথার চুল ছিড়তে থাকব? না, মৃত্যুঞ্জয়ী শহীদদের স্বপ্ন আর মনীষীদের সাধনাকে পাথের করে নতুন শতাব্দীর উত্তরার্ধে প্রাঙমুহুর্তে বিগত শতাব্দীর লালনা-বেদনাকে নীলকণ্ঠের মত পান করে নতুন সৃষ্টির বেদনায় নজরুলের মত উন্মাদ-বিরোধী হবো ?

সভ্যতার স্বপ্ন

পরিচয়

সভ্যতার পুনর্নির্বাচন দরকার। কলকাতার যে সভ্যতা আমরা তাকে চিনি। আধুনিক কালের আন্তর্জাতিক ভাব-জগতের প্রতিটি তরঙ্গ কলকাতাকে স্পর্শ ও আলোড়িত করেছে। অতীতকালে, বাংলার নিজস্ব প্রাণধারায় পুষ্ট কলকাতা কখনো বাংলার বা ভারতের স্বাভাবিক পশ্চাদভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়নি। তবু একথা সত্য যে কলকাতা তার উৎপাদনশীলতা হারাচ্ছে, হারাচ্ছে স্বষ্টিক্ষমতা। কলকাতার আকাশ এখন ধূম্রমলিন, বায়ুমণ্ডল বিবাক্ত, আবর্জনার সঙ্কলন হয়েছে হুগলি নদীর জল। কলকাতা তার শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থানে ব্যর্থ; ব্যবসা-বাণিজ্য ক্রম-সঙ্কোচনশীল, নবতর শিল্পোদ্যোগ অসুপস্থিত। কলকাতা-বাসীর ছুঃখরাশি ফুলে ফেঁপে উঠছে। পথঘাট ও পয়ঃপ্রণালী যানবাহন ও বাসব্যবস্থা, নির্ভেজাল খাওয়ার জোগান ও ক্রয়ক্ষমতা ক্রমশঃই মন্দ থেকে মন্দতর হয়ে উঠছে। পৌর প্রশাসন ও কলকাতা উন্নয়ন সংস্থা যথেষ্ট আশা সঞ্চার করতে পারেন নি; রাজ্য প্রশাসনে ও বিধান সভায় গুণিজনের দর্শন দুর্লভ হয়ে আসছে। সাংবাদিকতা, সাহিত্য বা কলাসৃষ্টিতে নতুন মাত্রা সংযোজিত হবার লক্ষণ নেই; এমনকি যে কলকাতার জীবনে আদর্শবাদের দীক্ষা অস্বত গত ছুশো বছর যাবত চলে আসছে সেখানে আদর্শ ও নৈতিকতা অধুনা পলায়নপর।

কী ভাবে সাজালে কলকাতা কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে সে প্রশ্ন আমার আলোচ্য নয়। কিন্তু বাংলার সভ্যতার নতুন বিকাশ অবশ্যই আবাহন করে আনতে হবে। বাংলা পরিবর্তনশীলতাকে চিরকাল সমাদর জানিয়েছে। মৃত, জড় ও বস্তুকে আগলে বসে থাকার স্বভাব বাংলার নয়।

বর্তমান ক্রান্তিক্ষণে পরিবর্তন কোন দিক থেকে ও কী রূপ নিয়ে আসতে পারে আমি সেই ইশারা অনুধাবন করার চেষ্টা করছি।

অল্প কিছুকাল যাবত কলকাতার সংলগ্ন একটি অতি গ্রাম্য এলাকার সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। শিয়ালদহ স্টেশন থেকে ট্রেনে, বোম্বাচারের মোড়, গড়িরার মোড় বা শ্রামবাজারের মোড় থেকে বাসে দেড় দুঘণ্টার মধ্যে পৌঁছনো যায় কলকাতার এত কাছে অবস্থিত এই এলাকাটির নাম সুন্দরবন। বর্তমান বাংলার সুন্দরবনও বর্তমান। ইছামতীর এ পারে পশ্চিমবঙ্গে সুন্দরবনের ছোট অংশটি পড়েছে। সমুদ্র বনাকুলসহ সুন্দরবনের বৃহৎ অংশটির মালিক বাংলাদেশ। তবু পশ্চিমবঙ্গে যে অংশ পড়েছে তারও আয়তন পাঁচ হাজার বর্গমাইল। এর দু হাজার বর্গমাইল ছুড়ে আছে সংরক্ষিত বন ও জল। বাকি তিন হাজার বর্গমাইলে ২২ লক্ষ লোক বাস করে। শিক্ষায়, অর্থ উপার্জনে, জীবন-মানে এরা ভারতের ও পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে অসহায় মানুষ। সুন্দরবন এ দেশের পশ্চাত্তম এলাকা। রাস্তাঘাট নেই, বিদ্যুৎ নেই, জলপথে যাবার যোগ্য যান, জেটি, পুল নেই। রেলপথ আছে মাত্র ৪২ মাইল। শহর বলতে ক্যানিং কাকদীপ ও জয়নগর। কৃষি শতকরা ৯৫ জনের জীবিকা। জমির বড় মালিকরা কলকাতাবাসী কৃষির উৎপাদন বাড়ানোর বা আধুনিক কৃষিপ্রচেষ্টার তাদের আগ্রহ নেই। শুধু তাই নয়, ফলন বাড়ানোর বা জমিকে দু-ফসলী তিন-ফসলী করার তারা বিরোধী। শতকরা ৫৪ জন ভূমিহীন চাষী। তাদের সর্বস্বর কাজ জোটেনা। কলকাতার ফুটপাথে এদের অনেকের অস্থায়ী সংসার বসে ঝুতুতে ঝুতুতে। তপস্বী

জাতি (শতকরা ৪৫.৮৪ ভাগ) ও আদিবাসী (শতকরা ২১.৪৫ ভাগ) মোট জনসংখ্যার একটা বড় অংশ। সাক্ষরের সংখ্যা ২৭.০২% কৃষিকারীদের আয়ব্যয়ের চিত্র নিম্নরূপ :

হয়ে উঠতে পারে কলকাতার ক্ষুদ্র শস্তভাণ্ডার, ফল, ছক্ক, মাংস ও মৎস্যভাণ্ডার।

কলকাতার মতো বৃহৎ বাজার কাছে থাকায় স্বন্দরবনের

	পরিবার পিছু মাসিক আয় (টাকা)	পরিবার পিছু মাসিক ব্যয় (টাকা)
ক্ষুদ্র চাষী (যাদের জমি ২ একরেরও কম; এরাই ভূমিবানদের মধ্যে শতকরা ৮৫.২২ জন)	২২০.৫৪	২২০.৮০
মধ্য চাষী (যাদের জমি ২ থেকে ৪ একরের মধ্যে; ভূমিবানদের মধ্যে এরা শতকরা ১২.০২ জন)	৩৩২.৬৪	২৮০.১০
বড় চাষী (যাদের জমি ৪ একরের বেশি। ভূমিবানদের মধ্যে এরা শতকরা ২.৭৬ জন)	৯২৪.৭০	৫৭৭.৬৬
ভূমিহীন চাষী বা ক্ষেতমজুর	১২৭.২০	১৪৬.৮৮
অস্বাস্থ্য	৩৫১.৮৬	২৪৮.৮৩

তাহলে পরিবার পিছু মাসিক গড় আয় ৩১১.৪২ টাকা ও মাসিক গড় ব্যয় ২০৪.২২ টাকা। তাহলে কিছু ক্ষুদ্র স্বন্দর হবার কথা স্বন্দরবনে। হয়ও। সে টাকা লাগে না উৎপাদন বাড়ানোর কাজে। সে টাকা লয়ী হয় মহাজনী কারবারে। তাতে স্বদের অত্যাচার বাড়ে, প্রাণ বাঁচাতে প্রাপ্য হুয় গরীবজন। সম্প্রতি ব্যাংকগুলি নানা স্থানে শাখা খুলে স্বন্দরবনের টাকা সংগ্রহ করে বাইরে পাচার করে দিচ্ছে। স্বন্দরবনের গ্রামের টাকা কলকাতা বা এমনকি স্বহুয় বোম্বাই পর্যন্ত চলে যাচ্ছে। স্বন্দরবনের অধিকাংশ মানুষ কিন্তু অসহায়ভাবে ঋণগ্রস্ত—পরিবার পিছু এই ঋণের গড় পরিমাণ ৭৮৭ টাকা ৯৮ পয়সা।

কৃষিকারী ছাড়া বন, মধু মাছ থেকে জীবিকা সংগ্রহ করে যারা বেঁচে আছে স্বন্দরবনের জনসংখ্যার তারা শতকরা পাঁচ জন। তাদের অবস্থা শোচনীয়তর।

১০টি উন্নয়ন ব্লক, ১৫টি থানা ও ১৩টি বিধানসভা কেন্দ্র নিয়ে গঠিত; উত্তরে ডাম্পিয়ার-হজ্জেল লাইন, দক্ষিণে সমুদ্র, পশ্চিমে হুগলি নদী ও পূর্বে বাংলা দেশের সীমারেখার মধ্যে বিস্তৃত স্বন্দরবনের আধিক ও সামাজিক দুর্ব্যবস্থা কথা বললাম। কিন্তু এই স্বন্দরবনই কলকাতাকে জোগায় মধু মাছ চাল ও তরকারি। দেশভাগের সময় পর্যন্ত কলকাতার প্রয়োজনীয় সমস্ত চাল জুগিয়েছে স্বন্দরবন, মাছও। আজ সে জোগান কমে গিয়েছে স্বন্দরবনের নানা অবনতির দরুন। কিন্তু স্বল্প উন্নয়ন ঘটলে স্বন্দরবন-আবার

অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্ভাবনাও অসীম। আবার একটা অতি সমৃদ্ধ পশ্চাদভূমি রূপে কলকাতার প্রাণরস যোগানোর বড় দায়িত্ব স্বন্দরবনই নিতে পারে।

কিন্তু আমি ভিন্নতর একটা সার্থকতার ইঙ্গিত এখানে দিতে চাইছি।

স্বন্দরবনের অতীত ইতিহাস বিতর্কিত; তবু বলব সভ্যতার ছোঁয়া এখানে তেমন লাগেনি, উন্নয়নের নাগরিক খাঁচ এখানে কোনোদিনই পৌঁছয়নি। এমন ধীপথও এখনো এখানে আছে যাকে কুমারী ভূমি বলা যেতে পারে।

সমুদ্রচুম্বিত, বনাকুলের মায়াচ্ছন্ন জল মাটির এই কোমল ভূখণ্ডে সভ্যতার একটি নতুন পৃষ্ঠা ওঁটাবার আহ্বান কি নেই? যেখানে প্রকৃতি ও প্রাণী জগতের সঙ্গে নিবিড় আত্মীয়তায়, বৃক্ষলতা পল্লবের মর্মরচ্ছায়ে, নদীখালের বহতা ধারার পাশাপাশি মানুষ আত্মবিকাশের দল মেলেতে পারে— তেমন সভ্যতা? অহুবে নগর ও মন্বসভ্যতা; তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নয়, অনাত্মীয় হয়ে নয়, প্রাচীন কালের অরণ্য-লোকে আত্মমগ্ন হয়ে নয়;—আধুনিক কালের মাঝে ও তার সংস্পর্শকে সযত্নে লালন করেও আপন স্বাভাবিকে রক্ষা করে যে সভ্যতা মাটির কোলে, প্রকৃতির স্নেহচ্ছায়ায়, বৃক্ষ ওষধি ও সর্বজীবের সঙ্গে সখ্যতাবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে উঠুক তীব্র ভেদবোধ থেকে মুক্ত একটি নতুন জনজীবন কি গড়ে তুলবে? স্বন্দরবন হয়তো এই প্রশ্ন নিয়েই অচিরে আমাদের মানসস্থানে উদ্ভিত হবে।

আগামী শতকের কলকাতার রূপরেখা

মাদনদীপ চট্টোপাধ্যায়

আজকের কলকাতা শুধু একটি মহানগরী নয় বরং বহু নগর ও অঞ্চলের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা এক বিশাল শহরাঞ্চল যার বিস্তৃতি হুগলী নদীর দুই তীর বরাবর—পূর্বে কল্যাণী থেকে বজবজ ও বারইপুর আর পশ্চিমে বাঁশবেড়িয়া থেকে উলুবেড়িয়া। এই বিশালায়তন শহরাঞ্চলের ভৌগোলিক সীমারেখা বিস্তৃত ৫০০ বর্গমাইলেরও অধিক এলাকাজুড়ে আর তার আঞ্চলিক পরিধির মধ্যে রয়েছে ৩৪টি পৌরসভা (কলকাতা ও হাওড়া সহ) আর প্রায় দেড়শো অঞ্চল পঞ্চায়েৎ। এই নগর ও অঞ্চলের মহাসম্মেলনেরই নাম সি, এম, ডি, (ক্যালকাটা মেট্রোপলিটন ডিস্ট্রিক্ট) আর এই বিশাল এলাকাজুড়ে বহুমুখী উন্নয়ন-কর্মকাণ্ডে ব্যাপ্ত রয়েছে সি, এম, ডি এ (ক্যালকাটা মেট্রোপলিটন ডেভেলপ-মেন্ট অর্থরিটি)। বর্তমান জনসংখ্যার বিচারে সি, এম, ডি ভারতের তথা দক্ষিণ-পূর্ব-এশিয়ার বৃহত্তম জনবসতিপূর্ণ এক বৃহদায়তন শহরাঞ্চল (মেট্রোপলিটন এরিয়া) যার বর্তমান লোকসংখ্যা ২০ লক্ষের ওপরে। স্বভাবতই অসুমান করা হয় যে আগামী শতকের প্রারম্ভে এই জনক্ষতি ১২০ লক্ষের সাত্তা সহজেই অতিক্রম করবে।

এই বিপুলায়তন জনবসতির বিস্তার ও বিন্যাসের ক্রম-বিবর্তনের ধারাকে সঠিক উপলব্ধি করা দরকার আগামী দিনের যে কোন সামগ্রিক পরিকল্পনা রচনার একান্ত প্রয়োজনীয় অংগ হিসাবে। সেই জন্যই আগামী শতকের কলকাতার রূপরেখা বর্ণনার আগে সংক্ষেপে কলকাতার ক্রমবিকাশের ধারাটিকে উপস্থাপনা করা হয়েছে। কলকাতার ক্রমবিবর্তমানের ইতিহাসটুকু সম্যক উপলব্ধি করতে পারলে ভবিষ্যৎ কলকাতার বিকাশ ও বিন্যাসের মৌলিক কাঠামোর রচনাটাইলী নির্ধারণ করা অনেকাংশে সহজ হয়ে পড়ে। প্রকৃতপক্ষে একটি শহর গড়ে ওঠার ইতিহাসতো বহু শতাব্দির মিলিত প্রচেষ্টার ফল—তাদের আনন্দ ও বেদনার, সংগ্রাম আর সফলতার, আশা আকাংখার মূর্ত প্রতীক। এবং আগামী দিনের যে শহর ও পরিবেশ পরিকল্পনা করা হবে তাতে সেইসব শতাব্দির পূর্ণ ও সার্থক জীবন-যাপনের আধার হিসাবেই।

এই প্রসঙ্গেই আর একটি কথা এসে যায় তাহলে কলকাতার মাটিতে এক অনন্য মানসিকতার প্রসার লাগ ঘটেছে। হতে পারে কলকাতা বহু বিতর্কিত ও নিন্দিত তবু স্বীকার করতেই হবে কলকাতার স্বকীয়তা তার বিস্তার বিন্যাসে নয়, এমনকি বিপুলায়তন জনসংখ্যায়ও নয় কলকাতার বৈশিষ্ট্য এক উচ্চ মানসিক কৃষ্টি ও সংস্কৃতির ধার হিসাবে। এবং এই ধারাটি থেকেই জাতীয় জীবনের নানা স্তরে নব নব চেতনার উন্মেষ ও পুষ্টি ঘটেছে। আজো তাই অনেক ষাণ্ড প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে উত্তরণের পরেও কলকাতা গর্ব করতে পারে এক উচ্চ মানবিক মূল্যবোধের যদিও সেটা কাল ও সমাজের প্রভাব অতিক্রম করে শাস্য নাও হতে পারে।

১. কলকাতার ক্রমবিকাশের ধারা

হুতানটি, বাজার কলকাতা ও গোবিন্দপুর, এই তিনটি গ্রাম নিয়ে যে কলকাতার গোড়াপত্তন—সেই একদিন বিশাল মহীরুহে পরিণত হবে, পল্লবিত হয়ে উঠবে কল্লোলিনী কলকাতায়—তা বোধ হয় সেদিন জব চার্গকের স্বপ্নের অগোচর ছিল। বর্তমানের সম্প্রসারণের পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতার ভৌগোলিক অবস্থিতি যতই প্রতিকূল মনে হোক না কেন জব চার্গকের সময়ের বিচারে কলকাতার অবস্থিতি ছিল বৃষ্টি স্বার্থের অসুস্থকূল। কলকাতা হুগলী নদী মোহনার অনতিদূরে এমন একটি বাকের মুখে অবস্থিত নদীপথে উত্তরদিক থেকে কোন আক্রমণ চেষ্টা সহজে অসুমান করা যায় প্রকৃতির অবকাশ দিয়ে। আর তা উত্তরেইতো জাচ উপনিবেশ শ্রীরামপুর, ফরাসীদের চন্দননগ আর তাঁরও উত্তরে বাংলা বিহার উজ্জিয়ার মসনদের কেন্দ্রস্থ মুর্শিদাবাদ। পূর্বদিকের বিশাল জলাভূমি মারাঠা আক্রমণে বিরুদ্ধে প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষাব্যূহ রচনা করেছিল। অসুস্থ করা যেতে পারে এই সব কারণেই বৃষ্টি বণিকশক্তির রক্ষ করচ হিসাবে কলকাতায় চূর্ণ গড়ে উঠলো। আর সেই দু থেকেই রূপান্তরিত হলো বণিক শক্তি—রাজশক্তি রূপে প্রকৃতপক্ষে কলকাতার অভ্যুদয় ভারতবর্ষের বৃষ্টি সাম্রাজ্য

র অন্যতম প্রধান বিকাশ-কেন্দ্র রূপে। আর তারই স্বরূপ কলকাতা ভারতবর্ষের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ঠা হিসাবে বিরাজ করলো বিংশ শতাব্দীর প্রথম-দশক আর সেই সময় কলকাতা শুধু ভারতবর্ষেই নয় দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার উজ্জ্বলতম সৌখিন নগর-কেন্দ্র পরিগণিত হতো।

কলকাতার দুর্গের আচ্ছাদনে প্রসার লাভ করল ব্রিটিশ আর নদীর তীরে গড়ে উঠল ভারতবর্ষের অন্যতম বন্দর। কলকাতার প্রথম বিকাশের-স্তর ব্রিটিশ-কেন্দ্র হিসাবে—অর্থাৎ কলকাতার বিশাল উর্বর মি শোষণ করে বিদেশের বাজারে কৃষি পণ্য রপ্তানি আর এই বাণিজ্যের প্রসারের মধ্যে দিয়ে সবচেয়ে হলো ভারতবর্ষের কৃষক-সমাজ ও সনাতন হস্ত-। প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষের কৃষকের বন্ধনার ফসলে পূর্ণ ইংলণ্ডের ধনভাণ্ডার। আর রচনা হোল কলকাতার র সৌধ-মিনার আর তাদের রূপাধন ভারতীয় মনুজিল। বাজার-কলকাতার দক্ষিণে ইংরেজ বসতি স্তরে স্বদেশীয়দের বসতি আর নদী-পারে দুর্গ ও বন্দর এই কলকাতার প্রথম স্তরের বিকাশ।

কাতার সম্প্রসারণের দ্বিতীয় স্তরে কলকাতার রূপান্তর ভারতবর্ষের অন্যতম শিল্প-কেন্দ্র হিসাবে। প্রকৃতপক্ষে র্বর শিল্পবিপ্লবের স্মৃতিকাগারও এই কলকাতা। পার্শ্ববর্তী হুগলী নদীর দুই তীর ধরে গড়ে উঠতে ব্রিটিশ শিল্প বিস্তারের ফলশ্রুতি হিসাবে ভারতবর্ষের ধুনিক কল-কারখানা। প্রথম ছুট-মিলের পতন ৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ঘিষড়াতে। তারপর একে একে গড়ে ধুনিক ছুট মিল বরানগরে, বজবজ্জে ও হাওড়ায়। গজ কলের গোড়াপতন হলো বালিতে। ১৮৬৭ খ্রিঃ টিটাগড়ে ১৮৮২ খ্রিঃ। অবশ্য ওধারে ১৮৫১ রেলপথের আবির্ভাব হয় রানীগঞ্জ থেকে কলকাতা এই রেলপথই কলকাতার শিল্প বিস্তারের ইন্ধন থাকে। আর এই সময়ের মধ্যেই ভারতবর্ষের চিহ্নে কলকাতার অগ্রগতি চলতে থাকে অব্যাবহত

দ্বিতীয় স্তরের সময়সীমা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কাল যেতে পারে। আর এই সময়ের মধ্যে কলকাতার যান বিন্যাসের স্বরূপটি কি? এক দিকে কলকাতা হতি আর অন্যদিকে হুগলী নদীর দুই তীর বরাবর শত অর্ধাং প্রায় স্বতন্ত্র বিচ্ছিন্ন অনেকগুলি র বিন্যাস ঘটেছে—আর এই উপনিবেশগুলোর কান না কোন বিশেষ রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক

অথবা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে কেন্দ্র করে। যেমন গড়ে উঠলো কনাসীদের উপনিবেশ চন্দননগর, ওলন্দাজদের-শ্রীরামপুর, সামরিক শহর বারাকপুর, সনাতন কৃষ্টিকেন্দ্র ভাটপাড়া। আর এই বিস্তারের মধ্যেই সংযুক্ত হলো নুতন নুতন কলকারখানা ভিত্তিক “ফ্যাক্টরি টাউন” যেমন টিটাগড়, কাকিনাড়া, বাউড়িয়া ইত্যাদি।

এই আপাত বিচ্ছিন্ন উপনিবেশগুলোর মূল যোগ সূত্র ছিল হুগলী নদী, যে নাকি অন্যতম যোগাযোগেরও মাধ্যম ছিল, আর কেন্দ্র ছিল অবশ্যই কলকাতা। তাহলে দেখতে পাই যে কলকাতার ক্রমবিকাশের দ্বিতীয় স্তরেই আজকের বৃহত্তর কলকাতার মৌলিক কাঠামোর আবির্ভাব ঘটেছে। অর্থাৎ বন্দর, বাজার ও শাসনকেন্দ্র ঘিরে কলকাতা আর তারই পার্শ্ববর্তী হুগলী নদীর দুই তীর বরাবর অনেকগুলো স্বতন্ত্র উপনিবেশ প্রায় ক্ষেত্রে নদীতীর সমান্তরাল রেলপথের মধ্যবর্তী এলাকায় গড়ে উঠেছে। মৌলিক কাঠামো ও তার উপাদানের উপস্থিতি ঘটেছে, কিন্তু সবকিছু মিলে বৃহত্তর কলকাতার অবিচ্ছিন্ন একক বিস্তার তখনো ঘটেনি। সেটা ঘটলো তৃতীয় স্তরে এবং বলা যায় দ্বিতীয় বৃহৎস্তর কালে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সাথে সাথে কলকাতার তৃতীয় স্তরের শুরু।

যে কলকাতা একদিন ব্রিটিশ শাসনের বেদীমূল রচনা করে-ছিল সেই কলকাতাই পরবর্তীকাল—ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের বেদ-পীঠ রচনা করলো—যেখান থেকে উৎসারিত হলো ব্রিটিশসাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে অমোঘ নির্দেশ, বাংলার তরুণের অগ্নিমুখে উচ্চারিত হলো ইংরেজ শাসনের অবসান। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাঙলার তরুণেরা সৃষ্টি করলো সংগ্রাম ও আত্মবালদানের এক অতুলনীয় ইতিহাস। ভাগ্যের পরিহাসে, স্বাধীনতার জঙ্ক চরম মূল্য দিতে হলো সেই বাংলাদেশকেই দেশ-বিভাগের মধ্যে দিয়ে। স্বাধীনতার উৎসব রজনী অতিক্রান্ত হতে না হতে লক্ষ লক্ষ বাঙালীরা ১৫ মাহুঘের জন্মনরোলে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো কলকাতা তথা পশ্চিমবাংলার পূর্ব দিগন্ত। মানব ইতিহাসের এক অবি-স্মরণীয় যাত্রা শুরু হলো লক্ষ লক্ষ বাঙালীরা মাহুঘের নুতন বাস্তব সন্ধান। সেই সব ছিন্নমূল মাহুঘের-দলই নুতন করে রচনা করল নুতন পরিবেশে তাদের নুতন বসতি আর জন্মদিল আজকের বৃহত্তর কলকাতার সম্পূর্ণ সম্পূর্ণ রূপটি। যেখানে সকল উপনিবেশগুলো মিলেমিশে অথও মহানগরী সৃষ্টি হলো। পূর্ববঙ্গের সাহসী মাহুঘের দল প্রতিফুল-পরিবেশের সাথে সংগ্রাম করে নুতন বসতি স্থাপন করে মহানগরীর বিস্তারের এক নুতন দিগন্ত প্রসারিত করলো। দেখা দিল মহানগরীর প্রান্তিক অঞ্চলে, যেখানে ছিল না জীবনধারণের

কোন উপকরণ, সেখানে নূতন জীবনের প্রবাহ। জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেলে এসব প্রান্তিক এলাকাতে। যদিও স্বাধীনতার-উত্তর দশকে জনবসতির প্রসার ও বিস্তার ঘটলো অভূতপূর্ব হারে, নূতন কোন কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি হলোনা সেই অস্থপাতে। কলকাতার বাণিজ্যকেন্দ্র ও পুরাতন শিল্পাঞ্চলগুলোর ওপরেই চাপ সৃষ্টি হলো, তারই সাক্ষাৎ প্রতিক্রিয়া দেখা দিল কলকাতার যানবাহন ব্যবস্থার নাভিশ্বাসে। অর্থাৎ কলকাতার জনবসতি বিস্তারের সাথে সামঞ্জস্যবিধান করে সৃষ্টি হলো না নূতন কোন কর্মক্ষেত্র, নূতন কোন শিল্পাঞ্চল। আরো পরিতাপের বিষয় যে নূতন জনবসতি গড়ে উঠল নগর-জীবনের মৌলিক স্বার্থ-সুবিধার ব্যতিরেকেই এবং ভবিষ্যতে তার সুযোগ ও সম্ভাবনাও সীমিত হলো অবিস্তৃত বিন্যাসের ফলে। রূপ পেল পৃথিবীর অন্ততম ঘনবসতিপূর্ণ মহানগরী যার বিন্যাসের মধ্যে নেই কোন সূচিস্থিত সামঞ্জস্যপূর্ণ গঠনশৈলীর প্রকাশ। সংক্ষেপে এটাই হলো বর্তমান মহানগরীর চালচিত্র যার পরিপ্রেক্ষিতে রচনা করতে হবে আগামী দিনের পরিকল্পনা।

২ ভবিষ্যত বিন্যাসের ধারা

সমগ্র সি, এম, ডি এলাকায় ভবিষ্যৎ বিস্তারের স্বরূপটি নির্ধারণ করা একান্ত প্রয়োজন, এই কারণে যে আজকে আমাদের সঠিক করে বলতে হবে আজকের উন্নয়নে বিনিয়োগ কর্মসূচীর মধ্যে দিয়ে আমরা কোন ভবিষ্যতের ছবি আঁকতে চলেছি। আমাদের সামনে এমন এক ভবিষ্যতের পারবেশ পরিকল্পনার ছবি আঁকা দরকার যেটা সাধারণ মানুষের আশা আকাংখার পূর্ণ স্বীকৃতি হিসাবে গণ হতে পারে। আজকের প্রতিদিনের বেদনা ও গ্লানি যাতে লাঘব হয়ে এক সুন্দর উজ্জ্বল ভবিষ্যত জীবনযাপনের পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে সেই উদ্দেশ্যেইতো ভবিষ্যৎ পরিবেশের পরিকল্পনা। আগামী দিনের যেকোন পরিবেশ পরিকল্পনা যেন সাধারণ মানুষের জীবনে শহরবাসের অভিজ্ঞতাকে সার্থক আনন্দময় করে তুলতে পারে, আমাদের অহুসঙ্কান হওয়া উচিত সেইদিকে। এই অহুসঙ্কানের ফলস্বরূপ সামগ্রিক সি, এম, ডি এলাকার ভবিষ্যত বিকাশ ও বিস্তারের সম্ভাবনার মৌলিক কাঠামো লক্ষ্যে কয়েকটি বিকল্প সম্ভাবনার কথা ভেবে দেখতে হয়। যেমন ধরা যাক—

১। সমগ্র এলাকাজুড়ে একটিই মাত্র আকর্ষণকেন্দ্র বর্তমানের বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগের কর্মক্ষেত্র ছিড়ে গড়ে উঠবে।

অথবা ২। দুটি মূল কেন্দ্রভিত্তিক—বর্তমানের একটি ও কল্যাণীতে আর একটি।

অথবা ৩। এলাকাভিত্তিক এক একটি নগর-কেন্দ্র সমন্বয়ে বহু কেন্দ্র-ভিত্তিক কাঠামোর কথা।

এই সম্ভাবনাগুলিকে যাচাই করে দেখা দর ভবিষ্যতের প্রয়োজনের মানদণ্ডে। প্রথম সম্ভাবনার কথা যাক অর্থাৎ যেটা বর্তমান অবস্থা তাতেই স্থায়ী সম্প্রসারণ করা। আর তার ফলে বর্তমানের সমস্ত কিছু লাঘব না হয়ে বরং বৃদ্ধিই পাবার সম্ভাবনা—সকালো চারিদিক থেকে সব মানুষের যাত্রাপথ একটি কেন্দ্র লে দিকে ধাবিত হতে থাকবে। আর তার ফলে সেই পরি দৃষ্টি—ঝুলন্ত মানুষের ভিড় চলতেই থাকবে। অথচ সেই সময়—উন্টোদিকের গাড়ীগুলো থাকবে শূন্য। অবশ্য অবস্থার পরিবর্তন দুই কেন্দ্রের প্রস্তাব করা হয়ো কিন্তু বর্তমানে সি, এম, ডি এলাকার নগরায়নের যে সম্প্রসারণ ঘটেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে বহু নগর-কেন্দ্র টি কাঠামোটাই বেশী সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে বলে মনে হয়। ৩ সমগ্র সি, এম, ডি এলাকা জুড়ে ছগলী-নদীর দুই তীর বাকতগুলি প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ উপনিবেশের কল্পনা করা যেগুলো গড়ে উঠবে একটি উন্নতমানের নগর-কেন্দ্রকে। আর এই নগর কেন্দ্রগুলির সাথে যোগাত্মক রচনা করবে। দক্ষিণগামী অত্যন্ত দ্রুতগতি যোগাযোগ ব্যবস্থা।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, এক একটি ২ থেকে ৫ জনসংখ্যার উপনিবেশ গড়ে উঠবে এক একটি নগর কেন্দ্রের আর সেই নগর কেন্দ্রগুলোকে দিয়ে মালা গাঁথা হবে মালার সূত্র রচনা করবে বৃহত্তর কলকাতার যোগাযোগ ব্যবস্থা—আর এটাই হবে আগামী দিনের পরিবেশ বা মৌলিক কাঠামো—ভবিষ্যতের মহানগরীর বিন্যাস স্বরূপ।

আগামীদিনের যে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ উপনিবেশের কথা হয়েছে, তাকি পুরোপুরি নূতন বসতি বিস্তার করে উঠবে না, সেটা সন্দেহ নয়। বরং বর্তমানের বসতি এ নিয়েই এই উপনিবেশগুলো তার সাথে যোগ হবে সাম্যপূর্ণভাবে নূতন বসতি এলাকা। তাহলে যে উপান কথা ভাবা হয়েছে তার মধ্যে থাকবে বর্তমান বসতি এ তার সাথে যুক্ত হবে নতুন এলাকা। তার নগর থাকবে প্রাতিদিনের প্রয়োজনীয় সকল সামাজিক ও সাংস্কৃতিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক সবরকম সুযোগ সুবিধা, প্রয়োজনে যেন তাদের ছুটে যেতে না হয় কলকাতায় সেইসাথে থাকবে ব্যবসা-বাণিজ্যের কর্মক্ষেত্র আর আ বাজার। এইসব মিলেই আগামী দিনের নগর কেন্দ্র গড়ে উঠবে। স্বভাবতই এইসব নগর কেন্দ্রের অবাস্থি হতে পারে বড় বড় রেলস্টেশনের সংলগ্ন ও

আগামী শতকের কলকাতার রূপরেখা

দিন হাজার হাজার মানুষের আনাগোনা। এই দেখা দরকার যেখানে স্টেশন সংলগ্ন জমির অভাব নয় ওপরেই বহুতল বিশিষ্ট কাঠামো তৈরী করা একথা স্বীকার করতেই হবে আগামী শতাব্দীতে রেল ব্যবস্থার আরো সম্প্রসারণ ঘটবে এবং গদিনের জীবনের আরো ঘনিষ্ঠ সঙ্গী হয়ে উঠবে। এলস্টেশনগুলোর যুগোপযোগী পরিবর্ধন ও গন্ত প্রয়োজন।

ায় স্বয়ংসম্পূর্ণ উপনিবেশের যে পরিকল্পনা করা অনেক ক্ষেত্রে বর্তমানের এক বা একাধিক তার সম্প্রসারিত এলাকা নিয়ে গড়ে উঠবে। বসতি এলাকা স্বভাবতই নদীর এক রেললাইন

গায় আছে তারপরে নতুন নগর-কেন্দ্র গড়ে হনের কাছে আর রেললাইন আর নতুন জাতীয় বা শহরসীমার বহির্ভূত দ্রুতগামী সড়কপথের লজ্জা গড়ে উঠবে নতুন বসতি। আর প্রায়

সড়ক পথের সংলগ্ন থাকবে নতুন শিল্প গড়ে জমি। নদীর তীর হতে প্রান্তিক সড়ক পর্যন্ত তাকে বিধৃত করে রাখবে। একটি পূর্ব-পশ্চিমের

প্রায় ক্ষেত্রেই রচিত হবে বর্তমানের স্টেশন সংস্কার ও সম্প্রসারণের মধ্যে দিয়ে। প্রতিটি

এই পূর্ব-পশ্চিম অক্ষপথের একপ্রান্ত উন্মুক্ত নদীর তীরে যেখানে থাকবে বাধানো নদীপার

প্রান্ত উন্মোচিত হবে প্রান্তিক সড়কের পারে সড়কের সমারোহে। এমন পরিবেশেই

বলাশেষে শ্রান্ত মানুষের দল অবগাহন করতে স্তর শান্ত সৌন্দর্যের মধ্যে। এমন করেই আমরা

পায় ভাবগতের বৃহত্তর কলকাতা জুড়ে এক পরিবেশ, যে পরিবেশ শুধুমাত্র প্রতিদিনের

আশ্রয়ই দেবে না, সহায়ক হবে পুরিপুষ্ট করতে, তে সতেজ, বলিষ্ঠ মানসিকতা।

প্রতিটি উপনিবেশে থাকবে রুজিরোজ্জগারের যোগস্বিধা তার শিল্পাঞ্চলে ও নগরকেন্দ্রে ও

সাকায়—তবু এটা কখনই সম্ভব হবে না যে নতুন এলাকাভিত্তিক হবে অর্থাৎ প্রতিটি

লোক সেই এলাকাতেই কর্মে নিযুক্ত থাকবে, রে যেতে হবে না রোজ্জগারের তাগিদে।

পারলে হয়ত খুবই আদর্শ হতো। কিন্তু পুরি সম্ভব নয়। কারণ এক একটি এলাকার

গল্প অথবা বাণিজ্য ভিত্তিক বৈশিষ্ট্য থাকবেই, বড় কথা হলো, যোথ পরিবারের ভিত্তিমূল

যতই শিথিল হোক না কেন, আমাদের জীবনে তার সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজন নিঃশেষিত হয়নি। আর সেই কারণেই কর্মসংস্থানের জন্য একই পরিবারের এক ভাই যখন যাবে বেহালাতে আর একজন হয়তো যাবে ব্যারাকপুরে। আমাদের কলকাতা এই বৈপরিত্যের মধ্যে সমন্বয়ের বিরাট সাধনায় লিপ্ত। আমরা চাইবোনা সেই সাধনার আরাধনার কুষ্টিমূল থেকে কলকাতা বিচ্যুত হোক। কলকাতার যোথ পরিবার জীবন বিনষ্ট হোক। আমরা চাইবো প্রয়োজনমত যে কোন এলাকার লোক ছড়িয়ে পড়তে পারবে বৃহত্তর কলকাতার যে কোন প্রান্তে আর সেটাইতো সম্ভব হবে কলকাতার আগামী দিনের আদর্শ ও স্বাভাবিক যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে।

বহু-নগর-কেন্দ্র ভিত্তিক মহানগরীর গঠনশৈলী

আগামী শতকের শুরুতে যখন বৃহত্তর কলকাতার লোক-সংখ্যা অল্পমান করা যায় ১২০ লক্ষের মাত্রা ছাড়িয়ে যাবে,

তখনকার প্রয়োজনের কথা মনে রেখে যে জনবসতির পরিকল্পনা করা যায়, তাহলো এক একটি নগর-কেন্দ্রকে

বিধৃত করে অনধিক ৫০ লক্ষের এক একটি উপনিবেশ (অল্প কলকাতা-হাওড়া বহির্ভূত)। যারা সি, এম, ডি এলাকা

জুড়ে এইরকম ২৫ টি নগর-কেন্দ্র ভিত্তিক উপনিবেশ ভাবা যায়। যেমন ধরা যায় হুগলী নদীর পূর্বতীরে প্রধান নগর-

কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠতে পারে কল্যাণী, নৈহাটি, বারাকপুর, পানিহাটি, দক্ষিণেশ্বর, বারাসত, দমদম, গাড়িয়া ইত্যাদি।

আর পশ্চিমতীরে বাঁশবেড়িয়া, চুঁচুড়া, শ্রীরামপুর, বালু, আন্দুল, বাউড়িয়া ইত্যাদি। এই নগর-কেন্দ্রেতে শহর

জীবনের প্রয়োজনীয় সকল সুযোগ-সুবিধা ছাড়াও স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন, বাণিজ্যিক কর্ম-কেন্দ্রের ব্যবস্থা থাকবে। তবে

এই নগর কেন্দ্রগুলোর মধ্যে কতগুলি বিশেষ ভাবে নির্বাচন করা যেতে পারে যেখানে ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রের প্রাধান্য

থাকবে এবং সেগুলোকে বাণিজ্য-কেন্দ্র হিসাবেও অভিহিত করা যেতে পারে। নদীর ইতীরেই বাণিজ্য-কেন্দ্র থাকবে।

কিন্তু তাদের স্থান নির্বাচন এমনভাবে হতে পারে যাতে করে অল্পবয়স্কভাবে উভয় তীরের বাণিজ্য-কেন্দ্রগুলি যুগল কেন্দ্র

হিসাবে আরিভাব ঘটতে পারে এবং নদীর উভয়তীরে গড়ে ওঠা মহানগরকে আরো আন্তরিক বন্ধনে আবদ্ধ করতে পারে।

অবশ্যই সেটা নির্ভর করবে আমরা কত তাড়াতাড়ি এইসব স্থানে নদীপারাপারের স্থায়ী সেতু রচনা করতে পারি।

এমনভাবেই কলকাতার বিশাল-কেন্দ্র বাদ দিয়েও সি, এম, ডি এলাকায় ভবিষ্যতে চারটি যুগল-বাণিজ্য কেন্দ্র সৃষ্টি হতে

পারে, যেমন : বাঁশবেড়িয়া-কল্যাণী, শ্রীরামপুর-বারাকপুর,

বালি-দক্ষিণেশ্বর, বাউড়িয়া-বজ্রবজ্র। এছাড়াও কলকাতা ও হাওড়ার দুই-প্রান্তে-পূর্বে ও পশ্চিমে—যথাক্রমে বিধানগর (লবণহ্রদ নগর) এবং কোণা এলাকার (পশ্চিম হাওড়া) অতি বিশেষ ভূমিকার কথা ভাবা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে কলকাতার বিস্তারের একটি অস্বাভাবিক সমস্যা হলো তার নদীবরাবর উত্তর দক্ষিণে দীর্ঘায়িত বিকাশ। তার ফলে নদীতীর থেকে পূর্বে ও পশ্চিমে সামান্য দূরত্বের ব্যবধানে কোনরকম বিস্তার নেই। উত্তর-দক্ষিণ অক্ষ পথে যখন উন্নয়নের প্রচণ্ড চাপ তখন যদি ভবিষ্যতের উন্নয়নের জন্য আর একটি অক্ষপথ পূর্ব-পশ্চিমে খোলা যেতো তাহলে নিশ্চয় বর্তমান উন্নয়ন কাঠামোতে একটা নতুন মোড় ঘোরানো যেতো, উন্নয়নের নতুন দিগন্ত প্রসারিত হতো পারত নতুন অক্ষপথে। সেইজন্যই উন্নয়নের নতুন এক অক্ষপথ খোলার জন্য পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তে দুটি বৃহদাকার কর্মক্ষেত্রের কথা ভাবা হয়েছে যারা বর্তমান কলকাতার কর্মক্ষেত্রের ভার লাঘব করতে কিছুটা সাহায্য করবে। যেমন ধরা হয়েছে, বিধান-নগরে গড়ে উঠবে ভবিষ্যতের মহানগরীর স্তরে শাসন ব্যবস্থা গবেষণা, অফিস আদালত আর খেলাধুলার আমোদ প্রমোদের কেন্দ্র হিসাবে। আর কোণাতে তৈরী হবে মহানগরীর অন্যতম পাইকারী পণ্য বাজার। যার ফলে বর্তমানে বড়বাজারের ভার অনেকাংশে লাঘব হতে পারে, এবং এই দুটি উন্নয়নশীল কেন্দ্রকে যদি কোন জুগুপ্সাময়ী যোগাযোগ ব্যবস্থার দ্বারা যুক্ত করা যায় তাহলে এই যোগাযোগ পথ ধরেই গড়ে উঠবে আগামী শতকের কলকাতার উন্নয়নের নতুন অক্ষপথ। তাহলে চৌরঙ্গীর অক্ষিপথের ভবানীপুরকে গ্রাস করার আগেই তার ব্যাপ্তির নতুন দিগন্ত প্রসারিত হবে পূর্বে ও পশ্চিমে। আর তাহলে মহানগরীর ভবিষ্যৎ কাঠামোতে এক মৌলিক পরিবর্তন আনা সম্ভব হবে। আনা সম্ভব হবে মহানগরী-ব্যাপি যোগাযোগ ব্যবস্থার আমূল সংস্কার।

উপসংহার

মানুষের বসতিবিস্তারের ইতিহাস জনবসতি বৃদ্ধির অতিক্রম করে মহানগরের মহাসংলগ্নী পৌঁচেছে যেখানে মহানগরীর একটি বৃহৎ সত্তার হয়েছে, যেখানে ক্ষুদ্র শহরের ভিন্ন অস্তিত্ব থাকছে না মিলেমিশে এক মহামেলার সৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু আ প্রকৃতির এই বৃহদায়তনই আবার নতুন নতুন সমস্যা সৃষ্টি করেছে। আগামী দিনের যে বৃহদায়তন জনসংখ্যা হবে তাদের সবাইকে কখনই একটি মহানগরীর বাসিন্দা নেওয়া যাবে না। তাদের ছড়িয়ে দিতে হবে মহানগর থেকে আরো দূরে, সেইখানে ছোট ছোট শহরে জীবন ধারণের সকল উপকরণই থাকবে, শুধু যে মহানগরীর ভয়াবহ জনসংখ্যা আর ঘনবসতি। মহা ৬০।৭০ মাইল দূরত্বের মধ্যে এইসব নতুন শহর গড়ে তৈরী হবে আগামী দিনের মহানগরী কেন্দ্রিক অঞ্চল যেখানে শহর ও গ্রাম, কৃষির খামার আর শ্রমিকের কা বিরাজ্ঞ হবে একাত্মা বন্ধনে। তাই আগামী পরিকল্পনা মহানগরীর ৫০০ বর্গমাইলের পরিধির মধ্যে রাখলে চলবে না; তাকে সম্প্রসারিত করতে হবে বৃগের জনবসতির স্তরে—যেখানে মহানগরী-কেন্দ্রিক অঞ্চলভূমি পরিবৃত্ত করবে হয়ত ৫০০০ হাজার বর্গমাইল বিস্তৃতি হবে পশ্চিমে বর্ধমান থেকে পাঁশকুড়া হয়ে পর্যন্ত আর উত্তর ও পূর্বে নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর, বনগাঁ, হয়ে ডায়মণ্ডহারবার পর্যন্ত। শিল্পভিত্তিক নতুন নু দিয়ে আমরা পরিবৃত্ত করবো আগামীদিনের মহানগরী পরিধিকে। আমাদের দৃষ্টি সেই উজ্জ্বল ভবিষ্যতে নিবদ্ধ হোক।

আমরা কোন্ গথে?

ডাঃ যোগেশচন্দ্র ঘোষ

পরিবর্তিত সংস্করণ (যজ্ঞস্থ)

বিদ্যুতের যোগান ও পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ

দ্রুত উৎপাদন ও পরিবহনের ব্যাপারটা অত্যন্ত যত্নসহকারে পশ্চিমবঙ্গে ঠিক তেমনটা নয়। তার অবস্থাটা বেশ কিছুটা জটিল। তার কারণ উৎপাদন ও পরিবহনের কাজে বিভিন্ন সংস্থা আছে যেমন-কলকাতা বিদ্যুৎ সরবরাহ দা মোদের উপত্যকা করপোরেশন, হুগাঁপুর লিমিটেড, এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ আরও কয়েকটি ছোট ছোট সংস্থাও বিদ্যুৎ নের কাজে লিপ্ত আছেন। এর মধ্যে দার্জিলিং জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রটি ছোট হলেও এটি প্রতিষ্ঠিত সর্বপ্রথম বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ এরা জ্যে বিদ্যুৎ নির্ধারণের প্রধান সরকারি সংস্থা এবং এক শহর বাদ দিয়ে সারা রাজ্যের বিদ্যুৎ উৎপাদন দায়িত্বটা প্রধানত বর্তায় পর্ষদের উপরে। তার কাজের পরিধিটা এবং গুরুত্ব বুঝতে হলে কিছুটা দিন ফিরে তাকাতে হবে।

শান্তি প্রাপ্তির আগে ও তার পরের দিনগুলিতে প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কেউই সচেতন ছিলেন এমন একটা ধারণা ছিল যে বিদ্যুতের প্রয়োজন শহরে বা বড় বড় শিল্প কারখানায়। নগর-শ্রমিক সুবিধা ও আনন্দের প্রয়োজনে শহরে শহরে সরবরাহের ব্যবস্থা হয়েছিল। কেউই ভাবতেই তখন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিদ্যুৎ প্রয়োজন। এমন কি রাস্তাঘাট বা যোগাযোগ টাও আমরা ভেবেছিলাম। কিন্তু বিদ্যুৎ

উৎপাদন বা বণ্টনের কথা আমরা সময়মত ভাবি নি। কিন্তু আজ বেশ দেরি হয়ে গেলেও আমরা বুঝতে পেরেছি যে বিদ্যুতের অভাবে আমাদের সমস্ত কিছু উন্নয়নমূলক কাজ ব্যর্থ না হলেও তেমন সার্থকতা লাভ করতে পারে নি।

শহরে বা বড় শিল্প কারখানায় বিদ্যুতের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। কিন্তু দেশের সার্বিক উন্নয়নে প্রয়োজন গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নতি। গ্রামগুলিকে অর্থনৈতিক স্বনির্ভর করে তুলতেই বহু শতাব্দীর ছুঁখ দৈন্যকে জয় করে দেশের অর্থনীতিকে স্বদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হবে। তারই জন্য প্রয়োজন স্মরণীয় গ্রামেও বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া। কিন্তু এতদিন পর্যন্ত কোন বিদ্যুৎ সংস্থার পক্ষে একাজে হাত দেওয়া সম্ভব হয় নি। কারণ মুনাফাই ছিল সেখানে বড় কথা। গ্রামগুলি পদে পদে মার খেয়েছে, শহরগুলি আলোয় বলমল করেছে আর অতীতকে গ্রামগুলি যে অন্ধকারে ছিল, থেকে গিয়েছে সেই অন্ধকারেই।

এই অবস্থা থেকে নিকৃতি পাবার জন্যই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের প্রতিষ্ঠা। মুনাফা নয়, সামাজিক দায়িত্ব পালনই পর্ষদের প্রধান উদ্দেশ্য। আজ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের কর্মীরা গর্বের সঙ্গে বলতে পারে একমাত্র তাঁদের সম্মিলিত চেষ্টাতেই হাজারো বধা-বিপত্তি সম্বন্ধে আজ পশ্চিম বাংলার গ্রাম-গঞ্জে জেলা শহরে, আধা-শহরে বিদ্যুৎ গিয়ে পৌঁছেছে। আগামীদিনের সবুজ বিপ্লবের সম্ভাবনা নিয়ে। শিল্পে অগ্রগতি বাংলার গ্রামগুলি নতুন নতুন শিল্প স্থাপনের সম্ভাবনার কথা

ভাবছে। এদিকে কাজ এগিয়েও গেছে অনেক দূর। গ্রামের চাষী বিছাতের সাহায্যে জমিতে উপযুক্ত সেচের ব্যবস্থা করতে পারছে। কৃষিকাজ আজ আর অব-হেলিত নয়, বরং রীতিমত লাভজনক হয়ে উঠেছে। সরকারী সাহায্যে জেলায় জেলায় শিল্পাঞ্চল স্থাপনের প্রয়াস চলেছে। আজ আর কারও বুঝতে বাকী নেই যে একমাত্র বিছাতই পারে একটি অঞ্চলের চেহারা পাণ্টে দিতে। বিছাত আজ প্রগতির বাহক।

রাজ্য বিছাত পর্বদ যদিও তার উৎপাদনের একটি অংশ কলকাতা ও নিকটবর্তী শিল্পাঞ্চলের জন্ত সরবরাহ করে থাকে প্রকৃতপক্ষে উৎপাদনের বেশীটাই সরবরাহ করা হয়ে থাকে পশ্চিম বাংলার জেলাগুলির বিস্তীর্ণ কৃষিক্ষেত্রে। শহর ও আধা শহরগুলির চেয়ে পর্বদের প্রকৃত দায় এই জেলাগুলিতেই।

রাজ্য বিছাত পর্বৎ নানা ছরবস্ত্রার মধ্যেও বিরাট আর্থিক ঝুঁকি নিয়ে বৈজ্ঞানিককরণের কাজে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করছে।

দেশের অর্থনৈতিক বুনয়াদ গড়ে তুলতে যেমন প্রয়োজন কৃষির উন্নতি, বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপন, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন উৎপাদন বৃদ্ধি। বিছাত উৎপাদন বৃদ্ধিই পারবে কৃষিক্ষেত্রে ও শিল্পে উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব করতে। সুখের বিষয় আজ দেশের সরকার, জনগণ এবং সকল শ্রেণীর কর্মীরা এবিষয়ে সচেতন।

অন্যান্য সুযোগগুলির সঙ্গে রাজ্যের বিছাত উৎপাদন বৃদ্ধির জন্ত পর্বদ আশ্রাণ চেষ্টা করে চলেছে। বর্তমানে পর্বদের নিম্নলিখিত কেন্দ্রগুলি মারফৎ ৫০০ মেগাওয়াটের বেশী বিছাত উৎপাদন হয়ে থাকে।

ব্যাঙেল তাপ বিছাত কেন্দ্র	৩২০
সাঁওতালডিহি তাপ বিছাত কেন্দ্র	১২০
গৌরীপুর বিছাত উৎপাদন কেন্দ্র	২৪
দিশাডগড় বিছাত উৎপাদন কেন্দ্র	৬
জলঢাকা বিছাত উৎপাদন কেন্দ্র	২৭
বিজ্ঞানবাড়ি ও লিটল রঞ্জিত	
জল বিছাত কেন্দ্র	২৩০
কার্শিয়াং জলবিছাত কেন্দ্র	১১৫
মসানজোড় জলবিছাত কেন্দ্র	৪
উত্তরবঙ্গে ডিজেল চালিত বিছাত কেন্দ্র	১৬

বিছাতের বর্তমান ও ভবিষ্যতের চাহিদা জন্ত রাজ্য বিছাত পর্বদ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা নিম্নলিখিত কাজ হাতে নিচ্ছেন :-

সাঁওতাল ডিহি তাপবিছাত প্রকল্প	২৪
কোলাঘাট " " "	৬০
ব্যাঙেল " " "	২৫
জলঢাকা জলবিছাত প্রকল্প	
রিচিংটন " " "	

এইসবগুলির জন্তই সরকারের অর্থ ব্যয় হয়েছে।

এই প্রকল্পগুলি রূপায়িত হলে আরও প্রকল্পে হাত দিতে পারলে বিছাত জনিত ছরবস্ত্রা থেকে আমরা নিষ্কৃতি পাবে করা অনায়াস হবে না। আজ এই কঠোর পরিশ্রমে আমাদের উৎপাদনের গতি রুদ্ধ কিছুতেই হতে দেওয়া যায় না।

জনসংযোগ বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিছাত পর্বদের সৌজন্যে প্রাপ্ত

১২০৯, বি, বিধান সরগিহিত কলিকাতা-৬ গোবর্ধন গ্রেস হইতে শ্রীকিরণচন্দ্র মিত্র এডভোকেট কর্তৃক মুদ্রিত

আনকবিক ট্রেট বই

শাস্ত্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ

১। গীতা (নতুন সংস্করণ) ১৫.০০

গীতা ৭.০০

২ ও ৩ খণ্ড ১০.০০

অ. প্র. বাক্য ৭.৫০

৩। India Speaks ৭.৫০

৪. ১.৫০

৫। ১.৫০

৬। ৫.০০

জম্মা ঘোষ এম. এ. বি. টি.

৭। ৩.০০

৮। ৩.০০

ডক্টর রামনাথ বিশ্বাসের

৯। ৩.০০

১০। ৩.৫০

১১। ৩.০০

১২। ১০.০০

১৩।

১৪। ১০.০০

১৫। ১.০০

১৬। ৪.০০

আয়রনম্যান নীলদ সরকারের

১৭। ৫.০০

১৮। ৩.০০

১৯। ৩.০০

২০। ৩.০০

লেখক শ্রীভানিলাল ঘোষ এম. এ.

২১। ব্যাঘ্র বাঘা ৫.০০

২২। বীরের ব ডাক ৩.৫০

২৩। বিজ্ঞান বাঙালী ৫.০০

২৪। বাংলা ও খাবি ৫.০০

২৫। ব. শার বিজ্ঞান ৫.৫০

২৬। বাংলার মনীষী ৫.০০

২৭। বজ্রধি বামমোহন ৩.০০

২৮। ষুগাচার্য বিবেকানন্দ ৫.০০

২৯। আচার্য জগদীশচন্দ্র ৫.০০

৩০। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ৫.০০

৩১। রবীন্দ্রনাথ ৫.০০

৩২। জীবনগড়া ৫.০০

৩৩। বাবহারিক শব্দকোষ ১৫.০০

(প্রয়োগমূলক অভিনব বাংলা অভিধান

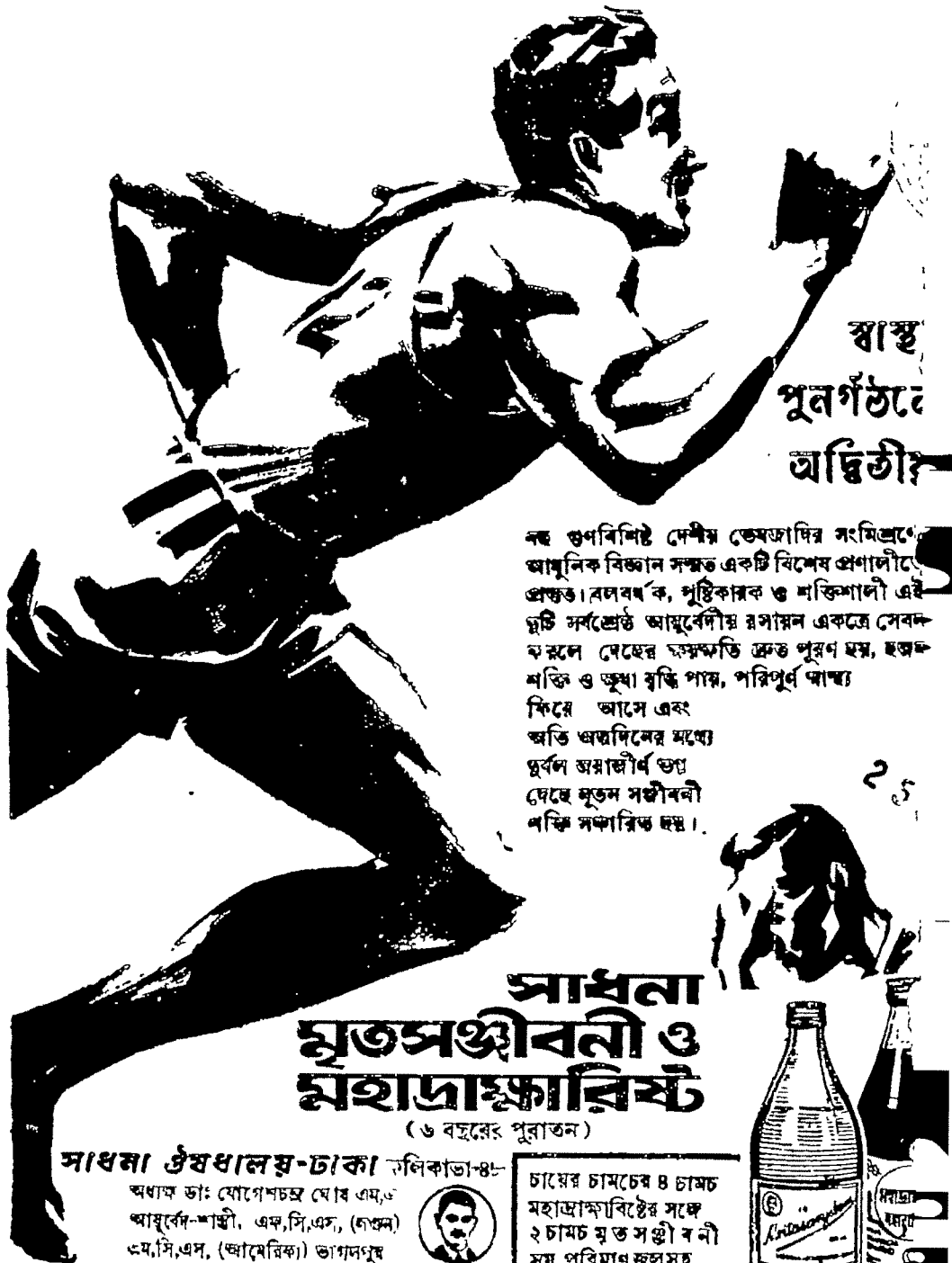
৬৩ হাজার শব্দ সম্বলিত বহুল পরিচয়িত

সংস্করণ)

৩৪। শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী

৩৫। সচিত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনী ৫.০০

৩৬। গভেষ্টারী লাইব্রেরী : : ১৫ কলকাতা, কলিকাতা - ১২



স্বাস্থ্য
পুনর্গঠনে
অদ্বিতীয়

নব গুণবিশিষ্ট দেশীয় ভেষজাদির সংমিশ্রণে
আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত একটি বিশেষ প্রণালীতে
প্রস্তুত। বলবর্ধক, পুষ্টিকারক ও শক্তিশালী এই
চুটি সর্বশ্রেষ্ঠ আয়ুর্বেদীয় রসায়ন একত্রে সেবন
করলে দেহের ক্ষমকতি দ্রুত পূরণ হয়, হৃৎক-
শক্তি ও জুখা বৃদ্ধি পায়, পরিপূর্ণ দাম্ভ্য
কিঁরে আসে এবং
অতি প্রকৃতির মধ্যে
পূর্বল জয়াজীর্ণ ভগ্ন
দেহে নূতন সজীবনী
শক্তি সঞ্চারিত হয়।

সাধনা মৃতসঞ্জীবনী ও মহাদ্রাক্ষারিস্ট

(৬ বছরের পুনাঁতন)

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা চলিকাতা-৪৫

অথাক তাঃ যোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ.
আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রী, এফ.সি.এস., (লন্ডন)
এম.সি.এস., (আমেরিকা) ভাগদগুণ
কনোজের বসায়ণ শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।



কটিকাতা কেন্দ্র : তাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, এম.বি.বি.এস., (কলি)
আয়ুর্বেদচর্চা

চায়ের চামচের ৪ চামচ
মহাদ্রাক্ষারিস্টের সঙ্গে
২ চামচ মৃত সঞ্জীবনী
সম পরিমাণ জলসহ
প্রত্যাহ দু'বার আহারের
পর্ব সেব্য।



Central Registration No 2870/57 Per Copy Rs 4.00 with Regtd
Rs 6.50 : 20-A, Prince Golan Md Road, Calcutta-26. Phone : 46-4